দ্বিতীয় খন্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আল কুরআনে নারী

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭৮

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৭
শ্রাবণ	১৪১৩
আগস্ট	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Al QURANE NARE-2nd Volume by Mohammad Mosharraf Hossain. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 130.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাসংগিক কথা

আল কুরআন আজকের দুনিয়ায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের একমাত্র নির্ভুল বাণী-সম্ভার। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথনির্দেশিকা হিসেবে একক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মহান এক নি'আমত। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি। মহাকাশ ও মহাবিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিরাজি মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই নিয়োজিত। দুনিয়ার জীবন সুচারুরূপে ও সুবিন্যস্তভাবে অতিবাহিত করে আখেরাতের জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও পূর্ণ সাফল্য অর্জনের তথা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের পথে চলার একমাত্র আলোকবর্তিকা এ আল কুরআন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল কুরআনই সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে।

নারী-পুরুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনেরই প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহ্র রহমত ও দানের ব্যাপারে তিনি যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি, তেমনি তাঁর বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোনো তারতম্য রাখেননি। মহান আল্লাহ্ পুরুষদের জন্যে যেমন অপার করুণার আধার, তেমনি মহিলাদের জন্যেও তাঁর দয়া সীমাহীন। সংকীর্ণ দৃষ্টির কোনো মানুষের চোখেই বিভিন্ন কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে পারে। কারণ, মানুষের জন্যে তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের আর কেউ দূরের হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্র চোখে তো সকল মানুষই সমান—আল্লাহ্র তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের, কেউ দূরের নেই। সুতরাং আল্লাহ্র বাণী আল কুরআনে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই সমান কল্যাণকর বিধান দেয়া হয়েছে।

আল কুরআন মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র দেয়া একমাত্র সত্যপথ নির্দেশিকা। কোনো সম্প্রদায় বিশেষের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এ সম্পর্কে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার ঘোষণা 'হাযা বায়ানুল লিন্নাস' এবং 'হুদাল্ লিন্নাস'-এর মাধ্যমে কুরআনকে সকল মানুষের জীবন পথের নির্দেশিকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আজকের বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীরা নারী অধিকার ও নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যাপদেশে ইসলামকেই দায়ী করে থাকে। মানব ইতিহাসে

একমাত্র যে ইসলাম নারীদের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে সে ইসলামকেই ওরা দায়ী করছে নারী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার দায়ে ! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি নামধারী মুসলিমগণও এ নির্জলা মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াচ্ছে আজকের সমাজে। তারা বিভ্রান্ত করে ছাড়ছে আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রজন্মকে। অথচ তাদের মনগড়া প্রগতির পথ নারী সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে পশুত্বের এক মারাত্মক ও ঘৃণ্য পর্যায়ে।

আল্লাহর বাণী আল কুরআন ও রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল ইসলাম নারী-পুরুষের সার্বিক কল্যাণ নির্দেশ করেছে। 'নারী' বিষয়ে অনেক লেখক ও চিন্তাবিদের লেখা গ্রন্থরাজি বাজারে চালু রয়েছে। "আল কুরআনে নারী" শীর্ষক বইটি সে ধরনের একটি বই নয়। বরং কুরআন শরীফে 'নারী' উল্লেখে যেসব আয়াত রয়েছে, সেসব আয়াত চয়ন করে তা থেকে উল্লেখযোগ্য আয়াতসমূহ বাছাই করে বিভিন্ন তাফসীরের আলোচনা থেকে এ বইটি লেখা হয়েছে। এজন্যে বইটিতে গতানুগতিক রীতিতে কোনো বিষয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়নি ; বরং আয়াতের অধীনে সেই আয়াতে সন্নিহিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর ভাবার্থ এতই ব্যাপক যে একই আয়াত থেকে বহুবিধ বিষয় বের করা যায় বিধায় একটি আয়াত কেবল মাত্র একটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ বা সমীচীন মনে করিনি। এ কারণেই শিরোনামের নীচে আয়াত না লিখে, প্রচলিত রীতির খেলাফ আয়াতের নীচে শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে একই আয়াতের অধীনে উল্লিখিত শিরোনাম ছাড়াও যেন প্রয়োজনে অন্যান্য শিরোনাম ব্যবহারের অবকাশ থাকে বা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আয়াতটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাদির যেসব সমাধান আল কুরআনের আয়াত-গুলোতেই বিদ্যমান রয়েছে, তা যেন প্রয়োজন মত বের করে সমাধান হিসেবে পেশ করা যায়।

তাছাড়া বইটির আলোচনায় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি, বরং কুরআনের সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার উৎসের উল্লেখ কোনো কোনো স্থানে অসতর্কতাবশত বাদ পড়ে গেছে। আবার কোথাও আলোচনা শেষ করে উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাওবা আলোচনার সাথেই উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবেই এ বইতে যেসব তাফসীরের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তাহলো ঃ

১. আল কুরআনুল করীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২. কুরআনুল হাকীম—শাহ রফি উদ্দীন র. ও শাহ্ আশরাফ আলী থানভী র.

৩. মা'আরেফুল কুরআন—মুফতী মুহাম্মদ শফী র.

৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর—আল্লামা ইবনে কাসীর র.

৫. তাফহীমুল কুরআন—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

৬. বায়ানুল কুরআন—শাহ্ আশরাফ আলী থানভী র.

৭. তাফসীরে মাজেদী—আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী র.

৮. তাফসীরে মাযহারী—কাযী ছানাউল্লাহ্ পানীপথী র.

৯. মিশকাত শরীফ—শেখ অলি উদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ র.

১০. তাদাব্বুরে কুরআন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী র.

১১. তাফসীরে হাক্কানী—মাওলানা আবদুল হক র.

১২. আল কুরআনুল কারীম—মাওলানা মাহমুদুল হাসান র. ও মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী র.

১৩. চল্লিশ হাদীসে কুদসী—ড. ইয্যুদ্দীন ইবরাহীম র.

১৪. তাফসীরে উসমানী

বিষয়বস্তু নির্ধারণে যেসব শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্মার্থ বিভিন্ন তাফসীর থেকে যেভাবে বুঝতে পেরেছি সেভাবেই উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকবর্গের মন্তব্য ও পরামর্শ পেলে বইটির মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

সময়ের স্বল্পতার কারণে বইয়ের শিরোনামের অধীনে সন্নিবেশিত কিছু কিছু আলোচনা অতি সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সম্প্রসারণের ও পূর্ণাঙ্গ রূপদানের আশা রইল। বইটি বহুমুখী বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের শিকার আজকের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থান, সত্যিকার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সামান্য অবদান রাখতে পারলেও শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

আধুনিক প্রকাশনী ইতিপূর্বে আল কুরআনে নারী ১ম খণ্ড বের করেছে, বর্তমানে বইটির ২য় খণ্ড প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বইটি প্রকাশের কাজে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন, ব্যবস্থা নিয়েছেন আল্লাহ সবাইকে নেক জাযা দিন।

—মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

সূচীপত্র

এক

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ - التوبة : ٧٢

"আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদের এমন জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই স্থায়ী জান্নাতে থাকবে উত্তম বাসস্থান। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানে তারা লাভ করবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি—আর এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭২

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুমিনগণকে আল্লাহ্ তাআলার মহাসাফল্যদানের ওয়াদা

পূর্বের আয়াতে অর্থাৎ এ সূরার ৭১ আয়াতে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা আল্লাহ্র রহমতের যোগ্য হবেন। আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, তারা ঈমান রূপ মহা নিয়ামতের তাওফীক পাওয়ার কারণে একে অপরের হিতাকাংখী বন্ধু, তারা পরস্পরকে ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেয় আর অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায কায়েম করে আর যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকেরাই এমন, যাদের ওপর আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেন।

এসব গুণবৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াদা করেছেন জান্নাতের, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এটা কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য নয়, বরং তাদেরকে এসব নিয়ামত দেয়া হবে স্থায়ীভাবে—চিরদিনের জন্য। ওসব চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে উত্তম বাসস্থান। তারা সেখানে আরও পাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির মত দুর্লভ নিয়ামত—আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রকৃতপক্ষে এটাই জীবনের একমাত্র মহাসাফল্য. যথার্থ কামিয়াবী।

উপরোক্ত নিয়ামতসমূহ, আল্লাহর বিশেষ দান কারা পাবে ? আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। উল্লেখিত গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারীরাই ওসব পুরস্কারের ভাগী হবে। বস্তুত ওসব পুরস্কার পাবে ঈমানদার নারী পুরুষগণ। অন্য কথায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঈমান, আমল ও আখলাকের বদৌলতে তারা ওসব মহা নিয়ামত লাভে সমর্থ হবে। আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতের প্রতি ঈমান ; ঈমান অনুযায়ী আমল তথা দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করলো এবং সেই ঈমান ও আমলের অনুশীলনের মাধ্যমে পূত-পবিত্র আখলাক বা চরিত্র গঠন করতে পারলে, মানুষ আল্লাহর রহমতের যোগ্য হতে পারে। আর আল্লাহর রহমতের ভাগী হতে পারলেই তারা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত—তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে সমর্থ হতে পারবে।

আসলে ঈমানের প্রভাবে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেমন স্বচ্ছতা ও সততার অধিকারী হয়ে থাকে, তেমনি তাদের আমল ও আখলাকের ফলে সমাজেও শান্তি শৃংখলা বিরাজ করে। সাহচর্য প্রভাবের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি এর সফলও সমাজে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। পুরুষদের আল্লাহর পথে চলতে স্ত্রীরা বাধা না দিয়ে বরং সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষায় সৎ জীবন যাপনে স্বামীরা তাদের সহায়ক ও পরিপুরক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহানুভূতির সুমধুর ভাব ও সম্পর্ক বিরাজ করে। এভাবে সমাজে নর-নারীর ঈমানী শক্তি তাদের দুনিয়ার জীবনে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কার্যকর হয়ে থাকে। নামায-রোযার মাধ্যমে যেমন তাদের আত্মিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুণ সৃষ্টি হয়, তেমনি যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের দিয়ে সামাজিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে ন্যায় ও সৎকাজের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায় ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

ঈমানদার নারী-পুরুষ ঈমানের বদৌলতে এমনি এক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আল্লাহর রহমতের ভাগী হতে পারে, তারা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। সর্বোপরি এভাবে তাদের জীবনের প্রকৃত সফলতা নিশ্চিত হতে পারে বলে আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই ঈমানাদার নারী ও ঈমানদার পুরুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।-[তাফহীমুল কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের আলোকে]

আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি পুরুষের জন্য যতটুকু ঠিক ততটুকু নারীর জন্যেও। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ঈমান ও কুফ্‌র—পুরুষ বা নারী হওয়া নয়।

আলোচ্য আয়াতে নারী-পুরুষদের যারাই সত্যিকারভাবে দীনকে বুঝে শুনে ঈমান আনবে তাদের পুরো জীবনে প্রকৃত সাফল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জীবনে মহাসাফল্যের ওয়াদা করে বলেছেন, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ্ তাআলা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাদের প্রদত্ত জান্নাতে বাসোপযুগী উত্তম বাসস্থান দেয়ারও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সর্বোপরি, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মহান ঘোষণা। আল্লাহ্‌র দেয়া উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান। বস্তুত আল্লাহ্ প্রদত্ত এসব নিয়ামত ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্যও 'মহা সফলতা'-এর তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক। একজন ঈমানদারের জন্য আয়াতে বর্ণিত সর্বশেষ নিয়ামত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম প্রাপ্তি। দুনিয়ার জীবনে যেমন مَنْ لَهُ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْكُلُّ (جسكا رب اسكا سب)। যে মাওলাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তার পাওয়ার আর কি বাকী থাকলো ? যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনেরই প্রাপ্য।

❑

দুই

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○ وَلَقَدْ
هَمَّتْ بِهٖ ج وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ
وَالْفَحْشَاءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ
مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ
اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَاِنْ
كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ
مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ
هٰذَا سكته وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ج اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ○ وَقَالَ نِسْوَةٌ
فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ج قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ط اِنَّا
لَنَرٰهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ
لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ج فَلَمَّا
رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ط اِنْ هٰذَآ اِلَّا
مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ط وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ
فَاسْتَعْصَمَ ط وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

"আর তাঁকে (ইউসুফ আ.-কে) ফুসলাতে লাগলো মহিলাটি (জুলায়খা), যার ঘরে তিনি ছিলেন। সে মহিলা ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে বললো, 'এসো!' তিনি বললেন, আল্লাহর পানাহ চাই। আমার রব তো আমার থাকার সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (আমি কি এ কাজ করতে পারি ?)

নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হতে পারে না।" মহিলা তো তাঁর প্রতি আশক্ত হয়েই পড়েছে, আর তিনিও মহিলার প্রতি আশক্ত হয়ে পড়তেন যদি তিনি তাঁর রবের বুরহান বা নিদর্শন দেখতে না পেতেন। এমনিভাবে হলো, যাতে করে আমি তার থেকে মন্দ ও নির্লজ্জতা দূর করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই সে আমার বাছাইকৃত বান্দাদের একজন। তারা উভয়ে ঘরের দরজার দিকে দৌড়ে গেল, আর মহিলাটি ইউসুফের জামা পেছন থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। অমনি মহিলাটি বলে উঠলো, "যে তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে জেলে পাঠানো অথবা অন্য কোনো কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি সাজা হতে পারে ?" ইউসুফ বললেন, সে-ই তো আমাকে দিয়ে কুকর্ম করাতে ফুসলিয়েছে।" মহিলাটির পরিবার বর্গের এক (ব্যক্তি) শিশু ইংগিতসূচক সাক্ষ দিয়ে বললো, "ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্যবাদিনী আর সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যুক আর সে সত্যবাদী।" অতপর গৃহস্বামী যখন দেখল ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে বললো, "নিশ্চয়ই এটা তো মহিলাদেরই শঠতা, নিসন্দেহে মহিলাদের শঠতা ও কৌশল মারাত্মকই হয়ে থাকে। ইউসুফ! তুমি প্রসংগটি বাদ দাও, আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, নিসন্দেহে তুমিই অপরাধিনী।" শহরের নারীরা বলাবলি করতে লাগলো, "আযীযের স্ত্রী নিজের ক্রীতদাসকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে ওর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো দেখছি সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত।" যখন তাদের চক্রান্ত তার কানে গেল, সে তাদের দাওয়াত করলো বৈঠকখানায় তাদের প্রত্যেককে (ফল কাটার জন্য) একখানা করে ছুরি দিল। এদিকে ইউসুফকে তাদের সামনে আসার নির্দেশ দিল। মহিলারা ইউসুফকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল, তারা (ফলের পরিবর্তে) নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কসম, এতো কোনো মানুষ নয়, এতো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছু নয়।"

আযীযের স্ত্রী বললো, "দেখ, এ-ই তো সে ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করেছিলে। আসলে তো আমিই তাকে ফুসলিয়েছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আর আমি যা আদেশ করি সে যদি তা না করে তবে সে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে ও অপদস্ত হবে।

ইউসুফ বললেন, ও রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার পসন্দনীয়। যদি তুমি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করো তাহলে আমি তাদের চক্রান্তের জালে আটকে যাব আর জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। অতপর তাঁর রব তাঁর দুআ কবুল করেছেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত তাঁর থেকে প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।"

–সূরা ইউসুফ ২৩-৩৪

প্রাচীন মিশর সম্রাট-এর স্ত্রীর কাণ্ড

উপরিউক্ত বারটি আয়াত সূরা ইউসুফ থেকে নেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফকে আল্লাহ তাআলা اَحْسَنَ الْقَصَصِ বা সর্বোত্তম কাহিনী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর কুরআনের এ একটি সূরাতেই হযরত ইউসুফ আ.-এর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় অনেক বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত গুলোতে ২৩ আয়াত থেকে ৩৪ আয়াত পর্যন্ত তৎকালীন মিশরের বাদশাহর স্ত্রী যুলায়খার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁকে কুপে নিক্ষেপ করে চলে গিয়েছিলো। আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত ইউসুফ আ. কুপে সুস্থ ও জীবিত থেকে গেলেন। পথিক কাফেলার লোকেরা তাঁকে কূফ থেকে তুলে নিয়ে মিশর শহরে বিক্রি করে দিল। মিশর শহরে ইউসুফের এ ক্রেতা ছিলেন মিশরের বাদশাহ (আযীযে মেছের)। বাদশাহ ইউসুফকে কিনে নিয়ে স্ত্রীকে যা বললেন, কুরআনের ভাষায় তা হলো ঃ

اَكْرِمِىْ مَثْوٰهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ـ

"একে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করো, এ আমাদের কোনো উপকারে আসতে পারে অথবা একে আমরা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ২১

ইউসুফ আ. যখন যৌবনের স্তরে উপনীত হন, তিনি যখন আঠার-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক এবং সুষমামণ্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তখন তাঁর মালিকের স্ত্রী যুলায়খা ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে গোটা পরিবেশটাকেই ইউসুফের জন্য অস্বস্থিকর করে তুলেছিলো। প্রতিটি মুহূর্তেই যুলায়খা তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ওঁৎ পেতে

থাকতো ইউসুফকে কাবু করার জন্য। আর ইউসুফ–আল্লাহতে বিশ্বাসী নওযোয়ান, তাকওয়ার বলে বলীয়ান দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ মনোবল সম্পন্ন যুবক হয়েও এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্বীয় মানবিক দুর্বলতার কথা ভেবে কেঁপে উঠতেন। তিনি আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি আমার নেই। আল্লাহ! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিই আমাকে বাঁচাও।"–তাফহীমুল কুরআন

এমনি পরিস্থিতিতে একদা 'আযীযে মেছের' এর অনুপস্থিতিতে যুলায়খা ইউসুফের সাথে যে আচরণ ও কাণ্ড করেছিল উপরিউক্ত ১২টি আয়াতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। যুলায়খা ইউসুফকে বালাখানায় ঢুকিয়ে ক্রমাগত দরজাসমূহ বন্ধ করতে করতে ভিতরে নিয়ে গেল। কোনো কোনো বর্ণনায় সাতটি দরজায় সাতটি তালা দিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করে ভিতরের দিকে চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষ কক্ষে ঢুকে তালাবন্ধ করে দিয়ে যুলায়খা ইউসুফকে বললো, هَيْتَ لَكَ "শুন, তোমাকে বলছি, এসো।"

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদের বরাত দিয়ে মুফতী শফী রহ. তাঁর 'তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে' বলেন, এ সময় যুলায়খা ইউসুফকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করতে লাগলো। সে তার কুমতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইউসুফকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলো এই বলে, "ইউসুফ! তোমার মাথার চুল কত সুন্দর!" ইউসুফ বললেন, "মৃত্যুর পর এ চুল আমার মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" যুলায়খা বললো, "তোমার চক্ষু দুটো কতই না আকর্ষনীয়!" ইউসুফ বললেন, "মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখাবয়বের উপরে প্রবাহিত হবে।" যুলায়খা বললো, "তোমার চেহারাটা কতই না কমনীয়।" ইউসুফ বললেন, "এসবই তো মাটির খোরাক।"

এভাবে মহিলাটি ইউসুফকে ডাকছিলো শয়তানের পথের দিকে। পক্ষান্তরে ইউসুফ তাকে ডাকছিলো প্রকৃত সত্য তথা আল্লাহর পথের দিকে। ভাল লোকেরা সবসময়ই আল্লাহর পথে—সত্যের পথে সংগ্রাম করে যায়। আর মন্দ লোকেরা প্রতি নিয়ত মন্দের দিকে তথা শয়তানের পথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসার ৭৬ আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ۔

"যারা ঈমান এনেছে, তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে ; আর যারা কুফরী করেছে, তারা সংগ্রাম করে তাগূতের (সীমালংঘনকারী শয়তানী শক্তির) পথে।"

হযরত ইউসুফ আ. আর যুলায়খার উপরিউক্ত কথাগুলো যেন সূরা আন নিসার এ আয়াতেরই বাস্তব উদাহরণ। এভাবে যুলায়খা ইউসুফকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার সকল ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে যুবক ইউসুফকে এক বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করে যাচ্ছিল। ইজ্জতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুবক ইউসুফকে এহেন চরম পরিস্থিতিতেও পবিত্র থাকার তাওফীক দিলেন। অবস্থার নাযুকতা উপলব্ধি করা যায় আল্লাহর বাণী এ আয়াত থেকে ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ۔

"মহিলা তো আশক্ত হয়েই পড়েছে, আর তিনিও মহিলার প্রতি আশক্ত হয়ে পড়তেন, যদি তিনি তাঁর রবের বুরহান না দেখতে পেতেন।"
-সূরা ইউসুফ ঃ ২৪

অর্থাৎ যুলায়খা তো পাপ কাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, আর তার বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্রের জালের কারণে ইউসুফের মনেও মানবিক দুর্বলতার কিছুটা উন্মেষ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় বুরহান (রবের প্রমাণ) হযরত ইউসুফের সামনে তুলে ধরলেন। ইউসুফ আ. যদি তাঁর পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। রাব্বুল আলামীনের প্রমাণ দেখে নেয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা তাঁর অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

'রব' এর 'বুরহান' মানে স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ আ.-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কুরআন শরীফে তা ব্যক্ত করা হয়নি। এ কারণে 'বুরহান' বা প্রমাণ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তখন মুজিযা হিসেবে ইউসুফের পিতা হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছবি এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যে, তিনি হাতের আংগুল দাঁতে কামড়

দিয়ে তাকে সাবধান করে দিচ্ছেন। কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, তখন আযীযে মেছেরের মুখচ্ছবি তার সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেউ বলেছেন, ইউসুফের দৃষ্টি ছাদের উপর পড়তেই সেখানে কুরআন শরীফের এ আয়াত লিখিত দেখলেন, وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا "আর যিনার ধারেও যেও না, নিশ্চয়ই তা ফাহিশা কার্জ ও অত্যন্ত খারাপ পথ।" কেউ কেউ বলেছেন, যুলায়খার ঘরে একটি মূর্তি ছিল। ঐ মুহূর্তে যুলায়খা মূর্তিটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে ইউসুফ তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, সে বললো, এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গুনাহ্ করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ বললেন, আমার উপাস্য তো আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্য। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কারও কারও মতে হযরত ইউসুফ আ.-এর নবুওয়াত ও বিভু জ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এ দিব্য দৃষ্টির কারণ।—মাআরেফুল কুরআন

তাফসীরে ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, কুরআন পাক যতটুকু বর্ণনা করেছে ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ আ. এমন কিছু দেখেছেন, যার কারণে তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরীত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল —তাফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর যে কোনো একটি হতে পারে। তাই নিশ্চিতভাবে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না।—ইবনে কাসীর থেকে মাআরেফুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যুলায়খার সেই নির্জন কক্ষে আল্লাহর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই ইউসুফ আ. সেখান থেকে পলায়োনদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয পত্নী যুলায়খা তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বাইরে যেতে বাধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প—তাই তিনি থামলেন না। ফলে তাঁর জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। মাআরেফুল কুরআনে মুফতী শফী রহ. ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ আ. দৌড়িয়ে দরজার ধারে পৌঁছামাত্র যুলায়খার বন্ধ করা তালাগুলো আপনা আপনি খুলে নীচে পড়ে যেতে থাকে। এভাবে প্রত্যেকটি দরজার তালা খুলে পড়ে যেতো আর ইউসুফ আ. প্রতিটি কামরার দরজা পেরিয়ে যেতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ আ. দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। যুলায়খা ও তাঁর পেছনে পেছনে যেতে যেতে শেষ দরজার

বাইরে চলে গেল। উভয়ে দরজার বাইরে এসেই দেখলো আযীযে মেছের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে হযরত ইউসুফ আ. তাকওয়া বলে তথা আল্লাহর অসীম রহমতে এ মারাত্মক ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল থেকে রক্ষা পেলেন। তাঁর ঈমানী শক্তি এবং সর্বত্র আল্লাহর উপস্থিতির দ্বিধাহীন অকৃত্রিম বিশ্বাস থাকায় আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করলেন।

কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বিশেষত যুব শ্রেণীর জন্য হযরত ইউসুফ আ.-এর এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় অনেক বিষয়ই রয়েছে। প্রথমত, আমরা দেখতে পেলাম বাদশাহর স্ত্রী নিজেই যুবক ইউসুফকে প্ররোচিত করেছে। দ্বিতীয়ত, মহিলাটি বাদশাহর স্ত্রী, তার বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলেও বাদশাহর স্ত্রী হওয়ায় এ নিয়ে হৈ চৈ করার সাহস কেউ করতো না। তৃতীয়ত, ঘটনা ঘটে গেলে ইউসুফের জন্যও তেমন মাথা ব্যথার বিষয় ছিল না, কারণ এটাতো ইউসুফের দেশ না— ইউসুফের দেশ কেনানে হলে হয়তো দেশী-বিদেশী লোকেরা তাকে ভৎর্সনা বা তার দুর্নাম করতো। চতুর্থত, যুলায়খা তো এমন মযবুত ব্যবস্থা করেছে যে ঘটনাটি ঘটে গেলেও তা জানার কারো সাধ্য ছিল না। পঞ্চমত, যুলায়খার বাসনা পূরণ করলে বরং ইউসুফ তার পূর্ণাঙ্গ আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতা পেতো। সর্বোপরি মহিলাটি যেমন ইউসুফের প্রেমে বিভোর ছিল তেমনি ইউসুফও ছিল ভরা যৌবনের অধিকারী যুবক। এতসব অনুকূল পরিস্থিতি ও সুবিধাজনক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোন্ সে শক্তি, যা যুবক ইউসুফকে যুলায়খার বাসনা পূরণে বিরত রেখেছে ? কুরআনের ভাষায় তা ছিল ইউসুফের রবের 'বুরহান'। আসলে এটাই 'তাকওয়া', এটাই তাওহীদ বিশ্বাস তথা আল্লাহর সর্বত্র উপস্থিতির উপলব্ধির প্রমাণ, এটাই মূলত আখিরাত বিশ্বাসের সত্যিকার তাৎপর্যানুভূতির ফল—যা হযরত ইউসুফ সুদৃঢ় ঈমানী শক্তির ফলে আল্লাহর খাস রহমতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ রহমতে ধন্য করেছিলেন।

আবার ইউসুফ তো দেখেছেন যুলায়খা কামরাগুলোর দরজা তালাবদ্ধ করে দিয়েছিল। তবুও কেন তিনি যুলায়খার কুকর্ম থেকে বাঁচার জন্য সেই তালাবদ্ধ দরজার দিকে দৌড়ালেন ? তিনি দৌড়াচ্ছিলেন আর তালাগুলো কেন একে একে সবকটিই খুলে নীচে পড়ে যাচ্ছিল ?

আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য—মুত্তাকীগণের জন্য এখান থেকে সবক নেয়ার—ফিকির করার বিষয় নিহিত রয়েছে। আসলে ঐ বিশেষ মুহূর্তে হযরত ইউসুফ আ. নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কোনো মতে বাঁচার পথ খুঁজছিলেন।

তখন নিজ অবস্থান থেকে দৌড় দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছা ছাড়া তাঁর আর কোনো পথ ছিল না। তাঁর আত্মরক্ষার জন্য দরজা পর্যন্ত দৌড় দিতে পারার সর্বশেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে তিনি বাঁচার চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টার যেখানে শেষ, সেখানে আল্লাহ্‌র সাহায্যের শুরু। এভাবেই আল্লাহ্‌র কোনো বান্দা অথবা বান্দাদের কোনো জামায়াত যখন নিজের বা নিজেদের সর্বশেষ শক্তিটুকু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে শেষ করে দেয় তখনই আল্লাহ্ তার বা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। এটা আল্লাহ্‌র আদত, যার কোনো পরিবর্তন নেই। কুরআনের ভাষায় ঃ

لَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ -

"আল্লাহ্‌র কথার কোনো পরিবর্তনকারী নেই।"

এদিকে দরজার বাইরে দুজনই আযীযে মেছেরকে দাঁড়ানো দেখতে পেল। যুলায়খা চমকে উঠলো, আর সম্পূর্ণ বিপরীত দোষ ও অপবাদ চাপিয়ে দিল ইউসুফের উপর। সে স্বামীকে বললো, যে লোক তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তার শাস্তি এছাড়া কি হতে পরে যে তাকে জেলে পাঠানো হবে অথবা কোনো কঠোর দৈহিক যন্ত্রণা দেয়া হবে ?

এতক্ষণ তো ইউসুফ সৌজন্য বোধের কারণে কোনো কথা বলেননি। এবার কিন্তু তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তাছাড়া প্রতিবাদ না করলে তো যুলায়খার মিথ্যা ও অপবাদ সমর্থন করা হয়। তিনি বলে উঠলেন ঃ

هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَّفْسِىْ -

"সে-ই তো নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল।"

আযীযে মেছের পড়ে গেলেন বিপাকে। কে সত্যবাদী তা নির্ণয় করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। ঠিক এ সময় আল্লাহ তাআলা এক অলৌকিক ব্যবস্থা করে দিলেন। ঐ পরিবারেই অবস্থানরত একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্ তাআলা বিজ্ঞ ও দার্শনিকসুলভ বাকশক্তি দান করলেন। দোলনার শিশুটি থেকে এ ধারণা করাই যায় না যে সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে ও বুঝবে, আর তারপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। যে শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ আ.-এর মুজিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুললো, যখন আযীযে মেছের ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত।

আল্লাহ্ তাআলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি করিয়েছেন। সে বললো, ইউসুফের জামাটি দেখ—যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে তবে যুলায়খার কথা সত্য, ইউসুফ মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন থাকে তাহলে যুলায়খা মিথ্যুক আর ইউসুফ সত্যবাদী। কারণ, তাতে বুঝা যাবে যে ইউসুফ আ. পলায়নরত ছিলেন, কিন্তু যুলায়খা তাকে পলায়নে বাধা দিতে চেয়েছিল। অতপর যখন শিশুর বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছনের দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

শিশুর মুখে যুক্তিভিত্তিক কথা শোনার সময়ই আযীযে মেছের বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউসুফের পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইউসুফের জামাটি পেছনের দিকে ছেড়া দেখে বাদশাহ্ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে দোষ যুলায়খারই এবং ইউসুফ আ. পবিত্র, তখন তিনি যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِ كُنَّ اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ ۝

"এতো তোমাদেরই ষড়যন্ত্র ; তোমাদের ষড়যন্ত্র খুবই জটিল।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ২৮

বাদশাহ্ যুলায়খাকে ভর্ৎসনা করার পর ইউসুফ আ.-কে বললো, يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا -"ইউসুফ! এটাকে উপেক্ষা করো"—অর্থাৎ যুলায়খার এ ষড়যন্ত্র ভুলে যাও—এটা বলাবলি করতে যেয়ো না, নয়তো বে-ইজ্জতী হতে থাকবে। তারপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললো ঃ

وَاسْتَغْفِرِىْ لِذَنْۢبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝

"তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, তুমিই তো অপরাধী।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ২৯

অর্থাৎ স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও, কারণ স্বামীর অবর্তমানে তুমি তারই অধিকারে খেয়ানত করেছো। অথবা ইউসুফের কাছে ক্ষমা চাও, কারণ নিজে দোষ করে তার উপর চাপিয়েছ।"–মাআরেফুল কুরআন

উপরে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর কাণ্ডের একটা দিকের আলোচনা করা হলো। অবশ্য এ দিকটার বেশ গুরুত্বও রয়েছে। আর ইউসুফ সম্পর্কিত কাহিনীর আরেকটি দিক নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ইউসুফের প্রতি যুলায়খার আশক্তির বিষয়টি জনসমক্ষে রটে গেল। বিশেষত মহিলাদের মাঝে তা নিয়ে চলছিল বেশ কানাঘুষা। সে সমাজের

মহিলাদের এ কানাঘুষার কথা যুলায়খার কানেও গেল। গোপনে যুলায়খার বিরুদ্ধে মহিলাদের কুৎসা রটনার খবর শুনে যুলায়খা এক ফন্দি আঁটলো। সে একদিন ওসব মহিলাকে ভোজসভার আহ্বান করলো। মহিলাদের সামনে বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রী ও ফলমূল রাখা হলো। যেহেতু কিছু খাবার ছিল চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার। তাই প্রত্যেক মহিলাকে একটি করে চাকুও দেয়া হলো। মহিলারা খাবার কাটতে উদ্যত হচ্ছিল, এমন সময় যুলায়খা পাশের কক্ষ থেকে ইউসুফকে মহিলাদের সামনে হাজির করলো। মহিলারা ইউসুফকে দেখে তাঁর রূপ সৌন্দর্যে স্থির থাকতে পারলো না। তারা ইউসুফের প্রতি বিমোহিত হয়ে অপলকনেত্রে তাকিয়ে চাকু দিয়ে খাবারের পরিবর্তে নিজে নিজ হাত কেটে ফেললো। তারা হতভম্ব হয়ে বলতে লাগলো ঃ

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

"হায় আল্লাহ! এতো মানুষ নয়, অবশ্যই তিনি একজন সম্মানিত ফেরেশতা।" অর্থাৎ এত সুন্দর নুরানী চেহারা মানুষের হতে পারে না।"
–সূরা ইউসুফ ঃ ৩১

যুলায়খা তখন মহিলাদের বললো, "দেখলে তো, এ-ই তো সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে (আমার দুর্ণাম রটাতে) আসলে আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, কিন্তু সে পবিত্র রয়েছে। ভবিষ্যতে সে যদি আমার আদেশ অমান্য করে তাহলে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং লাঞ্ছিতও হবে।"

যুলায়খা যখন দেখলো সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে মহিলাদের সামনেই ইউসুফকে ভয় দেখাতে লাগলো। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফকে বলতে লাগলো, "তুমি তো যুলায়খার কাছে ঋণী, কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।" ইউসুফ আ. বললেন, "হে রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে আমি কারাগারকেই পসন্দ করি। তুমি যদি ওদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করো, তাহলে তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারি আর তখন আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" অতপর আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করে তাঁকে ওদের চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে হযরত ইউসুফ আ.-কে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের জাল থেকে উদ্ধার করে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখলেন। মিশর সম্রাটের স্ত্রী যুলায়খার সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেল। বস্তুত তাওহীদ ও আখিরাতে

বিশ্বাসের প্রকৃত তাৎপর্যের এটাই চমৎকার উদাহরণ। সকল যুগে আল্লাহর পথের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ এমনি আখলাকের অধিকারী হয়ে থাকে। আসলে সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ ও সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান। তার প্রকৃত অনুভূতি হযরত ইউসুফ আ.-কে যেভাবে যুলায়খার ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্ত রেখেছিল, সকল যুগের মর্দে মুমিনগণও এভাবেই সত্যিকার তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আর নিজেকে এ সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং সে উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখাই ঈমানদার লোকদের কাজ।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ -

❐

তিন

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ط قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

"বাদশাহ মহিলাদের বললো, তোমাদের অবস্থা কেমন যখন তোমরা ইউসুফকে দিয়ে নিজেদের মনষ্কামনা পূরণে তাকে ফুসলিয়েছিলে?" তারা বললো, "আল্লাহরই মহত্ব, আমরা তো তার মধ্যে সামান্যতম খারাপীও দেখিনি।" বাদশাহর স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন তো সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, সে তো সত্যবাদী।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৫১

ইউসুফ আ.-এর চারিত্রিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর স্বীকারোক্তি

এ হচ্ছে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর কাণ্ডের আরেক দিক। এখানে 'আযীযে মেছের'-এর স্ত্রীই নয় বরং সমাজের অন্যান্য মহিলারাও যে হযরত ইউসুফের চরিত্রের স্বচ্ছতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল সেকথা ফুটে উঠেছে। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, মিশর সম্রাটের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ইউসুফকে যে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলিয়েও কঠিন ষড়যন্ত্র করেও তাকে কাবু করতে পারলো না, অধিকন্তু সম্রাটের সামনে উল্টো ইউসুফের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত মিশর সম্রাটও প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলো আর ইউসুফকে বললো বিষয়টি নিয়ে যেন নাড়াচাড়া না করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও লোক সমক্ষে স্ত্রীর মুখ বাচানোর জন্য ইউসুফকে জেলখানায় পাঠানো হলো। জেলখানায় তাঁকে বন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছিল দীর্ঘ আট-নয় বছর।–তাফহীমুল কুরআন

ইউসুফ আ.-এর সাথে আরও দুই যুবকও জেলখানায় আটক ছিল। দুই যুবকের দুটো স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য তারা হযরত ইউসুফকে অনুরোধ জানালো। তারা দীর্ঘদিনের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় হযরত ইউসুফকে অত্যন্ত সৎ, চরিত্রবান ও সুবিজ্ঞ জানতে পেরেছে বলে উভয়ে তাঁর কাছে

নিজ নিজ স্বপ্নের তা'বীর জানতে চাইলো। হযরত ইউসুফ আ. তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। ইতিমধ্যে তাদের একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী জেলখানা থেকে মুক্তিও পেয়ে গেলো।

একদিন মিশর সম্রাট দরবারের লোকদের ডেকে তার এক আশ্চর্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। লোকেরা বললো, "এটা তো একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের কথা আর আমরা তো স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত নই।" সে সময় ওখানে জেলখানা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকটিও উপস্থিত ছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়লো দীর্ঘদিনের জেলখানার সাথী ইউসুফের কথা এবং স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে তার বিজ্ঞতার কথা। সে বললো, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দেব, আমাকে একটু জেলখানায় ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিন। যুবকটি সভাসদকে ইউসুফের নির্ভুল স্বপ্ন তা'বীর জানার বিষয়েও অবহিত করেছিল।–তাফহীমুল কুরআন

যুবকটিকে জেলখানায় পাঠানো হলো। সে ইউসুফকে বাদশাহর স্বপ্নের বিষয় জানালে ইউসুফ আ. বাদশাহর স্বপ্নের তা'বীর বলে দিলেন। যুবক বাদশাহর দরবারে গিয়ে ইউসুফের বর্ণিত তা'বীর—স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিল। বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আস।" বাদশাহর পাঠানো লোক যখন ইউসুফের কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ দিল, তখন ইউসুফ তাকে বললেন, আগে তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে তার কাছ থেকে জেনে আস তো, ঐসব মহিলাদের কি অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটেছিল ? নিশ্চয়ই আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন।"

এ খবর বাদশাহর কাছে গেলে তিনি সেসব মহিলাদের একত্র করে তাদের কাছ থেকে ইউসুফ সম্পর্কে তার চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আলোচ্য আয়াতে বাদশাহর সেই জিজ্ঞাসা ও মহিলাগণ থেকে সেই জিজ্ঞাসার জবাব এবং মিশর বাদশাহর স্ত্রীর স্বীকৃতি কুরআনের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাদশাহ মহিলাদের একত্র করে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ঘটনাটি কি ছিল, যখন তোমরা নিজেদের কুমতলব পূরণের জন্য ইউসুফকে ফুসলিয়ে ছিলে ? অর্থাৎ ইউসুফ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি ? জবাবে মহিলারা একবাক্যে বললো, "আল্লাহরই মহত্ত্ব, আমরা তার মধ্যে খারাপির লেশমাত্রও দেখতে পাইনি। বাদশাহর স্ত্রী যখন দেখলো প্রকৃত সত্য বেরিয়ে এসেছে, তখন সেও মূল ঘটনার প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত করলো। সে স্বীকার করলো যে আসলে দোষী তো সে নিজে। সে বলে উঠলো, আমিই তাকে দিয়ে আমার মনষ্কামনা পূরণের চেষ্টা করেছিলাম। সে নিশ্চয়ই পবিত্র

চরিত্রের অধিকারী। আমি যখন দোষটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম, তখন সে যে বলেছিল আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম। তার একথায় সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।"

বাদশাহর স্ত্রী ইউসুফকে দিয়ে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার সকল ষড়যন্ত্র যখন ইউসুফের সুদৃঢ় ঈমানী শক্তি ও অনঢ় মনোবলের কাছে হেরে গেল, আর ইউসুফের পেছনে পেছনে তাকে ধরার জন্যে যখন বাদশাহর স্ত্রী দৌড়াচ্ছিল এবং ঘরের বাইরে এসে উভয়ই বাদশাহর সামনে পড়ে গেলো ; তখন মহিলাটি স্বামীর কাছে উল্টো ইউসুফের দোষ করার কথা বানিয়ে বলেছিল। সে নিজের দোষটা ইউসুফের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তারপর বাদশাহ ইউসুফের নির্দোষী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতও হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ইউসুফকে জেলখানায় ঢুকানো হলো। তাঁকে দীর্ঘদিন জেলখানায় পঁচতে হলো। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়েও মিথ্যা অপবাদের গ্লানী কাঁধে নিয়ে তাঁকে জেলখানায় শাস্তি পেতে হলো। এতসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইউসুফ আ. ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতপর বাদশাহ যখন তার স্বপ্নের তা'বীর ইউসুফ থেকে লোক মারফত জানতে পেলেন, তখন তাঁকে জেলখানা থেকে নিয়ে আসতে বলা হলে ইউসুফ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যে মিথ্যা অজুহাতে জেলে গেলেন তার যথাযথ ফায়সালা ছাড়া তিনি মুক্তির আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি চাইলেন তাঁর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি আগে জনসমক্ষে আসতে হবে, তারপর তিনি জেল থেকে বেরুবেন। আর সে জন্যেই তিনি বলে পাঠালেন, আগে বাদশাহকে গিয়ে বলো মহিলাদের হাত কাটার ঘটনাটি কি ছিল ? বাদশাহ কি সে জন্যে তাঁকে সন্দেহ করেন ? সেজন্যে কি তাঁকে দোষী মনে করা হয় ?

এখানে প্রসংগত এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, ইউসুফকে মুক্তির কথা শুনালে তিনি হাত কর্তনকারীনী মহিলাদের কথা বললেন, অথচ ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু বাদশার স্ত্রীর কথা বলেননি। তিনি যে অত্যন্ত শালীনতাসম্পন্ন অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন, এটা তার আরেকটি প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন বিধায় সেই নিমকের কদর স্বরূপ বাদশাহর স্ত্রীর কথা বলেননি। তৃতীয়ত, বাদশাহর স্ত্রী যতবড় অন্যায়ই করুক না কেন, সে বাদশাহর কাছে ছিল খুবই প্রিয়পাত্রী। কাজেই ইউসুফ তার সম্পর্কে উক্তি করা পসন্দ করেননি। চতুর্থত, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল ইউসুফ আ.-এর উদ্দেশ্য। তাই তিনি মহিলাদের কথা বললেন।

বাদশাহর স্ত্রীর কথা বললে তো সরাসরি তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ বুঝা যেতো। তিনি এভাবে বাদশাহর স্বীয় অপমানিত হওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না।

মোটকথা, বাদশাহর জিজ্ঞাসার উত্তরে এলাকার সকল মহিলাই ইউসুফের পবিত্রতা ও নির্দোষিতার বিষয় স্বীকার করলো। সেই পরিস্থিতিতে বাদশাহর স্ত্রী যুলায়খাও নিজের দোষী হওয়ার কথা স্বীকার করে ইউসুফের নিষ্কলুষ ও চরিত্রবান হওয়ার কথা প্রকাশ করলো। আসলে সেই মুহূর্তে যুলায়খার জন্য নিজের দোষ স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না। অবস্থা বেগতিক দেখে যুলায়খা প্রকাশ্যে স্বীকার করলো যে, এখন তো সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে আর যুলায়খা নিজেই ইউসুফকে ফুসলিয়েছে আর ইউসুফ পবিত্র চরিত্রের মানুষ। এমন ফেরেশতা স্বভাবের লোকটার এহেন দুষ্কর্মের সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই।

❒

চার

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

"আর স্মরণ করো, মূসা যখন তার জাতির লোকদের বলেছিল, তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যে তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যারা তোমাদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিচ্ছিল। আর তারা তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের জন্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল কঠিন পরীক্ষা।"—সূরা ইবরাহীম ঃ ৬

পুরুষবিহীন সমাজ নারীদের জন্য বিপজ্জনক ও শাস্তিতুল্য

আলোচ্য আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত মূসা আ.-এর যামানার এক জঘন্য ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতটি হযরত মূসা আ. তাঁর জাতিকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণের মর্মার্থস্বরূপ। আর ভাষণটি ছিল সেই সময়ের, যখন মূসা আ.-এর কওম ফেরাউনী সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এ ভাষণে মূসা আ. তাঁর কওমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় থেকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে ও দয়ায় তোমাদের নাজাত দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার সেই দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখা, সবসময় আল্লাহর শোকরগুযার থাকা, সেই অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে কখনো যেন এমন স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবে না যাও, যার শাস্তি আল্লাহ তোমাদের উপর ফেরাউনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারের আকারে নিপতিত করেছিলেন।

হযরত মূসা আ.-এর সময়কার ইতিহাস মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার ইসরাঈলীদের শুনিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, সমসাময়িক ইসরাঈলীরা যে মূসা আ.-এর সেই শিক্ষা ভুলে গিয়ে শয়তানের পথে পা দিচ্ছে এবং ইসলামের বিরোধীতায় মত্ত হয়ে নতুন করে নিজেদের দুর্ভাগ্যই ডেকে আনছে—সে কথা তাদের স্মরণ করিয়ে

দেয়া এবং পুরানো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষ থেকে বিরত রাখা।–তাদাব্বুরে কুরআন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।

সূরা ইবরাহীমের এ হচ্ছে ষষ্ঠ আয়াত। শব্দের সামান্য পার্থক্য সহ এ আয়াতটি সূরা আল বাকারার ৪৯ আয়াতে এবং সূরা আল আরাফের ১৪১ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآئَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآئَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

"স্মরণ করো যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রদের হত্যা করতো আর মেয়েদের জীবিত রেখে তোমাদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতো। এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৯

এখানে পূর্ববর্তী দুটো আয়াতে বনী ইসরাঈলীদের আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি সম্বোধন করে আয়াত নাযিল করেছেন। আলোচ্য আয়াতে অবশ্য মূসা আ.-এর ভাষণের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে।

সূরা আল আরাফে বলা হয়েছে এভাবে—

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآئَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآئَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

"স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে ফেরাউনীদের থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো মেয়েদের জীবিত রাখতো, এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল এক মহাপরীক্ষা।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৪১

সূরা আল আরাফের এ আয়াতেও হযরত মূসা আ.-এর ভাষণের উদাহরণ দেয়া হয়নি। বরং সরাসরি ইসরাঈলীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তিনটি আয়াতেই বনী ইসরাঈলদের প্রতি অত্যাচারকারী ফেরাউনের লোকদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে آل فِرْعَوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ ফেরাউনের লোকজন। آلُ অর্থ বংশধর, অনুগত ও অনুসারী।

ফেরাউনীদের অত্যাচার করার ঘটনা ছিল এই যে, একদা ফেরাউনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জ্যোতিষীরা তাকে বললো যে, বনী ইসরাঈল

বংশে এমন এক লোক জন্মগ্রহণ করবে যে আপনার কর্ম ও রাজত্ব ধ্বংস করে দেবে। তখন ফেরাউন এক ফরমান জারি করে বলে দিল যে, বনী ইসরাঈলের ঘরে কোনো ছেলের জন্ম হলে তাকে হত্যা করে দিবে আর মেয়ে জন্ম নিলে তাকে খিদমতের জন্য জীবিত রাখবে। কিন্তু আল্লাহ হযরত মূসা আ.-কে সৃষ্টি করে জীবিত রাখলেন।—আল কুরআনুল কারীম, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর থেকে তাঁর জোড়া হিসেবে সৃষ্টি করলেন বিবি হাওয়া আ.-কে। অতপর মানব সমাজের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সৃষ্টির ধারা জারি করেন। নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন স্পৃহা সৃষ্টি মূলত একটি সৃষ্টি কৌশল স্বরূপ। নারী বিহীন পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ তেমনি পুরুষ বিহীন নারীর জীবন বৃথা। বরং নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক বিধায় উভয়েই একে অন্যের অভাবে অসার জীবনযাপন করে। শক্তি-সামর্থ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রাকৃতিক বিভাজন অনুযায়ী পুরুষ বিহীন সমাজ নারী-জীবনের জন্য বিপজ্জনক। ফেরাউন সেই প্রাকৃতিক বিভাজন বিনষ্টকারী ও সমাজ শৃংখলা ধ্বংসকারী পদক্ষেপ নিয়েছিল।

❒

পাঁচ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কাল হয়ে যায়। আর সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে তার কওম থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবে, এ অপমান সহ্য করে ওকে থাকতে দেবে, না ওকে মাটিতে পুতে ফেলবে। দেখ, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা নিকৃষ্ট।"

–সূরা আন নহল ঃ ৫৮-৫৯

মুশরিক সমাজে কন্যা সন্তানের জন্ম অসহনীয় ও মনস্তাপে ক্লিষ্ট হওয়ার কারণ

আলোচ্য আয়াতে রসূলের সময়ে আরবের মুশরিকদের কতিপয় ভ্রান্ত চিন্তা ও আচরণের মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাহলো যখন ওদের কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ার খবর পিতার কানে পৌঁছতো, তখন পিতার চেহারা কালো হয়ে যেতো, রাগে ও ক্ষোভে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো আর সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতো। এর গ্লানি হেতু সে তার কওম থেকে আত্মগোপন করতো—সমাজের লোকদের মুখ দেখাবে কিভাবে—এ ছিল তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। মেয়ে বড় হলে তাকে অন্য কোনো ছেলের কাছে বিয়ে দিতে হবে ভেবে সে লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়তো। এ হীনতা সত্ত্বেও সে কন্যাটাকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে —এ ছিল তার দুঃচিন্তা।

পূর্ববর্তী দুটো আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর দেয়া রিয্কের একাংশ তাদের উপাস্যদের জন্য নির্ধারণ করে থাকে। আল্লাহর দেয়া রিয্ক প্রাপ্তিতে তাদের বাতিল মাবুদদের ভূমিকা রয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। এমনকি রিয্ক থেকে মান্নত বা কুরবানীর একাংশ নির্ধারণ করতো তাদের ওসব

উপাস্যদের নামে। তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। তারা নিজেদের কন্যা হওয়াকে এত খারাপ মনে করতো যে, কন্যা জন্মালে তারা কওম থেকে দূরে গিয়ে আত্মগোপন করতো।

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী রহ. তার তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "অর্থাৎ তারা তো আল্লাহর ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করে কন্যাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। অথচ কন্যা সম্পর্কে তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে, কাউকে কন্যা হওয়ার খবর দিলে তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর তখন থেকে সে মনের ক্ষোভে মনের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ে। কন্যা হওয়াটাকে নিজের জন্য লজ্জার বিষয় মনে করে সমাজ থেকে সে আত্মগোপন করতে থাকে আর সর্বক্ষণ এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে যে, এ অপমান সহ্য করে কন্যাটাকে জীবিত রাখবে, নাকি ওকে মাটিতে দাফন করে সেই অপমান থেকে নিস্তার লাভ করবে।"

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, "জাহেলী যুগে অনেক নিষ্ঠুর পিতা কন্যাদের হত্যা করতো অথবা যমীনে জীবন্ত দাফন করতো। ইসলাম এসব মন্দ প্রথার উচ্ছেদ করে এবং এমনভাবে তার মূলোৎপাটন করে ফেলে যে ইসলামের স্বর্ণযুগে এ নিষ্ঠুরতার একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো কোনো তাফসীরকার أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ এর অর্থ কন্যাকে অপমান সহ্য করে জীবিত রাখবে—এর পরিবর্তে তরজমা করেছেন সে কন্যাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে জীবিত রাখবে। অর্থাৎ কন্যাকে জীবিত রাখলেও তার সাথে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করবে যেন সে তার সন্তানই নয়, বরং যেন সে মানুষই নয়।"

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ "দেখ, তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট!" আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কন্যাদের সম্পর্কে তাদের যে নির্যাতনমূলক সিদ্ধান্ত ছিল, তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হলো এই যে, তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করে থাকে। তাও আবার কন্যা সন্তান, যার ব্যাপারে নিজেদের অবস্থা হলো অসহনীয় অপমানবোধ। যেন তাদের জন্য চাই উত্তম বস্তু, আর আল্লাহর জন্যে নিকৃষ্ট বস্তু !

আল কুরআন জাহেলী যুগ তথা মুশরেকী সমাজের কুপ্রথা—কন্যা সন্তানের জন্ম সংবাদে স্বয়ং জন্মদাতা পিতার প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে কন্যা সন্তানের সেই ভয়াবহ অবস্থার অবসান ঘটে। আল্লাহর নবী কন্যা সন্তানের

লালন-পালন করাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। পৃথিবীতে মানব বংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে নর-নারীরূপে সৃষ্টি করে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম-প্রীতি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ প্রেম-প্রীতি ও আকর্ষণের সদ্ব্যবহার এবং রীতিনীতিও শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের স্বভাবধর্ম ইসলাম মানব জাতিকে মান-সম্ভ্রম নিয়ে নর-নারীর সেই সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার ব্যবস্থাও শিখিয়েছে। ইসলাম হচ্ছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির কল্যাণের স্বাভাবিক বিধান। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ তাদের রব আল্লাহ্ তাআলার সেই কল্যাণকর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে বহুমুখী সমস্যা ও যন্ত্রণার শিকার হয়ে আসছে। আর অন্য পথে তার সমাধান করতে গিয়ে সম্মুখীন হচ্ছে আরও বহুবিধ. নতুন নতুন সমস্যার।

জাহেলী যুগের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আধুনিক যুগেও বিরাজমান রয়েছে। হয়তো ধরণ কিছুটা পাল্টিয়েছে। তখনকার যুগে কেবল কন্যার জন্ম হওয়াকে গ্লানী ও অপমানকর মনে করা হতো কিন্তু আজকের বিশ্বের উন্নয়নমুখী দেশে তো সন্তানের আগমনকেই অসহনীয় ভাবা হচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, অধিক সন্তানের পরিবারকে সর্বদিক থেকে নাজেহাল হতে দেখা যায়। পাশাপাশি একটি সন্তান পাওয়ার জন্যও তো অনেক দম্পতিকে পাগলপারা হয়ে ঘুরতে দেখা যায়। আসল কথা, মানুষতো ব্যাষ্টিক (Micro) দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে থাকে, আর আল্লাহর তো রয়েছে মহা সামষ্টিক (Super Macro) দৃষ্টিকোণ। বিশ্বসমাজে দেখা যায় প্রাচুর্যের দেশ (Aflucnt Country) বলে কথিতরা উন্নয়নমুখী জাতি (Developing Nations) সমূহকে জন্মনিরোধের সবক দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের দেশে ব্যাপক হারে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে অন্য দেশের জনসমষ্টিকে! আবার সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন চলছে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অধিকার ও মর্যাদা তো সেই সত্ত্বাই নির্ধারণ করতে পারেন যিনি সৃষ্টি করে লালনপালন করছেন। অন্য কারো পক্ষে তা আদৌ সম্ভব হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ইসলামী জীবন বিধান বিশ্বের বুকে নারী মুক্তির ব্যবস্থা করেছে, সেই জীবন বিধানকেই তো কেউ কেউ নারী মুক্তির অন্তরায় ভাবছে। এই হচ্ছে এদের ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা অথবা জেনেবুঝে ইসলামদ্রোহীতার আত্মঘাতী ভূমিকা।

বস্তুত প্রাচীন জাহেলিয়াত ও আধুনিক জাহেলিয়াতের ইসলাম দ্রোহীতার ব্যাপারে রয়েছে এক আত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্য। অবশ্য এ দুয়ের ধরণ ও এতদোভয়ের অনুসারীদের মধ্যে বেশ অগ্রগতির দিক যে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর তাহলো ঃ এক. প্রাচীন জাহেলিয়াতে

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো আর নব্য জাহেলিয়াতে কন্যা বা ছেলে নির্বিশেষে যে কোনো সন্তানের জন্মনিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়। দুই. প্রাচীন জাহেলিয়াতে শুধু কন্যার জন্মকে লজ্জাকর মনে করা হতো আর নব্য জাহেলিয়াতে যে কোনো প্রকারের সন্তানই অকাম্য ও অনভিপ্রেত। তিন. প্রাচীন জাহেলিয়াতে সন্তান দুনিয়াতে আসার পর ব্যবস্থা নেয়া হতো আর আধুনিক জাহেলিয়াতে সন্তান যাতে জন্মই নিতে না পারে সে ব্যবস্থাই করা হয়। চার. প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুক্তি ছিল অভাব-অনটন, মান-মর্যাদা ও সামাজিক রীতিপ্রথা ; আধুনিক জাহেলিয়াতের যুক্তি জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণের নামে প্রাচীন জাহেলিয়াতেরই অনুরূপ।

❒

ছয়

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"যে ব্যক্তি নেক আমল করবে—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী—সে মুমিন হলে অবশ্যই তাকে দুনিয়াতে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' (পবিত্র জীবন) দান করবো। আর আখিরাতে তাদের কাজের প্রতিফল দেব উত্তমভাবে, যা তারা আমল করতো।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯৭

মুমিনগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নেক আমলের ফলে হায়াতে তাইয়্যেবা 'পবিত্র জীবন' লাভ করতে পারে

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের কর্মফল ও সফলতার নিয়ম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে নিজ নিজ অবস্থার প্রেক্ষিতে নেক কাজ করে দুনিয়াতে যেমন পবিত্র জীবন লাভে সক্ষম হয়, আখিরাতেও তেমনি নেক আমলসমূহের উত্তম সুফল পেতে থাকবে। এখানে সমস্ত নেক আমল সম্পর্কে একটা সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ নেক আমলের অভ্যাস করে, আর নেক আমলগুলোও বাহ্যিক দৃষ্টিতেই নয় ; বরং প্রকৃতপক্ষেই যদি নেক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমনসব লোকদের দুনিয়ার জীবনে উত্তম ও পবিত্র জীবনযাপন করাবেন।–শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আয়াতটির তরজমা এভাবেও বুঝতে পারি, যে ব্যক্তি নেক আমল করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও রসূলের আদর্শের ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, তাকে আল্লাহ তাআলা 'হায়াতে তাইয়্যেবা' দান করবেন ; সে ব্যক্তি নারী হোক কিংবা পুরুষ।

সূরা আন-নাহলের এ আয়াতটিতে সুস্পষ্ট করে নারী ও পুরুষের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এ ওয়াদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ, সেই যুগে মুসলিম পুরুষ যেভাবে নিজের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতো, তেমনিভাবে অনেক মহিলাও নিজের ঈমান বাঁচাতে গিয়ে প্রাণপণ লড়াই করতে হতো।

কিন্তু মহিলারা অবলা হওয়ার কারণে তাদের পরীক্ষা ছিল পুরুষের পরীক্ষা থেকে কঠোরতর। তাই এখানে পবিত্র কুরআন পুরুষদের সাথে মহিলাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাদের সান্ত্বনা ও প্রেরণা যুগিয়েছে। তারা যদি ঈমান ও নেক আমলের সংকল্প করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাদের পবিত্র জীবনযাপন করাবেন। শয়তান তাদেরকে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আল্লাহ্ শয়তানদের সেই সুযোগই দিবেন না।–মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী ঃ তাদাব্বুরে কুরআন।

মুসলিম ও কাফির সমাজের যেসব সংকীর্ণমনা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির ধৈর্যহীন লোক অজ্ঞতা ও ভুলবশত মনে করে যে, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পরহেজগারীর নীতি অবলম্বন করলে আখিরাতের জীবনে যত কল্যাণই লাভ হোক না কেন, দুনিয়ায় অবশ্যই বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়—আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। তাদের জবাব স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, তোমাদের এহেন খেয়াল মোটেই ঠিক নয়। সঠিক ও নির্ভুল নীতিপন্থা অবলম্বনে কেবল আখিরাতে কল্যাণ লাভ হয় না, দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। যারা সত্যিকার ঈমানদার, সত্যপন্থী ও সঠিকভাবে কাজ সম্পন্নকারী, তাদের বৈষয়িক জীবনও বেঈমান ও অসত্যপন্থীদের চেয়ে অবশ্যই উত্তম হয়ে থাকে। নির্মল নৈতিক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান-মর্যাদা লাভ করে থাকে, অন্য কেউ তা কিছুতেই লাভ করতে পারে না। যে সুস্থতা, শুভ্রতা ও পবিত্রতা লাভ তাদের সৌভাগ্যে হয়ে থাকে, তা থেকে অন্যরা বঞ্চিতই থেকে যায়। কেননা তারা চরম নিকৃষ্ট ও খারাপ আচরণ করে বলে ব্যর্থতা তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে থাকে। নেক লোকেরা দরিদ্র হয়েও মনের যে প্রশান্তি লাভ করে থাকে, তাদের অন্তর্জগতে যে ধীরতা স্থিরতা বিরাজ করে, তার শতাংশের একাংশও ফাসেক-ফাজের লোকেরা পেতে পারে না।–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-তাফহীমুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিন নর-নারীকে আল্লাহ্ তাআলা 'হায়াতে তাইয়্যেবা' (পবিত্র জীবন বা উন্নত জীবন) দান করার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলতে কি বুঝায় ? এ বিষয়ে মুফাস্সিরীনের বিভিন্ন কথা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা., সাঈদ ইবনে যুবাইর রা., যাহ্হাক ও আতা বলেন, দুনিয়াতে হালাল রিয্ক ভাগ্য হওয়া আর আখিরাতে নেক আমলের উত্তম ফল লাভ করার নাম 'হায়াতে তাইয়্যেবা'। হযরত হাসান বসরী ও ওহাব ইবনে মুম্বা বলেন, অল্পে তুষ্ট থেকে জীবনযাপন করা হায়াতে তাইয়্যেবা। কারণ, কোটিপতি হলেও যদি অন্তরে তৃপ্তি না

থাকে বরং আরো বেশী পেতে মন অস্থির থাকে, তাহলে কোনো নিয়ামতের তৃপ্তিই পাওয়া যায় না। ইমাম জাফর সাদেক রহ. বলেন, আল্লাহর হুকুম মেনে জীবনযাপন করাটাই হায়াতে তাইয়্যেবা। আবু বকর ওররাক রহ. বলেন, আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য পাওয়া হায়াতে তাইয়্যেবা। সহল তসতরী বলেন, নিজের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন হায়াতে তাইয়্যেবা। হযরত মাওলানা আবদুল হক দেহলভী রহ.-এর মতে দুনিয়ার জীবন সুস্থ ও সুনামের সাথে অতিবাহিত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পাথেয় উপার্জন করে সাথে নেয়া এবং মৃত্যুর সময় সুনাম ও সুকর্ম রেখে যাওয়ার নাম 'হায়াতে তাইয়্যেবা। কেউ কেউ বলেন, কাফির ও শত্রুদের থেকে নিরাপদ থাকা, মান-সম্ভ্রম নিয়ে জীবন যাপন করা, কাফির ও শত্রুদের দ্বারা শাসিত হয়ে জীবনযাপন না করা 'হায়াতে তাইয়্যেবা'। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম যেহেতু ইসলামের প্রথম পর্যায়ে খুব দৈন্যাবস্থায় ছিলেন, তাই তাঁদেরকে উন্নত জীবনের ওয়াদা করা হয়েছে যা অতিসত্বর পূরণ হয়েছিল। আগেকার সেসব বিত্তহীন দরিদ্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ পর্যন্ত থাকায় অতিসত্বর সুবজ-শ্যামল রাজ্যের রাজা ও ন্যায়বিচারক হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে আরবদের জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

—হযরত মাওলানা আবদুল হক দেহলভী ঃ তাফসীরে হাক্কানী।

মুফতী শফি রহ. তাঁর তাফসীর মাআরেফুল কুরআনে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে হায়াতে তাইয়্যেবা বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, যাকে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' দেয়া হবে সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং এর অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দুটি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক. অল্পে তুষ্টি ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের অভ্যাস —যা দারিদ্রের মাঝেও কেটে যায়। দুই. তার এ বিশ্বাস যে দুনিয়ার অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে আখিরাতে সুমহান চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও পাপিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও দুরবস্থায় পতিত হলে তার সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কখনো কখনো আত্মহত্যা করে বসে। আর সে যদি স্বচ্ছল ব্যক্তি হয় তবে আরো পাওয়ার লোভ তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। কারণ সে কোটিপতি হয়ে থাকলেও আরো অধিক পাওয়ার জন্য জীবনটাকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।—মাআরেফুল কুরআন ঃ মুফতী শফী র.

'পবিত্র জীবন' মানে দুনিয়ার জীবনে হালাল রুযী অল্পে তুষ্টি, অন্তরের প্রশান্তি, ধীরতা-স্থীরতা, আল্লাহর যিক্‌রের স্বাদ ও তৃপ্তি, আল্লাহ প্রেমের স্বাদ, ফরয কাজ ও ইবাদাতে মনের সন্তুষ্টি, পরবর্তী জীবনে সাফল্য লাভের আশা, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধুর্য ইত্যাদি। যা হোক, অল্পে তুষ্ট মুমিনের পবিত্র ও তৃপ্তিময় জীবনের শুরু হয়, আর কবরে গিয়ে এর রং আরো ফুটে উঠে। শেষ পর্যন্ত এ 'হায়াতে তাইয়্যেবা' এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

حَيَاةٌ بِلاَ مَوْتٍ وَغِنًى بِلاَ فَقْرٍ وَصِحَّةٌ بِلاَ سُقْمٍ وَمُلْكٌ بِلاَ هُلْكٍ وَسَعَادَةٌ بِلاَ شَقَاوَةٍ -

"মৃত্যুহীন জীবন, অভাবশূন্য ধন, নিঃরোগ স্বাস্থ্য, চিরস্থায়ী রাজ্য, অশেষ সৌভাগ্য।"

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হায়াতে তাইয়্যেবা নসীব করুন। আমরা মাওলায়ে কারীম রাহ্মানুর রাহীমের দরবারে এ মুনাজাত করি ঃ

هر قسم كى مرض سے تودے شفا   اور حيات طيبه تو كرعطا

اپنى رحمت هم پراب مبذول كر   يه مناجات اور دعا مقبول كر

"তুমি আমাদের সকল প্রকার রোগ (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, দৈহিক ও মানসিক) থেকে আরোগ্য দান করো। আর 'হায়াতে তাইয়্যেবা' নসীব করো। তোমার রহমত আমাদের উপর বর্ষিত করো। এ দুআ-মুনাজাত কবুল করো।"

❑

সাত

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

"তোমার রব আদেশ করেছেন, একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ; আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা দুজনই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না, তাদের উভয়ের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। সহৃদয়তার সাথে নম্রভাবে তাঁদের সামনে নত থাকবে, আর এই বলে দুআ করবে, হে রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি তুমি রহম করো, যেভাবে তাঁরা উভয়ে আমার শিশুকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করবে না,আর মাতা-পিতার সেবা-যত্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে

মানব জাতির শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য কিসে ও কিভাবে—তা একমাত্র সে সত্তাই ভাল জানেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে লালন-পালন করেন। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে তার জীবনের চলার পথও বাতলে দিয়েছেন। আল কুরআনই হচ্ছে আল্লাহর সেই পথনির্দেশিকা। আর এরই বাস্তবায়ন পদ্ধতি হচ্ছে রাসূলের সুন্নাহ। আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির জন্যে দুটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এক. মানবজাতি তাদের রব আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করবে না, দুই. মানুষ নিজ নিজ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। বস্তুত রাব্বুল আলামীনের রহমত ও ইচ্ছায় মানুষ জীবনী শক্তি পেয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, আর মাতা-পিতার অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা ও সীমাহীন সহিষ্ণুতার বদৌলতে মানুষ দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারছে। যেন মানুষকে আল্লাহর লালন-পালন কাজটির বাস্তবায়ন মাতা-পিতার মাধ্যমে সমাধান

করছেন। এজন্যেই আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মানুষকে তার দাসত্ব করার নির্দেশের সাথে মাতা-পিতার খিদমত আনজাম দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ্ তাআলা মানব সন্তানকে মাতা-পিতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু দাসত্ব করার জন্য বলেননি। কারণ, মানুষ স্বীকার করুক বা না-ই করুক, সে জন্মগতভাবেই আল্লাহর দাস, আর দাসত্ব কেবল আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বস্তুত আল্লাহর দাসত্বেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আলোচ্য আয়াতের বাচনভঙ্গিতে একথা বেরিয়ে এসেছে, যদি আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্বে অন্য কাউকেও সামান্যতম অংশীদার করার ন্যূনতম অবকাশও থাকতো, তবে তার অধিকারী হতো মাতা-পিতা। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই যখন মাতা-পিতাকে তার শরীক সাব্যস্ত করেননি, তখন অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

–তাদাব্বুরে কুরআন

لاَ تَعْبُدُوٓا اِلاَّ اِيَّاهُ-

"তিনি ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না।"

কথাটির অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পূজা করো না ; বরং তার সাথে একথাও আসবে যে, দাসত্ব ও আনুগত্য এবং নিশর্তে ও নিসংকোচে মান্য করবে একমাত্র আল্লাহকে। তাঁর আদেশকেই একমাত্র আদেশ, তাঁর আইনকেই একমাত্র আইন বলে স্বীকার করবে ও মেনে চলবে। তাঁকে ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিবে না। বস্তুত এটা একটা ধর্মীয় আকীদা বা ব্যক্তিগত কর্মনীতিই নয় বরং মদীনায় নবী করীম স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল ভিত্তিও। সেই ব্যবস্থার মূল আদর্শ ছিল আল্লাহ্ তাআলাই বিশ্বজাহানের মালিক ও নিরংকুশ বাদশাহ্, আর তাঁর দেয়া শরীয়তই সমগ্র দেশের আইন।-তাফহীমুল কুরআন

ইমাম কুরতুবী র. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি আদব-সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদাতের সাথে একত্রিত করে ফরয করে দিয়েছেন। যেমন সূরা লুকমানে নিজের শোকরের সাথে মাতা-পিতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর করো আর পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্

তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ওয়াজিব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ দেয়। হাদীসে রয়েছে কোনো এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করলো ঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলো ঃ এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।-[মাআরেফুল কুরআন-কুরতুবী থেকে]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের সেবাযত্নের বিষয়ে মুফতী শফী র. তাঁর তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বেশ কটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি সেগুলো নিয়েছেন তাফসীরে মাযহারী থেকে। এখানে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১. বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দুটো দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দুটো দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্যে একজনকে পায় তবে জান্নাত বা জাহান্নামের একটি দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, জাহান্নামের এ শাস্তি বাণী কি তখনো প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা তার প্রতি যুল্‌ম করেন ? তিনি তিনবার বললেন, যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যুল্‌মও করেন, তবুও পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।

একথার সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতা থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা যুল্‌ম করলেও সন্তান তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

২. বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "যে সেবা-যত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতের বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়।" লোকেরা আরয করলো, "সে যদি দিনে একশবার এভাবে দৃষ্টিপাত করে ?" তিনি বললেন, হাঁ, একশবার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে।"

৩. বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবু বকরা রা.-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, সকল গোনাহর শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-

মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও দেয়া হয়।

মাতা-পিতার খিদমত সম্পর্কে কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

১. সাধারণত পিতা-মাতার আনুগত্য সন্তানের উপর ওয়াজিব। এমনকি তারা কোনো সন্তানের প্রতি যুল্‌ম করলেও তাদের আনুগত্য, সেবা-খিদমত করা সেই সন্তানের কর্তব্য। তবে তারা যদি সন্তানকে শিরক বা আল্লাহর নাফরমানীর কাজে বাধ্য করে তাহলে কেবল সেই নির্দিষ্ট কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। বরং সেই অবস্থায় ঐ কাজে তাদের বিরোধীতা করা কর্তব্য। হাদীসের ভাষায় لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ। "স্রষ্টার নাফরমানীর কাজে সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"

২. পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে। ইমাম কুরতুবী এ বিষয়ের সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা রা.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা রা. রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করেন, "আমার জননী মুশরিক। তিনি আমাকে দেখতে আসেন। তাঁকে আদর আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি ?" তিনি বললেন, صلى امك। তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন করো। কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাক বলে, وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ তাদের উভয়ের সাথে দুনিয়ার জীবনে সদ্ব্যবহার করে চল। আয়াতে 'মারূফ' আচরণ বলতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও আদর-আপ্যায়নমূলক আচরণ বুঝানো হয়েছে।

৩. যে পর্যন্ত 'জিহাদ' ফরযে আইন পর্যায়ে না পৌঁছে—ফরযে কেফায়ার পর্যায়ে থেকে যায়, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে যাওয়া জায়েয নয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জিহাদের অনুমতি নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি ?" সে বললো, জী-হাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ 'তাহলে তাদের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ করো।' অর্থাৎ তাঁদের সেবা-যত্ন করলেই তুমি জিহাদের সওয়াব পাবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে লোকটি আরও বললো, "আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।" একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, "যাও তাদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছো। অর্থাৎ তাদের কাছে

গিয়ে বল, এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।"
-কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন।

৪. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর। হযরত আবু উসায়েদ বদরী রা. বর্ণনা করেন, "আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে একজন আনসার এসে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতার ইন্তিকালের পরেও তাদের কোনো হক আমার যিম্মায় আছে কি ? তিনি বললেন হ্যাঁ—তাঁদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের ইন্তিকালের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে। উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ স. হযরত খাদীজা রা.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা রা.-এর হক আদায় করা।

৫. পিতা-মাতার বার্ধক্য অবস্থায় তাঁদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে ও তাদের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বার্ধক্যে উপনীত হলে পিতা-মাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাঁদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অধিকন্তু বার্ধ্যক্যের উপসর্গসমূহ মানুষকে স্বভাবগত খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত, বার্ধ্যক্যের শেষপ্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনা অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা ও চাহিদা এমন ধরনের হয়ে যায়—যা পূরণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কুরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে—আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী এক সময় তুমিও তাদের প্রতি তদপেক্ষা বেশী মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা সবকিছু তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তা ও আচার-আচরণকে স্নেহ-মমতার আবরণে ঢেকে নিয়েছিলেন ; তেমনি মুখাপেক্ষিতার এ দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের

তাগিদে তোমারও একান্ত কর্তব্য পিতা-মাতার সেই ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ করে তাঁদের সেই ঋণ শোধ করার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়া।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِى صَغِيْرًا ○

আল কুরআন মানবজাতিকে এ দোয়া শিখিয়ে উক্ত বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করেছে।

পিতা-মাতার বার্ধক্যাবস্থায় সন্তানের আচরণ বিধি

আলোচ্য আয়াতে পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে পাঁচটি আদেশ দেয়া হয়েছে ঃ

এক. "তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলবে না।" তাঁদের দুজন অথবা একজন বার্ধক্যে পৌঁছলে তাঁদের কোনো কথায় বা আচরণে বিরক্তি প্রকাশক শব্দ 'উহ্' বলতে পারবে না। বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন, পীড়াদানের ক্ষেত্রে 'উহ্' বলার চেয়েও কম বিরক্তিকর কোনো স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হতো। অর্থাৎ যে কথায় পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হয়, তাও বলা নিষিদ্ধ।

দুই. "তাঁদেরকে ধমক দিবে না।" তাঁদের অসহায় অবস্থায় সন্তানদের ধমক শুনলে বড়ই মনোকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

তিন. "তাঁদের উভয়ের সাথে সম্মানসূচক নম্রভাষায় কথা বলবে।" অতি নম্রস্বরে ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশক শব্দে কথা বলবে।

চার. "সহৃদয়তার সাথে নম্রভাবে তাঁদের সামনে নত থাকবে। আয়াতের এ অংশের তরজমা হলো 'তাদের উভয়ের জন্য তোমার দয়াজনিত বিনয়-পাখা নত করে দাও।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ -

"অর্থাৎ তাঁদের সাথে অকৃত্রিম বিনয়সুলভ সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করবে।"

পাঁচ. তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে এই বলে যে, "হে রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি তেমনি রহম করো যেমনি তাঁরা শিশুকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"

পিতা-মাতার ষোলআনা হক আদায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আর তাঁদের বার্ধক্যাবস্থায় প্রয়োজনীয় শান্তির বিধান করাও সন্তানের শত চেষ্টা

সত্ত্বেও সম্ভব নয়। তাই রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের জন্য এ দুআ করবে। তাছাড়া তাঁদের ইন্তিকালের পরেও এ দুআ করে তাঁদের ঋণ শোধের চেষ্টা করা যায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

❑

আট

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

"তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তো তাদের রিয্ক দিয়ে থাকি, আর তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। আর যেনার ধারেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা খুবই অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত খারাপ পথ।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১-৩২

সন্তান হত্যা করো না আর ব্যভিচারের ধারেও যেয়ো না

সূরা বনী ইসরাঈলের তেইশ আয়াত থেকে সাইত্রিশ আয়াত পর্যন্ত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক আইনের একটা সুস্পষ্ট ইশতিহার ঘোষিত হয়েছে। মিরাজ থেকে ফিরে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর সম্মুখে উক্ত ভাষণ পেশ করেছিলেন।

আলোচ্য দুটো আয়াতের প্রথমটিতে জাহেলী যুগের একটি নিপীড়নমূলক সামাজিক অভ্যাস সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, তারা ভরণ-পোষণের ভয়ে সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের হত্যা করতো। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত সেকথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ এরূপ মনোভাবসম্পন্ন লোকদের ভ্রান্ত ভাবধারা নিরসন করে দিয়ে বলছেন সন্তান যদিও তোমাদের কিন্তু এদের রিয্কদানের তোমরা কে ? এ কাজটা তো একান্তভাবে আল্লাহর। তোমাদেরকেও তো সেই আল্লাহই রিয্ক দিয়ে থাকেন। সুতরাং যে আল্লাহ তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকেন সে আল্লাহ তাদেরও রিয্কদাতা। বরং আল্লাহর কথা হলো তাদের রিয্ক আমিই দেব। তোমরা তো তাদের রিয্কদাতা নও। সুতরাং তাদের রিযক

বা জীবনোপকরণ নিয়ে তোমাদের অত মাথা ব্যথা কেন ? এ চিন্তায় সন্তান হত্যা করে নিজেকে কেন হত্যার অপরাধী বানাচ্ছো ?

আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ তাআলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য দরিদ্র জনগণের সাহায্য করতে দেখেন, তিনি তাকে সেই হিসেবেই রিয্ক দিয়ে থাকেন। এতে করে সে যেমন নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে তেমনি সে অন্যদেরও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ

بِضُعَفَائِكُمْ اِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ-

অর্থাৎ "তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদের রিয্ক দেয়া হয়।" এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যাকিছু পায় তা দুর্বলচিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের উসিলাতেই পায়।–মাআরেফুল কুরআন

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ হীন প্রথা নিবারণের জন্য কত দরদপূর্ণ কথাই না বলেছেন। দেখুন আয়াতে اَوْلاَدَكُمْ (তোমাদের সন্তান-সন্তুতি) বলে কত উষ্ণ মহব্বত প্রকাশ করেছেন। প্রথমত اَوْلاَدَكُمْ (তোমাদের সন্তান-সন্তুতি) বলে সন্তানদের প্রতি আন্তরিক ও অকৃত্রিম ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ (তাদের রিয্ক আমিই দিব) বলে বুঝিয়েছেন, তোমরা কেন 'রিয্ক' এর জন্য অস্থির হচ্ছো ? রিয্ক তো আমিই দিব—তাদেরকেও এবং তোমাদেরকেও। তৃতীয়ত, اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا "নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ"–বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে ওদের হত্যা করা মহাপাপ—অমার্জনীয় অপরাধ।–তাফসীরে হাক্কানী

জাহেলী আরবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার যে প্রথা জারী ছিল—তার মূল কারণ ছিল এই যে, তারা ভাবতো মেয়েরা যেহেতু কামাই-রুযীতে কোনো ভূমিকা রাখে না, সুতরাং তাদের লালন-পালনের বৃথা বোঝা বহন করে কি লাভ ? কুরআনে হাকীম সেই পাথর দিলের অপরাধ মূলে কুঠারাঘাত হেনে কন্যা হত্যার বর্বরতম প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে দেয়। আধুনিক বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে যে আন্দোলন চলছে এবং যা বাস্তবায়নের পথে দিন দিন নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে—তা বাহ্যত পশুত্ব না হলেও এর ভেতরেও জাহেলী আরবের সেই বর্বরতার ভাবধারা বিরাজিত। জাহেলী যুগের মত আজকের সভ্য সমাজের মানুষও নিজেকে অন্যের রিয্কদাতার

আসনে বসিয়ে রেখেছে। আল কুরআন نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (আমিই তাদের রিয্ক দিচ্ছি এবং তোমাদেরও) বলে সেই ভ্রান্তির অপনোদন করেছে। তৎকালীন আরব বদ্দুগণ তো এই রহস্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিল ; আর তারা তো এরি আলোকে নিজেদের সংশোধনও করে নিয়েছিল। কিন্তু আজকের সভ্য সমাজের এসব লেখাপড়া শেখাদের তা বুঝাবে কে ?

—তাদাব্বুরে কুরআন

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব আন্দোলন চলে আসছে, আলোচ্য আয়াত তার অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল-সমূহকে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করে দিয়েছে। প্রাচীনকালে দারিদ্রের ভয় মানুষকে নিজেদের শিশু-সন্তান হত্যা করা ও গর্ভপাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। আর বর্তমানে তা তৃতীয় একটি পথের দিকে অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে বিশ্ববাসীকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলাম মানব সাধারণকে হেদায়াত দিচ্ছে যে, তারা যেন খাদ্যাভাবের ভয়ে জনসংখ্যা হ্রাস করার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের শক্তি ও কর্মক্ষমতা নিয়োগ করে যাতে করে আল্লাহর বানানো স্বভাবনীতি অনুযায়ী রিযকের প্রাচুর্য লাভ করা যায়। মানুষ আর্থিক উপায়-উপাদানের সংকীর্ণতা ও অভাবের আশংকায় বার বার বংশ বৃদ্ধির ধারাকে রুদ্ধ করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে—এ আয়াতের আলোকে তা মানুষের একটি অতি বড় মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। এ আয়াত মানবজাতিকে সাবধান করে দিচ্ছে রিয্ক দেয়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে নয় ; বরং তা সেই আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ যিনি তোমাকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূর্বের লোকদের তিনি যেমন রিয্ক দিয়েছেন পরবর্তীকালের লোকদেরও তিনিই ঠিক তেমনি রিয্ক দিবেন। এটা ইতিহাসেরও শিক্ষা। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় খাওয়ার লোকের সংখ্যা যেমন বেড়েছে। তদপেক্ষা অনেক বেশী আর্থিক উপায়-উপাদানও সেখানে লোকদের হস্তগত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনায় মানবজাতির অযথা হস্তক্ষেপ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে ?—তাফহীমুল কুরআন

এখানে প্রথম আয়াতে সন্তান হত্যা না করতে বলার কারণ ও ফলাফল আলোচনা করার পর দ্বিতীয় আয়াতে যিনা বা ব্যভিচারের ধারেও না যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রিয্ক বা জীবিকার অভাবের আশংকায় যে কোনো উপায়ে সন্তান হত্যা মানবতার জন্য চরম ক্ষতিকর কাজ ছাড়া আর কিছু নয় বলে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। এরি সাথে যিনার ধারেও না যেতে হুকুম করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সন্তান হত্যার সাথে

যিনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? জবাবে আজকের গবেষকগণের দুটো কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. মানুষ স্ত্রী পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে থাকে আর এতদোভয়ের প্রতি. পারস্পরিক আকর্ষণ থাকে অতি স্বাভাবিকভাবে। জীবিকার আশংকায় মানুষ যখন এ স্বাভাবিক আকর্ষণের বৈধ সমাধান বিয়ে থেকে বিরত থাকতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যিনার প্রতি ধাবিত হতে হয়। দ্বিতীয় কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাহলো আধুনিক বিশ্বে জন্মনিরোধের যত প্রকার প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হয়েছে, তাতে সমাজে যিনার পথও প্রশস্ত হয়েছে। জন্মনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যভিচার চলতে থাকলে বিপথগামী যুবক-যুবতীদের জন্য নিশ্চিন্তে ব্যাপকভাবে যিনার পথ ধরা সহজ ও নিরাপদ হয়ে যায়। আজকের বিশ্ব সমাজে যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى 'আর যিনার ধারেও যেয়ো না'—নির্দেশটি যেমন ব্যক্তি মানুষের প্রতি, তেমনি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের প্রতিও। ব্যক্তির জন্য এ নির্দেশের তাৎপর্য এই যে ব্যক্তিগতভাবে কেবল যিনা থেকেই বিরত থাকবে না, বরং যিনার উদ্বোধক ও প্রেরণাদায়ক যাবতীয় কার্যক্রম থেকেও দূরে থাকবে। কারণ যিনার কাজটি তো হঠাৎ করেই সংঘটিত হয় না। যিনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অনেকগুলো ঘাট পার হওয়ার পরেই যিনা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হতে পারে। তাই ব্যক্তির কর্তব্য হলো যিনার প্রাথমিক ঘাটেও পা না দেয়া। পাশাপাশি সমাজের কর্তব্য হলো যিনা, যিনার উদ্রেককারী এবং যিনা সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে আইন-কানুন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সমাজ ও পরিবেশের সংশোধন, সামাজিক জীবনের যথোপযুক্ত পুনর্গঠন এবং এ ধরনের সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজেরই কর্তব্য।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবনব্যবস্থার এক ব্যাপক অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। এরি দৃষ্টিতে যিনা ও যিনার মিথ্যা অভিযোগকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পর্দার আইন বিধান জারী করা হয়েছে। নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে পূর্ণ শক্তিতে দমন করার নির্দেশ রয়েছে। মদ, গান-বাজনা, নাচ, ছায়াছবি প্রভৃতি যিনা-ব্যভিচারের নিকটতর কার্যাবলীরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে এমন একটি পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের বিধি-বিধান তৈরি করা হয়েছে, যাতে বিবাহ অতি সহজসাধ্য হলো আর যিনা-ব্যভিচারের সামাজিক কার্যকারণ-সমূহ চিরতরে মূলোৎপাটিত হয়ে গেল।–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে যিনা হারাম হওয়ার দুটো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষত্ব বিবর্জিত কাজ করতে পারে আর মনুষত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টিতে তখন ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ। অর্থ যখন তোমার লজ্জা লোপ পায়, তখন কোনো মন্দ কাজ করতে বাধা কিসের ?—তুমি যা চাইবে তা-ই করতে পারবে। রসূলুল্লাহ্ স. তাই লজ্জাকে ঈমানের শাখা বা অঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ। "লজ্জা ঈমানের অংশ বা অর্ধেক।"

যিনার ক্ষতি ও খারাবীর কারণে প্রাচীনকাল থেকে সকল জ্ঞানবান সমাজেই তা ধিকৃত ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। যিনার ক্ষতির কতিপয় দিক হলো ঃ

১. বংশের কোনো পাত্তা না থাকা। সন্তানটি কার ? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিণামে মীরাছ বন্টনেও সমস্যার সৃষ্টি হবে। ২. একজন মহিলার স্বামী নির্দিষ্ট না থাকার কারণে যেসব পুরুষ এ মহিলার সংস্পর্শে আসবে তাদের মধ্যে মারামারি ও কাটাকাটির ঘটনা সংঘটিত হবে। আজকের সমাজে তো একথার উদাহরণের প্রয়োজন নেই। পরিণামে এ বিষয়টি গড়াবে বিশ্ব সমাজ ধ্বংস হওয়ার দিকে। ৩. স্ত্রীর সাথে মিলনের উদ্দেশ্য কেবল যৌন চাহিদা পূরণই নয়। বরং পারিবারিক কাজে পরস্পরের সহায়ক হওয়াই উদ্দেশ্য। স্বামী উপার্জন করবে আর স্ত্রী সহানুভূতি ও সঞ্চয়ী মনোভাব নিয়ে তার হেফাযত করবে, উভয়ে মিলে সন্তানাদির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী রোগ-শোকে ও বার্ধক্যে পরস্পরের সহযোগী হবে। উভয়েই পরস্পরের সাথে একান্ত ও পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে জীবন যাপন করবে। আর এটা স্বাভাবিক যে একজন স্ত্রীর জন্যে এটা কখনো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তার দৃষ্টি কেবল একজন পুরুষের উপর নিবদ্ধ থাকে। এমন অবস্থা তো যিনা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। ৪. যিনার দরজা উন্মুক্ত থাকলে তো মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকী থাকলো না। তখন তো যে কোনো স্ত্রীর সাথে মিলতে পারবে অথচ পরস্পরের মধ্যে কখনো প্রেমপ্রীতি সৃষ্টিই হবে না। এসব কারণে শরীয়ত যিনা বা ব্যভিচার হারাম করে দিয়েছে। আর এ বিষয়ে এত তাগিদ দিয়েছে যে, কেউ যেন এর ধারেও না যায়। অর্থাৎ যিনার সকল উদ্দীপক থেকে নিজেকে সবাই যেন দূরে রাখে। আর যিনার

ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য করে বলে দিয়েছে যে, اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا
–এটা অশ্লীল এবং অতি খারাপ পথ।–তাফসীরে হাক্কানী

এ আয়াতাংশে যিনা হারাম হওয়ার দলিল বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা তো সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ও একেবারেই খারাপ পথ। 'সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা' মানে যিনার খারাপী ও নির্লজ্জতার ব্যাপারে কোনো যুক্তিশাস্ত্রীয় সূত্র বা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বরং এতো মানবজাতির স্বভাব-প্রকৃতির আবহমানকাল থেকে পরিচিত একটি বিষয়। মানবজাতি যেদিন থেকে পৃথিবীতে এসেছে সেদিন থেকে কখনো সে পুরুষ ও মহিলার অবাধ সম্পর্ক মেনে নেয়নি। বরং সর্বদাই এ ব্যাপারে এক কঠিন বিধি-বিধানের অনুসরণ করে আসছে। আর যারাই এসব বিধি-বিধানের অনুসরণ ছিন্ন করেছে সমাজ কখনো তাদের বরদাশ্‌ত করেনি।

سَاءَ سَبِيْلًا 'অতি খারাপ পথ'। অর্থাৎ কুরআন যেই জাতি সৃষ্টির দাওয়াত দিচ্ছে যিনা সেই জাতির বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে বা যারা এ পথের পথিক, সে বা তারা একটা সৎ পরিবার, সৎ সমাজ সর্বোপরি সৎ সরকারের শিকড় কেটে দিয়ে থাকে।-তাদাব্বুরে কুরআন

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বললো, "আমাকে যিনার অনুমতি দিন।" উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাকে ধমক দিল (আল্লাহর নবীর সাথে এ বে-আদবী করছো ?) সাবধান, চুপ থাক। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, "আমার কাছে আস।" লোকটি হুজুরের নিকটে এসে বসলো। তখন তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি কি এমন কাজ তোমার মা, মেয়ে, বোন, ফুফী, খালা—কারো ব্যাপারে সহ্য করবে ? লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন —কখনো নয়। তিনি বললেন, অন্যরাও এমন কাজ তাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফী ও খালার ব্যাপারে সহ্য করবে না। তারপর তিনি দুআ করে বললেন, "হে আল্লাহ্ এর গুনাহ্ মাফ করে দাও। আর এর দিলকে পবিত্র ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করো।" আবু উমামা বলেন, এ দুআর পর ঐ লোকটির অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, সে কখনো কোনো মহিলার দিকে তাকাতো না। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ।-আল কুরআনুল কারীম — মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আজকের বিশ্বে মুসলিম সমাজ নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিতে এবং এজন্যে অহংকার করতে কসুর করে না ঠিক, কিন্তু ইসলামী জীবন বিধান তথা কুরআন সুন্নাহর আইন দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিকভাবে

ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চরম গাফলতিতে নিমজ্জিত। বরং তাদের অনেকে এ বিষয়টিকে দুনিয়াদারী মনে করে থাকে। অনেক মুখলেছ ব্যক্তিও দীনকে ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েই সন্তুষ্ট। অধিকন্তু কোনো ব্যক্তি বা দল যদি দীনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা করতে দাওয়াত দেয় তখন এরাই তাদের বিরোধিতায় মেতে উঠে। বস্তুত দীনকে যথার্থ না বুঝার কারণে অধিকাংশ মানুষ এমনটি করে থাকে। অবশ্য কিছু লোক অহমিকায় ও হঠকারিতায় মত্ত হয়েও এরূপ করে থাকে। প্রথমে বর্ণিতরা নিজেদেরকে সুন্নাতের পা-বন্দ বলে মনে মনে খুব তৃপ্তি পায়, অথচ রসূলুল্লাহ্ স. ও খোলাফায়ে রাশেদার আমল ও কার্যক্রম জেনে তা অনুসরণ করতে রাজি না। সূরা বনী ইসরাঈলের আলোচ্য আয়াত দুটো যেন আজকের উপমহাদেশীয়দের শিক্ষা নিতে ডাকছে।

❒

নয়

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكَ ج قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ○

"সে বললো, রব! আমার ছেলে হবে কিভাবে ? যে অবস্থায় আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি!" তিনি বললেন এ অবস্থাই হবে। তোমার রব বলেছেন, "এটা তো আমার পক্ষে খুবই সহজ। আমি ইতিপূর্বে তোমাকেও তো সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৮-৯

বন্ধা স্ত্রী ও বুড়ো স্বামীর সন্তান লাভের দুআ কবুলের ইতিহাস

সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই হযরত যাকারিয়া আ.-এর কিছু ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। হযরত যাকারিয়া আ. বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট নবী ছিলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পেশায় ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। তিনি স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সূরা আলে ইমরানেও তাঁর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।–আল কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.

আল কুরআনে নারী প্রথম খণ্ড, উনিশ নং বিষয়ে অত্র ইতিহাসের প্রথমাংশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা রসূলে করীম স.-কে লক্ষ করে বলছেন, এখানে সেই ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে, যাতে আপনার রব তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি নাযিলকৃত রহমতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যাকারিয়া আ. তাঁর রবের কাছে গোপনে দুআ করেছিলেন। দুআয় তিনি বলেছিলেন, হে পরওয়ারদিগার! বার্ধক্যের কারণে তো আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার মাথার চুলও সাদা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সন্তান কামনা করাটাই অযৌক্তিক। কিন্তু রব! তুমি তো অসীম কুদরত ও রহমতের মালিক। আর ইতিপূর্বে কখনো আমি তোমার কাছে দুআ করে ব্যর্থ মনোরথ হইনি। আর আমার মৃত্যুর পর অলি-ওয়ারিশগণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যে, তারা শরীয়তের বিষয়ে আমার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করবে না। এদিকে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।

কাজেই তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান করো। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে, আর আমার পিতামহ ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে। আর তাকে তোমার প্রিয় করে বানাও। অর্থাৎ তাকে শরীয়তের আলেম করে তৈরি করবে। আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বললেন, হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে তার মত গুণে গুণান্বিত করে কাউকে বানাইনি।-তাফহীমুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন।

এখানে বলা হয়েছে اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا। যখন তিনি (যাকারিয়া) তাঁর রবকে নিভৃতে দুআ করেছিলেন সন্তানের জন্য। হযরত যাকারিয়া গোপনে নিভৃতে আল্লাহর কাছে সন্তান পাওয়ার দুআ করেছিলেন কয়েকটি কারণে। এক. যেহেতু চুপে চুপে গোপনে আল্লাহর কাছে চাওয়া তিনি পসন্দ করেন, কারণ এতে নম্রতা, একাগ্রতা, খুশুখুজু বেশী হয়ে থাকে। দুই. মানুষ তাকে এই বলে যেন বেওকুফ না বলে যে, তিনি চরম বার্ধক্যে পৌছেও নির্লজ্জভাবে সন্তান কামনা করছেন। অথচ এখন তাঁর সন্তান প্রাপ্তির স্বাভাবিক বয়স অতিক্রম করে গেছে। তাছাড়া সন্তান না পেলে তো লজ্জারও কারণ। তিন. বার্ধক্যের কারণে তার গলার আওয়াযও ক্ষীণ হয়ে গেয়েছিল।-কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

হযরত যাকারিয়া আ. তার মৃত্যুর পরে ভাই-বন্ধু বা উত্তরাধিকারীগণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকার কারণ তিনি তাঁর পরবর্তী ভাই বন্ধুদের মধ্যে এমন কাউকে দেখছিলেন না, যারা দীন ও নৈতিকতায় তাঁর পদমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে। এমন কাউকেও তিনি তার কাজের যোগ্য পাচ্ছিলেন না। ফলে তিনি দীনি কাজের প্রচার-প্রসার বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। অধিকন্তু তিনি তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের যারা নেতৃত্বের দিকে এগুচ্ছিল দেখতে পেয়েছিলেন, তাদের লক্ষণও খুব ভাল বলে দেখছিলেন না। তাঁর আশংকা ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কোনো বৈষয়িক ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারীত্বের বিষয় ছিল না। তাছাড়া কেবল তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী কামনা করেননি। বরং তাঁর পিতামহ হযরত ইয়াকুব আ.-এর আদর্শের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী কামনা করেছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি এমন এক উত্তরাধিকারী সন্তান চেয়েছিলেন যে হবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা—চরিত্রে ও কর্মে নবীর প্রকৃত ওয়ারিশ।-তাফহীমুল কুরআন

প্রকৃতপক্ষে হযরত যাকারিয়া আ. চরম বার্ধক্যে পৌছেও স্ত্রীর বন্ধাত্বে সন্তান প্রাপ্তির দুআ করা কোনো বৈষয়িক কারণে ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন

তাঁদের উভয়ের সন্তান জন্মদানের স্বাভাবিক অবস্থা না থাকলেও আল্লাহ তাআলা তার অসীম কুদরত ও রহমতে তাঁকে এমন সন্তান দান করবেন যে দীনি কার্যক্রম আনজাম দিতে সক্ষম হবে আর আল্লাহর পবিত্র দায়িত্বের আমানতের বোঝা বহন করতে পারবে। তাঁর বার্ধক্যে করার মত কি ছিল ? তাঁর অন্তরের আকাংখা ছিল তাঁর কোনো ছেলে এমন উপযুক্ত হোক যে তার বাপ-দাদাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারে, তাদের ইলম ও হিকমতের ভাণ্ডার সামলাতে পারে এবং নবুওয়াতের ওয়ারিস হতে পারে।

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নবীগণের মাল-সম্পদে মীরাস জারি হয় না। তাঁদের মীরাস জারি হয়ে থাকে ইলমের সম্পদে। সুতরাং يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ আয়াতাংশে মালের মীরাস উদ্দেশ্য নয়। এখানে 'ইয়াকুবের বংশধর' শব্দ থেকেই তা প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ একথা সুস্পষ্ট যে, ইয়াকুব আ.-এর সকল বংশধরের ধন-সম্পদের ওয়ারিশ কেবল হযরত যাকারিয়ার ছেলে এককভাবে হতে পারে কিভাবে ? বরং কেবল মীরাসের উল্লেখই এ স্থানে বুঝায় যে ধন-সম্পদের বিষয়ে উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, একথা তো সারা বিশ্বে স্বীকৃত যে, ছেলে পিতার সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে থাকে, তাহলে আবার সে জন্যে দুআ করার প্রয়োজন কি ? নবীগণের চরিত্র অবশ্যই এমন হয় না যে, তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্তে দুনিয়ার তুচ্ছ মালের চিন্তায় পড়ে যাবেন যে, তাদের মাল-সম্পদ কোথায় যাবে কার হাতে পড়বে ? তাদের চিন্তা কিছুতেই এমনটি হয় না। এখানে মজার বিষয় হলো, হযরত যাকারিয়া আ. বুড়ো বয়সে ধন-সম্পদ পাবেনই বা কোত্থেকে ? যিনি সারা জীবন কাঠমিস্ত্রির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন তাঁর দু' চার পয়সা কোথায় যাবে সে চিন্তা ?.

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত যাকারিয়ার ভাই-বন্ধু আত্মীয়গণ ছিলেন অনুপযুক্ত। তাই আশংকা ছিল যে, তারা বদ আমল ও দুষ্কৃতির কারণে না জানি নবুওয়াতের সৎ ও ন্যায়পথের বিকৃতি ঘটিয়ে বসে। এবং যেই দীনি ও রূহানী সম্পদ হযরত ইয়াকুব আ. থেকে হযরত যাকারিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে তা যেন তারা নিজেদের অসৎ আচরণে ধ্বংস করে না দেয়।–কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আল্লাহ তার পরিকল্পনা অনুযায়ীই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন। পিতা-মাতার পরিকল্পনায় সন্তানের জন্ম হয় না। অবশ্য পিতা-মাতা সন্তানের জন্ম বন্ধ করার বা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন মাত্র। কোনো দম্পতিকে সন্তান দানের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো, "যাকে

চান তিনি ছেলে দেন, যাকে ইচ্ছা মেয়ে দেন, কখনো কাউকে ছেলেমেয়ে দুটোই দান করেন, আবার কাউকে ছেলেমেয়ের কোনোটিই দেন না।"

এমতাবস্থায় যাদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক বয়স পর্যন্তও কোনো সন্তান যদি না দেন, তাদের মনের আকাংখা, সন্তান প্রাপ্তির বাসনা পূরণের কি কোনো পথ আছে ? হাঁ, চেষ্টা-তদবীর করেও তো অনেক দম্পতি নিঃসন্তান অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়ে নিরাশ জীবন কাটিয়ে থাকে। এমনি এক অবস্থায় পৌছে হযরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর দরবারে সন্তানের জন্য দুআ করেছিলেন। তার দুআ কবুল হলো এবং বার্ধক্যের চরমে পৌছলেও তাঁকে ছেলে দেয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে। সুসংবাদ পেয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন, এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব আর নিজের চরম বার্ধক্য) কিভাবে তিনি সন্তান পেতে পারেন ? তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, অবস্থা এমনই থাকবে। আর এ অবস্থাতেই আল্লাহ সন্তান দিবেন। এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কোনো কঠিন কাজ নয়। স্বয়ং নবীর নিজের জন্মের দিকে ইংগিত দিয়ে আল্লাহ তাঁকে বললেন ঃ وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا "আমি তো তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম যখন তুমি কিছুই ছিলে না।" সুতরাং বার্ধক্যাবস্থায় সন্তান দান করাটাও আমার (আল্লাহর) জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। আল্লাহর এ কুদরতের উপর বিশ্বাস থাকলে মানুষ সন্তানলাভের জন্য শিরক-বিদআতের পথ ধরতে পারে না। ইসলামে চেষ্টা-তদবীরের পথ তো খোলা—তবে তা হতে হবে বৈধ উপায়ে।

❒

দশ

فَأَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ○ يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○

"সে (মারইয়াম) সন্তানকে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকট উপস্থিত হলো। তারা বললো, ও মারইয়াম ! তুমি তো বড় পাপের কাজ করে বসেছ। ও হারুনের বোন ! তোমার বাপ তো অসৎ ব্যক্তি ছিল না আর তোমার মাও তো কোনো চরিত্রহীনা নারী ছিল না।"

–সূরা মারইয়াম ঃ ২৭-২৮

স্বাধ্বী নারী সম্মুখীন হলেন কঠিন পরীক্ষার, শিকার হলেন অসহনীয় তোহ্মতের

আলোচ্য আয়াত দুটোতে হযরত মারইয়াম আ.-এর গর্ভে হযরত ঈসা আ. জন্মগ্রহণের ফলে হযরত মারইয়াম সমাজের লোকদের দ্বারা যে তিরস্কৃত হয়েছিলেন সে কথাগুলো বিবৃত হয়েছে। বিষয়টি সূরা মারইয়ামের দ্বিতীয় রুকূ'র ১৬ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা নবী করীম স.-কে বলেছেন, এ কিতাবে মারইয়ামের কাহিনী বর্ণনা করো। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, হযরত মারইয়ামের মা নিজের মান্নত অনুযায়ী মারইয়ামকে বায়তুল মাকদাসে ইবাদাতে বসিয়ে দিলেন। মারইয়ামের খালু হযরত যাকারিয়া আ. তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিলেন। এক সময় মারইয়াম নিজের লোকজন থেকে পূর্বদিকে গোসলের জন্য গেলেন এবং পর্দা করে নিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আমীনকে মারইয়ামের কাছে পাঠালেন। জিবরাঈল পূর্ণ মানবাকৃতিতে মারইয়ামের সামনে উপস্থিত হলেন। মারইয়াম ভয় পেয়ে গেলেন আর বললেন আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাই তোমার থেকে, যদি তুমি তাকওয়াবান লোক হও। জিবরাঈল বললেন, আমি তোমার রবের প্রেরিত দূত। আমি এসেছি তোমাকে একটি পবিত্র ছেলে দান করতে। (ভয় করো না, আমি তো মানুষ নই) এতে মারইয়াম কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "আমার ছেলে হবে কিভাবে? যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আর

আমি চরিত্রহীনাও নই।" ফেরেশতা বললেন, "এভাবেই হবে।" (একথাটি হযরত যাকারিয়াকেও বলা হয়েছিল)। তোমার রব বলেছেন এটা তো আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, একে মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন হিসেবে বানাব এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত বানিয়ে রাখব। এটা (পিতা ছাড়া ছেলে তৈরি করা ঈসাকে সৃষ্টি করা) তো একটা স্থিরকৃত কাজ। এ কথোপকথন চলছিল, হঠাৎ মারইয়ামের গ্রীবাদেশ থেকে কাপড় একটু সরে গেলে জিবরাঈল তাঁর বুকের উপরিভাগের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ দিলেন আর পুত্র সন্তানের ভ্রূণ তাঁর গর্ভে সঞ্চারিত হলো। অতপর মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণ অনুভব করলেন তখন তিনি গর্ভসহ দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।-তাফহীমুল কুরআন ও মাআরেফুল কুরআন।

'দূরবর্তী স্থান' বলতে 'বায়তে লাহাম' বুঝানো হয়েছে। গর্ভ সঞ্চারের অনুভব হলে হযরত মারইয়ামের বায়তুল মাকদাসে এতেকাফ থেকে বের হয়ে সেখানে চলে যাওয়া ছিল এক স্বাভাবিক ব্যাপার। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম পরিবার বনী হারুনের কন্যা যিনি বায়তুল মাকদাসে ইবাদাতের কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিলেন—সহসা গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজের এতেকাফে বসে থাকলে এবং লোকেরা তাঁর গর্ভের কথা জানতে পারলে তারা তাঁর জীবন অতীষ্ঠ করে তুলতো। এ কারণে তিনি নিরুপায় হয়ে চুপচাপ স্বীয় এতেকাফ ছেড়ে দিয়ে হুজরা থেকে বের হয়ে পড়লেন। ভাবলেন এতে করে তিনি আল্লাহর মর্জি পূরণ হওয়া পর্যন্ত জনগণের ভর্ৎসনা ও সাধারণ বদনামী থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন।

–তাফহীমুল কুরআন

তারপর প্রসবের সময় হলে যখন মারইয়াম-এর প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। যাতে করে তিনি গাছের উপর ভর দিয়ে উঠা-নামা করতে পারেন। এ সময় তাঁর কোনো সংগী-সাথী ছিল না। অথচ তিনি ছিলেন প্রসব ব্যথায় অস্থির। সে সময় আরাম ও দরকারী যেসব উপকরণ কাছে থাকা উচিত ছিল, তার কিছুই তাঁর কাছে ছিল না। তাছাড়া সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকাও তাঁর মনকে অস্থির করে রেখেছিল। সেই কঠিনতম মুহূর্তে মারইয়াম দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কত অসহায় ছিলেন তা ভুক্তভোগী নারীরাই বুঝতে পারেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ

يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

"হায়, আমি যদি এ অবস্থার আগেই মরে যেতাম আর আমার নামনিশানাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতো!"–সূরা মারইয়াম ঃ ২৩

এমতাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল আ. সেখানে পৌঁছে নিম্নভূমিতে অবস্থান নিলেন। তিনি নিম্নস্থান থেকে আওয়ায দিয়ে বললেন, তুমি দুঃখ ও চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার পাদদেশে একটি নহর বা ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন, আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে। সন্তান প্রসবের পর মারইয়াম ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লে রাব্বুল আলামীন তাঁর খাদ্য হিসেবে ব্যবস্থা করে দিলেন। শুকনো খেজুর গাছ তাজা হয়ে গেল এবং পাকা খেজুর দেখা দিল। আর পায়ের নীচে ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা মারইয়ামকে বললেন, তুমি খাও, পান করো, আর চোখ শীতল করো। অর্থাৎ খেজুর খেয়ে ক্ষুধা মিটাও, ঝর্ণার পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করো আর পুত্রকে দেখে ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণে চক্ষু শীতল করো এবং আনন্দিত থাক। বাকী দুর্নামের সমাধান হলো, যখনি কোনো মানুষ তোমার কোলে ছেলে দেখে তোমাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তখন তুমি নিজে কোনো জবাব দিবে না, ইংগিতে বলবে আমি রহমান আল্লাহর জন্য রোযা রেখেছি, তাই কারো সাথে কথা বলবো না, আর বাচ্চার দিকে ইশারা করে তার কাছে জবাব শুনতে বলবে। দেখবে নবজাত শিশু আল্লাহর হুকুমে অস্বাভাবিকভাবে কথা বলে জবাব দিবে। এভাবে তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রমাণ প্রকাশিত হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে মারইয়াম যে বলেছিলেন, "হায়! আমি যদি এ অবস্থার আগেই মরে যেতাম আর আমার নামনিশানাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতো!" এ শব্দগুলো থেকেই বুঝা যায় হযরত মারইয়াম কত জটিল অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন, কত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবস্থার নাজুকতা অনুধাবন করতে পারলে সবাই বুঝতে পারবেন, তাঁর মুখে এসব শব্দ কেবল প্রসব বেদনার কারণেই উচ্চারিত হয়নি। বরং এ চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল যে, আল্লাহ তাঁকে যে মারাত্মক ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিলেন, তা থেকে তিনি মান-সম্মান নিয়ে কিভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। সমাজে তিনি কিভাবে সসম্মানে ঠাই পাবেন। এতদিন তো গর্ভকে লোক চক্ষুর আড়ালে কোনোভাবে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু এখন এ বাচ্চাকে কোথায় কিভাবে লুকিয়ে রাখবেন।-তাফহীমুল কুরআন

শেষ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার কুদরতে মারইয়ামের ছেলে ঈসা আ. পিতা ছাড়া কেবল মাতা থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। জনমানবশূন্য ময়দানে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে মারইয়াম সন্তান প্রসব করলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে বাঁচলেন আর মানুষের তোহমত থেকে বাঁচার পথও আল্লাহ পাক বলে দিলেন। বলে দিলেন, বাচ্চা সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের জবাবে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তার জন্ম সম্পর্কে যে কেউই প্রশ্ন তুলবে তার জবাব দানের ব্যবস্থা করা আমারই দায়িত্ব। উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের সমাজে চুপ থাকার রোযা রাখার রেওয়াজ ছিল।–তাফহীমুল কুরআন

মারইয়াম নবজাত সন্তান ঈসাকে নিয়ে লোকালয়ে এলে লোকেরা তাজ্জব হয়ে তাকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন করলো। তাদের প্রশ্নগুলোর সারকথা ছিল এই যে, যার গোটা পরিবারই অত্যন্ত পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাসের কথা ! মারইয়াম এসব প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সদ্যজাত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। ইশারায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে যাকিছু বলার ও জিজ্ঞেস করার আছে তা এ শিশুকেই জিজ্ঞেস করো। তার কাছেই তোমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলোর জবাব পাবে। লোকেরা মনে করলো মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে। তাই তারা বললো ওতো কেবল কোলের শিশু মাত্র। তার সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো ? সহসা সেই নবজাত সন্তান কোলের শিশু ঈসা বলে উঠলেন, "আমি আল্লাহর বান্দাহ। আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন। আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন। আর তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকবো। তিনি আমাকে মায়ের অনুগত বানিয়েছেন, আমাকে স্বৈরাচারী ও হতভাগা দুষ্চরিত্র বানাননি। আর আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন মরে যাব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে উত্থিত হবো।"

আল কুরআন হযরত ঈসা আ.-এর জন্মবৃত্তান্ত এভাবে বর্ণনা করার পর ঘোষণা করেছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"এ হলো মারইয়াম পুত্র ঈসার ঘটনা। এটা একটা চূড়ান্ত সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকেরা সন্দেহ করে থাকে। আল্লাহ তো এমন নন যে কাউকে তিনি নিজের পুত্র বানিয়ে নেবেন! তিনি পবিত্র মহিমাময়, তিনি কোনো কাজ করা স্থির করলে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪-৩৫

অর্থাৎ হযরত ঈসা আ.-এর শানও তাঁর বিশেষত্ব উক্ত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। এমন একটি সত্য ও সুস্পষ্ট বিষয়ে লোকেরা অযথা বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে। তারা এতে নানাবিধ মতপার্থক্য দাঁড় করিয়েছে। কেউ তাঁকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে, আর কেউ বানিয়েছে খোদার বেটা, কেউ বলেছে মিথ্যাবাদী, প্রতারক আবার অনেকে তাঁর বংশ ও নসবনামায় তিরস্কার করেছে। আল কুরআন তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে যে, হযরত ঈসা ইহুদী-খৃস্টানদের এসব সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধে। তিনি আল্লাহর একজন মোকাররম বান্দা, মিথ্যাবাদী-প্রতারক নন—সত্যবাদী ; আল্লাহর নবী, তাঁর বংশ ও নসব পাক-পবিত্র। আল্লাহ তাঁকে 'কালেমাতুল্লাহ' আখ্যা দিয়েছেন। আয়াতে 'কাওলাল্ হক' বলে সম্ভবত এ 'কালেমাতুল্লাহ'-ই বুঝানো হয়েছে।–আল কুরআনুল কারীম ঃ শাব্বীর আহমদ উসমানী।

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে ইহুদী ও খৃস্টানদের অলীক চিন্তাধারায় বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খৃস্টানরা তো তাঁকে বাড়িয়ে খোদার পুত্র বানিয়ে দিয়েছে ; আর ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এমন ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, তারা তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করেছে— নাউযুবিল্লাহ। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তির অপনোদন করে তাঁর সঠিক মর্যাদা ও প্রকৃত সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।–কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন ঃ মুফতী শফী র.

সূরা মারইয়ামের উক্ত ৩৪-৩৫ আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো দ্বারা মূলত খৃস্টানদের মিথ্যা সন্দেহ ও ভুল আকীদার অপনোদন করা হয়েছে। এখানে যে কথাটি খৃস্টানদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে তাহলো হযরত ঈসাকে যে তারা খোদার পুত্র মনে করে, তাদের সে আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। হযরত ঈসার মত হযরত ইয়াহইয়ার জন্মও ছিল একটি মুজিযা। এ মুজিযার দরুন হযরত ইয়াহইয়া আ. যেমন খোদার পুত্র হয়ে যাননি, তেমনিভাবে হযরত ঈসা আ.-এর জন্মও এমন মুজিযা, যদ্দরুন তাঁকে খোদার পুত্র মনে করা যেতে পারে না। খৃস্টানদের নিজস্ব বর্ণনায়ও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা আ.

উভয়ের জন্মই ছিল মুজিযা স্বরূপ। লূক-এর ইনজীলে এ দুটি মুজিযার উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের মতই। কিন্তু খৃস্টানরা একটি মুজিযা হিসেবে জন্মগ্রহণকারীকে আল্লাহর বান্দা মনে করে অথচ অনুরূপ আরেকটি মুজিযায় জন্মগ্রহণকারীকে (ঈসাকে) খোদার পুত্র বলে মনে করে। এটা যে তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।–তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী রহ.

হযরত ঈসা আ. বলেছিলেন ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

"আল্লাহ্ আমারও রব আর তোমাদেরও রব। সুতরাং তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো—এটাই তো সরল-সঠিক পথ।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৩৬

সূরা মারইয়ামের এ ৩৬ আয়াতে খৃস্টানদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ.-এর দাওয়াতও তো অন্যসব নবী-রসূলদের দাওয়াতের মতই এক ও অভিন্ন। তারা সবাই এক আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী করার জন্য বলেছেন। তারপরেও তোমরা তাঁদেরকে আল্লাহর বান্দা মনে করার পরিবর্তে আল্লাহর আসনে বসিয়েছ—তাদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছ, এটা তো তোমাদের নিজস্ব আবিষ্কার মনগড়া কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের নেতৃবৃন্দ কখনই তোমাদেরকে এ শিক্ষা দেননি।–তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী রহ.

এভাবে হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম নিয়ে যেমন তৎকালীন খৃস্টানরা নানা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবতারণা করেছিল—তারা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ কুদরত পুরুষ ছাড়া কেবল নারী থেকে সন্তান পয়দা করার একটি স্বচ্ছ ঘটনাকে ঘোলাটে করার যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা মানুষের বৈশিষ্ট্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে নানা সন্দেহ ছড়িয়েছিল, ঈসা আ.-কে 'আল্লাহর বেটা' বলার মত জঘন্য ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। আল কুরআন তাদের সে ভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করে আখেরী নবীর সময়কার ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের 'হক'-এর দিকে আহ্বান করেছিল। মুজিযা হিসেবে জন্মগ্রহণকারী ঈসা আ.-এর জন্ম নিয়ে ঈসা আ. ও তাঁর মাতা মারইয়ামকে অমর্যাদার বিতর্কের জালে জড়ানোর চক্রান্ত করেছিল। তেমনি আখেরী নবীর সময়কার ইহুদী-খৃস্টানরাও আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নবুওয়াত' সম্পর্কে অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির ঘূর্ণয়নে আবর্তিত হচ্ছে। আর মানব সমাজকেও বিভ্রান্ত করছে। এতে করে ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিকগণ পৃথিবীর শান্তি

বিপন্ন করছিল আখেরী নবীর আনীত বিশ্ব শান্তির পয়গামের বিরোধিতা করে। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য ইতিহাসের সূচনা করেছেন এভাবে وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ। "এ কিতাবে মারইয়ামের ইতিহাস আলোচনা করো।"

আল কুরআন এমনিভাবে পূর্বোক্ত নবী-রসূলগণের ইতিহাস এবং আল্লাহ্র কতিপয় বিশেষ বান্দা ও বান্দীর ঘটনাবলী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়াদির আলোচনা করেছে। এখানে মারইয়াম পুত্র ঈসা আ.-এর আলোচনায় তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত প্রসংগে বলতে গিয়ে খৃস্টানদের তাওহীদী শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা যে হযরত ঈসা আ.-এর মূল শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে আল কুরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে। তারা ঈসা আ.-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে এবং মারইয়ামের উপর তোহ্মত আরোপ করে সর্বোপরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে মানব স্বভাবের বানিয়ে সকল নবীর দীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর কুঠারাঘাত করেছে আর নিজেদেরকে শিরক ও কুফরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। অথচ নিজেদেরকে হযরত ঈসা ও ইনজিল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করছে।

সদ্যজাত শিশু হযরত ঈসা আ. স্বয়ং মাতার কোলে থেকে সুস্পষ্ট বলে দিলেন, اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ। 'আমি আল্লাহ্র বান্দা'। অর্থাৎ আমার এ অস্বাভাবিক জন্মের কারণে কেউ যেন এমন বিভ্রান্তিতে না পড়ে যে, আমি কোনো অতিমানবীয় অস্তিত্বের অধিকারী। আমি তো আল্লাহ্রই বান্দাহ্। শিশু ঈসার দ্বিতীয় কথা ছিল, "আল্লাহ্ আমাকে কিতাব ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন আর আমি যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই আমার অবস্থান হবে কেবল বরকত আর বরকত।" তাঁর তৃতীয় কথা ছিল, "আমাকে জীবনভর সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূলত এ দুটো বিষয়ই সকল শরীয়তের মূল ভিত্তি ছিল। এজন্যে সকল আসমানী জীবন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম এ দুটো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।" শিশু ঈসার চতুর্থ কথা ছিল, "আল্লাহ্ আমাকে আমার মায়ের অনুগত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে তিনি স্বৈরাচারী ও বদ চরিত্রের বানাননি।" সর্বশেষ তিনি বলেছেন, "আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো আর যেদিন আমি জীবিত হয়ে উঠবো।"

হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের পর পরই মায়ের কোলে থেকে উপরোক্ত পাঁচটি এমন বিষয়ের কথা বলেছেন যাতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ। তিনি মানুষের উর্ধে খোদা

বা খোদার বেটা কোনোটিই নন। প্রথম কথায় তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দাহ বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথায় তাঁকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবুওয়াত প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগৃহীত বান্দা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় কথায় তিনি নিজের দায়িত্ব অন্যান্য নবী-রসূলগণের দায়িত্বের অনুরূপ এবং মানুষ নবী হিসেবে যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন অর্পিত দায়িত্ব আনজাম দানের জন্য আদিষ্ট বলে প্রচার করেছেন। চতুর্থ কথায় তিনি অন্যান্য মানুষের মতই মারইয়ামের উদরে জন্ম নেয়ার কারণে মায়ের অনুগত থাকার কথা সংকল্প ও নির্দেশনার বিষয়ে স্বীকার করেছেন। ব্যতিক্রম কেবল এতটুকু যে তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়াই কেবল মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। আর সর্বশেষ কথায় তিনি নিজেকে জন্ম, মৃত্যু ও হাশরে উঠার স্বাভাবিক মানবীয় জীবন ধারার গণ্ডীর মধ্যে থাকা একজন মানুষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুসারী বলে দাবীদার খৃস্টানদের আকীদা-বিশ্বাস ও দাবী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পিত সে বিষয়ে সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছে।

❑

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"যিনাকারিণী নারী ও যিনাকারী পুরুষ—উভয়ের প্রত্যেককে একশ করে কোড়া মার। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয় ; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। আর তাদের শাস্তির সময় যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।"–সূরা আন নূর ঃ ২

ব্যভিচার মানববংশ বিধ্বংসী ও দণ্ডনীয় অপরাধ

ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। ব্যভিচার স্বয়ং একটি জঘন্য অপরাধ, তদুপরি তা সাথে নিয়ে আসে আরও শত শত অপরাধ যার ফলাফল প্রকাশ পায় মানবতার ধ্বংসের আকারে। অনেকের মতে পৃথিবীতে সংঘটিত হত্যা ও লুণ্ঠনের অধিকাংশের পেছনে রয়েছে কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণ। যেসব অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা কুরআনুল কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে —কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করা হয়নি, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের ভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। শরীয়তে হুদূদ চারটি ঃ চুরি,[১] কোনো সতী-সাধ্বী নারীর[২] প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান[৩] ও ব্যভিচার[৪]। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত নয়, বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' বলা হয়। উপরোল্লিখিত হুদূদগুলোর প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতে শান্তি-শৃংখলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের মূল উৎস। তবে সবকটির মধ্যে মানবিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য ব্যভিচার সর্বাধিক মারাত্মক।-মাআরেফুল কুরআন

যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণের পূর্বে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যভিচারিণী নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখার নির্দেশ ছিল। যেমন সূরা আন নিসার পনের নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَامْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً

অর্থাৎ তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখ, মৃত্যু এসে তাদের হায়াত শেষ করা পর্যন্ত অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোনো পথনির্দেশনা আসা পর্যন্ত। এ বাক্যাংশের পূর্বের অংশে বলা হয়েছিল, তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পুরুষদের চারজন সাক্ষী তলব করো ; তারা যদি সাক্ষ প্রদান করে, তবে তাদের জন্য উক্ত শাস্তির বিধান আপাতত কার্যকর হবে। অতপর সূরা আন নূর-এর এ আয়াত নাযিল হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা (সূরা নিসায়) যে ওয়াদা করেছিলেন সেই অনুযায়ী ব্যভিচারি নারী-পুরুষ সম্পর্কে শাস্তির স্বতন্ত্র বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছে। তোমরা তা আমার কাছ থেকে জেনে নাও—তা হচ্ছে অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য একশ করে কোড়া মারা। আর বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি হলো একশ একশ কোড়া ও রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে মেরে ফেলা।–মুসলিম, কিতাবুল হদূদ, হদ্দুয্ যিনা অধ্যায়।

অতপর 'হদ' প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি কেবল রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে শাস্তি দেন। বাকী একশ করে কোড়া মারাকে রজমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ পরবর্তীতে বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারির শাস্তি 'রজম'ই নির্ধারিত হয়। রসূলের যামানা অতিবাহিত হওয়ার পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও এভাবেই ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হতো। অতপর সকল যুগের ফকীহগণ ও আলিমগণ এ একই বিধানের কথা বলে আসছেন যা অদ্যাবধি চালু আছে। কেবল খারেজী সম্প্রদায় এ বিধানের বিরোধীতা করেছে। এ বিরোধীতার ভিত্তি হলো হাদীস অমান্য করা।–কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

যেনা বা ব্যভিচার যে নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত খারাপ ধর্মীয় দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহ, আর সামাজিকতার দিক থেকে জঘন্য, কদর্য ও আপত্তিকর সে সম্পর্কে প্রাচীনতমকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত মানব সমাজ সম্পূর্ণ এক মত। যে বিচ্ছিন্ন ও মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের জ্ঞান বিবেককে নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অধীন করে দিয়েছে কিংবা যারা পাগলের প্রলাপকে দার্শনিকতা মনে করে নিয়েছে ; তারা ছাড়া আর

কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। কারণ, মানুষের প্রকৃতিই এ কাজের বিরোধী নারী-পুরুষ ইতর প্রাণীর মত যৌন মিলনের পর যার যার পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেতে পারে না। এমনটি হলে সমাজে মানব বংশ টিকে থাকতে পারে না। কেননা মানুষের শিশু সন্তানের জীবন পালন ও পরিবর্ধনের জন্য ক্রমাগত কয়েক বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন লাভ করা একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু নারী একাকী এ দায়িত্ব পালন কখনো করতে পারে না, যতক্ষণ না পুরুষটি এ কাজে তার সহযোগী না হয়। এজন্যে স্থায়ী চুক্তিবদ্ধতা ছাড়া মানব সমাজ কখনই টিকে থাকতে পারে না। নারী-পুরুষ যদি পরিবার গঠন না করে কেবল নিছক যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য স্বাধীন ও অবাধে মিলিত হয়, তাহলে সমাজ জীবনের মূল ভিত্তিই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাহযীব তমদ্দুনের যে ভিত্তি গড়ে উঠেছে তা বিনষ্ট হয়ে পড়বে। এ কারণেই প্রত্যেককালে মানব সমাজ বিবাহের ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার কোনো না কোনো পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য ব্যভিচারের ক্ষতি সম্পর্কে অনুভূতি ও চেতনার স্পষ্টতা ও তীব্রতার পার্থক্যের কারণে সেই চেষ্টার ধরণ, রূপ ও পদ্ধতিতে আইন, নৈতিকতা, তমদ্দুন ও ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যেও রয়েছে বড় পার্থক্য। ব্যভিচার মানব সমাজের ভিত নষ্টকারী ও মানুষের স্বভাব-ধর্মের পরিপন্থী হওয়ার ব্যাপারে সকল যুগের সকল মানুষের কাছেই তা গর্হিত কাজ হওয়ার বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে। তবে এর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হওয়ার ব্যাপারে রয়েছে মতপার্থক্য। এখানেই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম এবং আইন-বিধানের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ দেখা দেয়। মানবীয় প্রকৃতির কাছের যেসব সমাজ অতীত হয়েছে, তাদের সকলেই যিনা-ব্যভিচার তথা নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে চিরদিন এককভাবেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করে সে জন্য কঠিনতর শাস্তির বিধান করেছে। কিন্তু সভ্যতার পংকিলতায় সমাজ ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে ব্যভিচার সম্পর্কে সমাজের আচরণ ও মনোভাব দুর্বলতর হতে থাকে। এ ব্যাপারে যে মারাত্মক ভুলটি করা হয়েছে, তাহলো শুধু যিনা (Fornication) এবং পরস্ত্রীর সাথে যিনা (Adultery)-এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটি একটি নগণ্য ভুল এবং শেষোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

–তাফহীমুল কুরআন

এসবের বিপরীত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় যিনা স্বতন্ত্রভাবেই একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষিত। আর বিবাহিতের জন্য যিনার শাস্তি অধিক ও তীব্রতর। ইসলামে যিনার শাস্তি হলো অবিবাহিতের জন্য একশ

করে কোড়া মারা আর বিবাহিতের জন্য রজম বা পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা। ইসলামী আইন যিনার বিচার করে এ দৃষ্টিতে যে এটা এমন একটি কাজ যার অবাধ স্বাধীনতা থাকলে মানবজাতি ও মানব সমাজের ভিত্তিই সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। মানব বংশের স্থিতি ও মানব সমাজের শৃংখলার জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধু বৈধ আইনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য সম্বন্ধ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু অবাধ মিলনের সুযোগ দেয়া হলে এ সম্পর্ক উক্ত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে না। কেননা দাম্পত্য ও পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ না করে যদি যৌন লালসা পূরণের সুযোগ-সুবিধা থাকে, তাহলে যৌন লালসা পূরণের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবার গঠনের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় কেউ নিজ কাঁধে তুলে নিবে বলে ধারণা করা যায় না। যেমন রেলগাড়ীতে বিনা টিকেটে সফর করার স্বাধীনতা থাকলে টিকেট কিনে গাড়ীতে উঠার শর্ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যাত্রীকে টিকেট নিয়ে গাড়ীতে উঠার শর্ত কার্যকর দেখতে চাইলে অবশ্যই বিনা টিকেটে গাড়ী উঠাকে অপরাধ বলে গণ্য করতেই হবে।

ইসলাম মানব সমাজকে যিনার অভিশাপ থেকে মুক্তিদানের জন্য কেবল দণ্ড বিধানমূলক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে না বরং সেজন্যে সার্বিকভাবেও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive Measure)-ও গ্রহণ করে থাকে। আর উক্ত আইনগত ও দণ্ডবিধিমূলক ব্যবস্থা (Direct Action) কেবল শেষ ও চরম ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করে থাকে। এতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করাই ইসলামের উদ্দেশ্য, যেন কেউ এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত না হয় এবং যেন কাউকে উক্ত শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন দেখা না দেয়। এজন্যে ইসলাম সর্বাগ্রে ব্যক্তির মন-মানসিকতার সংশোধন করে। মানুষের মনে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা রাব্বুল আলামীনের ভয় সৃষ্টির ব্যবস্থা করে এবং আখিরাতে সেই মহান রবের কাছে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করে। আল্লাহর বিধান মেনে চলার আগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টি করে। এটা মূলত একজন মুসলিমের ঈমানেরই অনিবার্য দাবী। তাছাড়া ব্যক্তিকে বারবার সতর্ক করে দেয়া হয়, যিনা ও চরিত্রহীনতা কবীরা গুনাহ—যে জন্যে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন। কুরআনের সর্বত্রই অনুরূপ সাবধানতা পাঠক সমক্ষে ভেসে উঠে।-তাফহীমুল কুরআন

অতপর ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিবাহ করার সম্ভাব্য সকল প্রকার সহজতর ব্যবস্থা করে দেয়। একজন যথেষ্ট বিবেচিত না হলে প্রয়োজনে চারজন স্ত্রী গ্রহণেরও অবকাশ দেয়। এমনকি কোনো অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখা জীবন যাপনে হুমকি হয়ে

দেখা দিলে পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য তালাক দেয়ার সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্ভাগ্য বশত এমন কোনো অনভিপ্রেত অবস্থার উদ্ভব হলে ইসলামে পারিবারিক পর্যায়ে শালিসী ব্যবস্থা থেকে সরকারী আদালত পর্যন্ত যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। যাতে করে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা ও মিলমিশ করে নেয়া সম্ভব হয়ে উঠে। আল্লাহ্ না করুন শেষ পর্যন্তও যদি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অন্যত্র পসন্দ মত পুনরায় বিবাহ্ করতে পারে।-তাফহীমুল কুরআন

যিনাকারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে যখন সে নিজের স্বাধীন মতে একাজ করে থাকে। জোরজবরদস্তির কারণে কারো থেকে একাজ হয়ে গেলে সে না অপরাধী হবে, না তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। কোনো মহিলাকে যিনা করতে বাধ্য করা হলে কুরআন মজীদ সে মহিলাকে মাফ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। যেমন সূরা আন নূরের তেত্রিশ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"আর যে তাদেরকে সেজন্য জোরজবরদস্তি করবে, তবে আল্লাহ্ এ জবরদস্তির পরে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, অতি দয়াবান।"

কয়েকটি হাদীস থেকেও জানা যায় যে, জবরদস্তি যিনার ঘটনায় কেবল বলৎকারীকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে, আর স্ত্রীলোকটিকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। যেমন তিরমিযি ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে একজন মহিলা অন্ধকারে নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিল। পথে এক ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করে। মহিলাটির চিৎকারে চারিদিক থেকে লোকজন জড় হয়ে গেলে বলৎকারকারী ধরা পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'রজম' করলেন। আর মহিলাকে রেহাই দিলেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর রা.-এর আমলে এক লোক একটি মেয়ের সাথে জবরদস্তি যিনা করে। হযরত ওমর তাকে কোড়া মেরে শাস্তি দিলেন, আর মেয়েটিকে ছেড়ে দিলেন।

কুরআন ও হাদীসের এসব দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এরূপ যিনাকৃত মহিলাকে শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি এভাবে কোনো মহিলা কর্তৃক যিনা করতে বাধ্য হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তা জবরদস্তি হবে কিনা এবং ঐ পুরুষ লোকটি শাস্তি হতে রেহাই পাবে কিনা—এ ব্যাপারে আয়িম্যায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রধানত তিনটি মত রয়েছে। ১. ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম হাসান ইবনে সালেহ বলেন, পুরুষও যদি যিনা করতে বাধ্য হয়—পুরুষ দ্বারা যদি জবরদস্তি যিনা করানো হয়, তবে তাকে মাফ করা হবে। ২. ইমাম যুফার বলেন, তাকে মাফ করা যাবে না। কেননা পুরুষের দেহে উত্তেজনা সৃষ্টি না হলে তাকে দিয়ে এ কাজ করানো সম্ভব নয়। আর এ উত্তেজনা হওয়াই প্রমাণ করে যে সে কাজটা স্বেচ্ছায় করেছে। ৩. ইমাম আবু হানীফা বলেন, কোনো সরকারী কর্মকর্তা বা কোনো সরকার যদি কোনো পুরুষকে দিয়ে এ কাজ করায়—তাকে একাজ করতে বাধ্য করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা শাস্তি দাতা তো সরকারই। আর সেই সরকারই যদি জবরদস্তি অপরাধ করায়, তখন তো আর সে শাস্তিদানের অধিকার পেতে পারে না। কিন্তু সরকার ছাড়া অন্য কেউ যদি কোনো পুরুষকে দিয়ে যিনা করায় তাহলে সে পুরুষটিকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। কেননা সে নিজের ইচ্ছা না থাকলে একাজটি করতে পারতো না—জবরদস্তি উত্তেজনা সৃষ্টি করা যেতো না।-তাফহীমুল কুরআন

তাফহীমুল কুরআনের মতে উক্ত তিনটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি অধিক সহীহ ও যুক্তিযুক্ত। এর প্রমাণ এই যে, দৈহিক উত্তেজনা ব্যক্তির যৌন লালসার প্রমাণ হলেও তা যে তার নিজের ইচ্ছায় ও আগ্রহে হয়েছে তা প্রমাণিত হয় না। আসলে একটি কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য শুধু ইচ্ছা হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং সেজন্যে স্বাধীন ইচ্ছা বর্তমান থাকা প্রয়োজন। যে লোককে জোরপূর্বক এমন অবস্থায় ফেলে দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করে অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছে। বাধ্যবাধকতায় পড়ে যাওয়া এমন ব্যক্তি কোনো কোনো অবস্থায় তো নিসন্দেহে অপরাধী হয় না। আর কোনো কোনো অবস্থায় তার অপরাধ হালকা ধরনের হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যেতে পারে, কোনো জালিম লোক একজন চরিত্রবান লোককে জোরপূর্বক ধরে কয়েদ করে দিল। তার সাথে এক যুবতী সুন্দরী মহিলাকেও বিবস্ত্র করে একই কামরায় আটক করে দিল। আর তাকে যদি যিনা না করা পর্যন্ত মুক্তি না দেয় এ অবস্থায় তারা উভয়ই যদি যিনা করে বসে। এদিকে সেই জালিম লোক চারজন সাক্ষী বানিয়ে বিচারালয়ে মোকদ্দমা দায়ের করে দেয়। ঠিক এমনি অবস্থায় উক্ত লোকটি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তৎপ্রতি লক্ষ্য না করে যদি ওদের 'রজম' করা হয় কিংবা কোড়া মারা হয়, তবে তা কতটুকু ইনসাফ বা যুক্তিসংগত হতে পারে? এরূপ অবস্থায় ব্যক্তির মনে ইচ্ছা ও আগ্রহ না থাকলেও তো

উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তেমনি কোনো লোককে আটক করে যদি মদ ছাড়া অন্য কিছুই পান করতে না দেয়া হয় আর সে অবস্থায় লোকটি যদি মদ পান করে, তবে কি কেবল এ যুক্তিতেই তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, অবস্থা বাধ্যবাধকতার হলেও তো সে নিজের ইচ্ছা ছাড়া মদ গিলতে পারতো না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ না থাকায় তাকে বাধ্যবাধকতার কারণে সৃজিত ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে শাস্তি আরোপ করা যায় ?

ইসলামের 'হদূদ' মূলত যথাযথ কর্তৃপক্ষই কায়েম করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কাউকেও যিনাকারী নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতে فَاجْلِدُوْا (কোড়া মার) বলে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা জনসাধারণকে দেয়া হয়নি—দেয়া হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও বিচারকমণ্ডলীকে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সকল ফকীহ্ই সম্পূর্ণ একমত। ইসলামী আইন যিনার শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ বলে ঘোষণা করেছে। এ কারণে রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণের উপরই এ আইন জারি হবে—সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম।-তাফহীমুল কুরআন

ইসলামী রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান তখনই কার্যকর করতে উদ্যোগী হবে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাবে। অপরাধের খবর শাসকবৃন্দের গোচরিভূত হলেও প্রমাণ পাওয়া না গেলে শাসকদের শাস্তি বিধানের অধিকার থাকবে না। মদীনায় এক মহিলা সম্পর্কে লোকদের জানা ছিল যে, সে চরিত্রহীনা ব্যভিচারিণী। ইবনে মাজায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الريبة فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهَا -

"মেয়েলোকটির কথায় ও ছুরত-শেকেল থেকে এবং তার কাছে যাতায়াতকারী লোকদের থেকে সন্দেহ জেগে উঠেছিল।"

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে যিনার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ ঐ মহিলা সম্পর্কে নবী করীম স.-এর মুখে এমন কথাও উচ্চারিত হয়েছিল যে,

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِرَجَمْتُهَا -

"অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই যদি আমি কাউকেও রজমের শাস্তি দেয়ার নীতি গ্রহণ করতাম, তাহলে এ মহিলাটিকে অবশ্যই রজমের শাস্তি দিতাম।"

যিনার অপরাধের প্রথম সম্ভাব্য প্রমাণ হলো সাক্ষী পাওয়া। এ সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো যিনা প্রমাণের জন্য অন্তত চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া জরুরী। আবার সাক্ষীও হতে হবে এমন লোক যারা ইসলামের সাক্ষ আইনের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য। যেমন পূর্বে কোনো মোকদ্দমায় সে যেন মিথ্যা সাক্ষদাতা প্রতিপন্ন না হয়ে থাকে। বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী বা কোনো প্রকার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি না হয়। তাছাড়া সাক্ষীগণ অভিযুক্ত নারী-পুরুষকে যৌনসংগম কাজে লিপ্ত অবস্থায় দেখাও শর্ত হিসেবে গণ্য। সাক্ষীগণ কবে, কোথায়, কার সাথে, কে যিনা করেছে—ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ একই ধরনের সাক্ষ দিতে হবে। মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।–তাফহীমুল কুরআন

যিনার অপরাধের দ্বিতীয় প্রমাণ হলো যিনাকারীর নিজের স্বীকারোক্তি। এ পর্যায়ে যিনার স্বীকারোক্তি হতে হবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও সুস্পষ্ট কথা দিয়ে। তাকে স্বীকার করতে হবে যে, সে একটা মহিলার সাথে যৌনসংগম করেছে। [এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানতে হলে তাফহীমুল কুরআন সূরা আন নিসা ও সূরা আন নূর এর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর দেখা যেতে পারে।]

আলোচ্য আয়াতের মধ্যাংশে বলা হয়েছে وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ –"আল্লাহর দীনের ব্যাপারে যেন তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়।" এখানে সর্বপ্রথম যে কথাটির প্রতি লক্ষ করা উচিত, তাহলো ইসলামের দণ্ডবিধি বা ফৌজদারী আইনকে 'আল্লাহর দীন' বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কেবল নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতই দীন নয় বরং রাষ্ট্রীয় আইনও দীনের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। দীন কায়েম করা বলতে কেবল নামায কায়েম করাই বুঝায় না, বরং আল্লাহর আইন এবং শরীয়তী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাও বুঝায়। যেখানে এটা কায়েম নেই সেখানে যদি নামায কায়েম করাও হয়, তবে দীনের কিছু অংশ কায়েম রয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেখানে ইসলামের আইন বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন গ্রহণ করা হবে সেখানে তো স্বয়ং আল্লাহরই আইন বাদ দেয়া হলো।

এখানে দ্বিতীয় লক্ষণীয় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা সাবধান করে দিচ্ছেন যে, যিনাকার নারী-পুরুষের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে অপরাধীর প্রতি দয়া-দরদ যেন তোমাদের হাতকে নিরস্ত করতে না পারে। শাস্তির পরিমাণকে যদি দয়া বা বিশেষ বিবেচনায় কম বা বেশী

করা হয় তবে তা হবে বান্দার প্রতি আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়া-দরদ দেখানো বা আল্লাহর চেয়েও সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শনের শামিল। কিন্তু অপরাধীদের বৈষয়িক মান-মর্যাদার ভিত্তিতে যদি আল্লাহর আইনে রদ-বদল বা কমবেশী করা হয়, তবে তা হবে অধিকতর কঠিন অপরাধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এক ভাষণে বলেছিলেন, "হে লোকেরা ! তোমাদের পূর্বের লোকেরা এজন্যে ধ্বংস হয়েছে যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো সম্মানী ব্যক্তি চুরি করতো তবে তাকে তারা ছেড়ে দিতো। আর যদি কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তবে তার উপর শরীয়তের শাস্তি জারি করা হতো।"

এখানে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শাস্তি তাই দিতে হবে, যা আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ কোড়ার পরিবর্তে অন্য কোনো শাস্তি দিলে তা হবে আল্লাহর সুস্পষ্ট নাফরমানী—আল্লাহর বিধানের প্রকাশ্য বিরোধীতা। আর যদি কোড়া মারার শাস্তিকে বর্বরতা মনে করে তা বাদ দেয়া হয়, তবে এটা হবে পরিষ্কার কুফরী। কেউ এমনটি মনে করলে তার দিলে একবিন্দু ঈমান বর্তমান থাকতে পারে না। ঈমান ও কুফর এক দিলে কখনো একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহকে ইলাহ বলে মানা হবে আর তাঁর হুকুমকে 'বর্বরতা' বলা হবে—এটা কেবল নিকৃষ্টতম মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব ; একজন ঈমানদার তা কখনো করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ –"আর এদের উভয়ের শাস্তির সময় যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।"

অর্থাৎ এদের শাস্তি দিতে হবে প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে ; যেন এতে করে একদিকে অপরাধী লজ্জিত হয়, অন্যদিকে জনগণ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। ফলে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পেয়ে সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও নৈতিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য, চুরির শাস্তি সম্পর্কে সূরা আল মায়েদার ষষ্ঠ রুকূতে বলা হয়েছে ঃ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ "–তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল আল্লাহর তরফ থেকে অপরাধ দমনের শাস্তি।" আর এখানে বলা হয়েছে যিনার শাস্তি দিতে হবে জনগণের সামনে। এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, ইসলামী আইনে অপরাধীকে শাস্তিদানের পেছনে একই সংগে তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এক. অপরাধীকে তার অপরাধের কারণে শাস্তি

দিতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সাথের তার কৃত অন্যায় ও অপরাধের শাস্তির স্বাদ আস্বাদনে তাকে বাধ্য করতে হবে। দুই. সে যেন পুনরায় এ অপরাধ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিন. তাকে দেয়া শাস্তিকে অন্যান্য লোকদের জন্য একটি বিশেষ উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদ বানাতে হবে। এতে করে সমাজের অন্যান্য সদস্যগণের মন-মগজ থেকে অপরাধ প্রবণতাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। যেন তাদের মগজ এমনভাবে ধোলাই হয়ে যায় যে, সমাজের কেউ যেন এমনটি করতে আর কখনো সাহস না করে। তাছাড়া প্রকাশ্য শাস্তিদানের আরেকটি ভাল দিক হলো, এতে করে শাসক-বিচারকগণ কাউকে শাস্তি প্রদানে অকারণ সুবিধাদান কিংবা অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা করার সাহসী হতে না পারে।-তাফহীমুল কুরআন

আজকের বিশ্ব সমাজের জন্য ঐতিহাসিক শিক্ষা হলো আল্লাহর সৃষ্টি —শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ইনসানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তি ও কল্যাণের জন্য একমাত্র তাঁরই দেয়া বিধানের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের বিকল্প কোনো ব্যবস্থাই মানবজাতির জন্য অনুকূল ফলদায়ক হতে পারে না। বরং সমাজের যে কোনো সমস্যার সমাধানে কেবল মানব মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করার ফলে সমাধানের পরিবর্তে দেখা দেয় আরো অসংখ্য সমস্যা—সৃষ্টি হয় বহুমুখী সামাজিক ব্যাধির, যেগুলো ক্রমাগত সংক্রামক ব্যাধিরূপে বিস্তারলাভ করতে থাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

❐

বার

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে ; তাদেরকে আশিটি কোড়া মারবে, আর কখনো তাদের সাক্ষ কবুল করবে না। ওরা নিজেরাই তো ফাসেক। অবশ্য এরপর যারা তাওবা করে আর নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"—সূরা আন নূর ঃ ৪-৫

সতী নারীর প্রতি অপবাদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ —সেই অপরাধীর সাক্ষ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়

পূর্বোক্ত আয়াতে যিনার কদর্যতা, খারাবী ও শাস্তির বিধান বলা হয়েছে। অতপর আলোচ্য আয়াতে কাউকে যিনার ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার এবং কেউ এমনটি করে থাকলে তারও শাস্তির বিধান থাকা আবশ্যক বলে সেই শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ বিধানের তাৎপর্য হলো সমাজে লোকদের প্রণয়-প্রেম কাহিনী এবং পরস্পর অবৈধ সম্পর্কের গল্প-কাহিনীর চর্চা ও আলোচনাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এ কাজে সমাজে কত যে অশান্তি ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। এ ধরনের অনাকাংখিত চর্চা ও আলোচনার বড় খারাবী এই যে, এর ফলে অজ্ঞাতসারে ও অননুভূতভাবে একটা সাধারণ ব্যভিচারপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠে। এক ব্যক্তি মজা করে আরেকজনের নামে সত্য-মিথ্যা ঘটনা বিভিন্ন লোকের কাছে রটনা করে বেড়ায়। দ্বিতীয়জন তাতে আরও কিছু লবণ-মরিচ যোগ করে তৃতীয় কারো কাছে পৌঁছে দেয়। এভাবে পাশবিক ভাবধারায় একটা প্রবাহ যে চলতে থাকে কেবল তাই নয়, বরং খারাপ ঝোঁকপ্রবণতার লোকেরা পুরুষ হোক বা স্ত্রী—জানতে পারে কোথায় কোথায় তাদের ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত প্রথম কদমেই এ খারাপ ভাবধারা বন্ধ করে দিতে চায়। এজন্যে ইসলাম একদিকে হুকুম দেয়, কেউ যিনা করলে

এবং সাক্ষ-প্রমাণে তা প্রমাণিত হলে এমন চরম শাস্তি দিতে হবে যা অন্য কোনো অপরাধেই দেয়া হয় না। আর তা হচ্ছে অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি। অপরদিকে কেউ যদি অন্যের উপর যিনার তোহমত দেয়, তাহলে সে হয় সাক্ষ-প্রমাণে তা সপ্রমাণ করবে, আর তা না পারলে তাকে মিথ্যা দোষারোপ করার শাস্তি পেতে হবে। আর সে শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত। যেন কেউ কারো নামে অযথা মিথ্যা দোষারোপ করতে না পারে।–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে يَرْمُوْنَ শব্দের মূল হলো رَمْى অর্থ নিক্ষেপ করা। এখানে সতী-সাধ্বী নারীদের উপর মিথ্যা যিনার অপবাদ দেয়াকে তাদের পাথর নিক্ষেপের রূপক অর্থে নেয়া হয়েছে। যেন অপবাদকারী একজন সৎ ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপ করেছে, আর শরীয়তে এটাকেই قذف (কযফ) বলে। এ আয়াতে পরিষ্কার নির্দেশ হলো যে কেউ কোনো সতী নারীর উপর যিনার তোহমত আরোপ করে অথচ সেজন্যে চারজন সাক্ষী আনতে না পারে ; তাহলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে। আর কখনো তার সাক্ষ কবুল করা যাবে না, সে তো ফাসেক। অবশ্য সে যদি সত্যিকার তাওবা করে গুনাহর পথ ছেড়ে নেকের পথে চলে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহ্ তো অধিক ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।–সূরা আন নূর ঃ ৪-৫

আয়াতে যদিও يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ফিকাহ্‌বিদগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এখানে কেবল স্ত্রী লোকদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করার কথাই বলা হয়নি, বরং চরিত্রবান পুরুষদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করলেও এ বিধানই কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে "দোষারোপকারী" বলতে কেবল পুরুষদেরকেই বুঝানো হয়নি, বরং স্ত্রীলোকেরাও যদি 'কযফ' মিথ্যা অপবাদের অপরাধ করে, তবে তাদের সম্পর্কে একই বিধান কার্যকর হবে। কারণ আয়াতে اَلَّذِيْنَ শব্দটি পুংলিংগের হলেও যদি কোনো স্ত্রীলোক এমন অপরাধ করে বসে, তবে সে এ বিধানের ব্যতিক্রম হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং উক্ত শব্দটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের বেলাই عَلٰى سَبِيْلِ التَّغْلِيْبُ সাধারণভাবেই প্রযোজ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতে 'কযফ' ও সাক্ষের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাহলো কেউ যদি সতী-সাধ্বী স্বাধীন স্ত্রীলোকের উপর যিনার অপরাধ আরোপ করে, তবে তাকে অবশ্যই এ অপরাধের চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ পেশ করতে হবে। যদি সে এরূপ নির্ভরযোগ্য চারজন সাক্ষী পেশ করতে না

পারে, তবে তাকে আশিটি কোড়া মারবে এবং তাকে চিরদিনের জন্য সাক্ষদানের আযোগ্য ঘোষণা করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কাউকে ইসলামী সমাজে চিরজীবনের জন্য সাক্ষদানের অযোগ্য ঘোষণা করা চাট্টিখানী কথা নয়। বরং সমাজে এটা হবে তার সুনাম চিরতরে খতম হয়ে যাওয়ারই নামান্তর।–তাদাব্বুরে কুরআন

যিনার অপবাদের উল্লিখিত এ শাস্তি শুধু অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোনো অপবাদের বেলায় এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। অবশ্য বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে। আল কুরআনে যদিও এ হদ কেবল যিনার অপবাদের শাস্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের উপস্থিতির আবশ্যকতা সেই সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে।–জাস্‌সাস সূত্রে মাআরেফুল কুরআন

'কযফ' বা যিনার অপবাদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কিছু জরুরী শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত পাওয়া না গেলে কযফের হদ বা শাস্তির বিধান জারি করা যাবে না। এ অপবাদ শাস্তিযোগ্য হওয়ার শর্তাবলীকে ৩টি ভাগে শ্রেণী বিভাগ করা যায় ঃ প্রথমত, এমন শর্তাবলী যেগুলো অপবাদকারীর মধ্যে পাওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, এমন শর্তাবলী যেগুলো যার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয় তার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। তৃতীয়ত, এমন কতিপয় শর্তও থাকতে হবে যেগুলো 'কযফ'–এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

১. অপবাদকারীর মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া আবশ্যক সেগুলো হলো ঃ এক. তাকে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। নাবালেগ এ অপরাধ করলে তার জন্য এ (হদ) শাস্তি প্রযোজ্য নয়। অবশ্য তাকে এ অপরাধের জন্য অন্য কোনো শাস্তি দেয়া যেতে পারে। দুই. তাকে সুস্থ বিবেকবান হতে হবে। কোনো পাগল বা নেশাগ্রস্তকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না। তিন. এ কাজ তাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করতে হবে। কারো ফুসলানীতে বা জবরদস্তি কযফ করলে তার উপর এ হদ জারি করা যাবে না। চার. অপবাদকারী যার যিনার অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পিতা কিংবা দাদা হলে 'কযফ' এর শাস্তি জারি করা যেতে পারে না। পাঁচ. অপবাদকারী বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। বোবা ব্যক্তি ইশারা-ইংগিতে অপবাদ করলে তাকে এ হদ (কযফের শাস্তি) দেয়া যাবে না। এটা হানাফী মাযহাবের হুকুম। কিন্তু ইমাম শাফেঈ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

২. যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে ঃ এক. তাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকা অবস্থায় যিনা করেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। কোনো পাগলের উপর এ অপবাদ দেয়া হলে তাকে 'কযফ' এর শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম মালেক প্রমুখ ভিন্নমত পোষণ করেন। দুই. তাকে বালেগ পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। অর্থাৎ বালেগ অবস্থায় যিনা করেছে বলে দোষারোপ হতে হবে। কোনো নাবালেগ বালকের উপর এমন দোষারোপ করা হলে তাকে হদ্দ (কযফের শাস্তি) দেয়া যাবে না। তিন. তাকে মুসলিম হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম অবস্থায় যিনা করার অপবাদ হতে হবে। কাফের বা কোনো মুসলিমের কাফের থাকা অবস্থায় যিনা করার অপবাদ আরোপ করলেও তার উপর এ হদ জারি করা যাবে না। চার. তাকে স্বাধীন হতে হবে। কোনো দাস-দাসীর উপর অথবা স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন হওয়ার পূর্বে দাস-দাসী থাকা অবস্থায় যিনা করার অপবাদ দিলে এ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। পাঁচ. তাকে যিনা বা যিনার মত কোনো কাজের সন্দেহ হতে মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে কখনই তার যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি —এমন হতে হবে। আর যিনার মত কাজ থেকে পবিত্র হওয়ার মানে, সে কোনো বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ বা প্রায় বিবাহে যৌন সংগম করেছে বলে প্রমাণিত হয়নি।

৩. 'কযফ' সম্পর্কে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক ঃ এক. অভিযোগটি সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা-ইংগিত কোনো হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না। যেমন কাউকে ফাসিক, ফাজের, চরিত্রহীন, দুরাচারী ইত্যাদি বলা বা কোনো স্ত্রীলোককে বেশ্যা, দেহব্যবসায়ী, ছিনাল বলা। তেমনিভাবে গালাগালের শব্দে যেমন, হারামী, হারামযাদা ইত্যাদি বলাকে সুস্পষ্ট যিনার তোহমত বলা যায় না।-বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন দেখুন।

আলোচ্য আয়াতে একটি ইসলামী সমাজের সুস্থতা, শান্তি ও শৃংখলা বিধানের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কোনো ছিদ্রান্বেষী দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যেন সমাজে অকারণে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে না পারে এখানে সে পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার বিধান জারী করা হয়েছে। এজন্যে কারও বিরুদ্ধে যিনা-ব্যভিচারের দোষ আরোপ করতে হলে অন্তত চারজন স্বচক্ষে দেখা লোকের সাক্ষ পেশ করতে হবে। অবস্থা এমন যে, কেউ যদি একাকী কাউকে যিনারত অবস্থায় নিজ চক্ষেও দেখে তবুঁও আরও তিনজন ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া সে ব্যক্তি একা ঘটনাটি কারো কাছে প্রকাশ করার পথ নেই। সে যেন দেখেও চুপ থাকে। যেন যেখানের ময়লা সেখানেই থেকে যায়—

বাইরে যেন ছড়িয়ে গিয়ে গোটা সমাজকে দুর্গন্ধময় করে না ছাড়ে। অবশ্য সাক্ষীর যোগাড় করতে পারলে সমাজে এহেন খারাপ চর্চার দ্বার রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি যথার্থ কর্তৃপক্ষের গোচরিভূত করা উচিত এবং আদালতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধ প্রমাণ করে তাদের শাস্তি দেয়া কর্তব্য।

সমাজের যেসব কুলাংগার নিজেদের স্বার্থে, কোনো কুমতলব চরিতার্থ করার মানসে অথবা কাউকে অযথা বদনাম করার অসদোদ্দেশ্যে নির্বিকার চিত্তে কোনো ভদ্র মহিলার দুর্নাম রটিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায়, তাদের যন্ত্রণা থেকে সাধারণভাবে মানুষের পেরেশানী ঘুচানোর জন্যে উপরোক্ত বিধান। মেহেরবান আল্লাহ মানুষের শান্তি ও কল্যাণের সুদূর প্রসারী লক্ষে দায়িত্ব বিবর্জিত কুৎসা-রটনাকারীদের জন্য এ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন, যেন জেনেবুঝে কেউ এমন কঠিন পথে পা না বাড়ায়, সখের বশবর্তী হয়ে যেন কেউ কারো বদনাম করার দুঃসাহস না করে। যদি কারো নজরে সত্যিকারভাবে হঠাৎ করে কিছু পড়েও যায় এবং সেখানে আর কোনো বেশী মানুষ না থাকে, তবে সেখান থেকে শাস্তির ভয়ে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায় এবং সেকথা প্রকাশ করা থেকে নিজের জিহ্বাকে সামলে নেয়, যেহেতু তার একার দেখা ঘটনা প্রমাণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়, বরং সে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে দুর্ঘটনায় পতিত মনে করে সময়ন্তরে তাদেরকে তাওবা করার সৎ পরামর্শ দেয় এবং জীবনভর যেন একথা কারো কাছে প্রকাশ না করে। তাহলে নবী স.-এর ভাষায় আল্লাহ্ তাআলাও তার অনেক অপরাধ ঢেকে দেবেন। এসব ব্যবস্থা এজন্যে যে অপরাধজনক এসব অবস্থাও আচরণ দুর্গন্ধময় মলমূত্রের ন্যায়, এগুলো নাড়াচাড়া করলে এর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে সমাজ কলুষিত হয়, মানুষ কষ্ট পায় আর মানুষের মধ্যে এর বিষাক্ত ক্রিয়া ছড়িয়ে সমাজ দেহের ক্ষতি হতে থাকে। এতে করে যারা এ কাজকে ঘৃণা করতো তাদের মধ্যেও এর উস্কানী দেখা দেবে, শরীফ ঘরের মেয়েদের মানসম্ভ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর কুপ্রভাবে অনেকে প্রভাবিত হয়ে পড়ার আশংকাও দেখা দেবে।-ফী যিলালিল কুরআন

❐

তের

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

"যারা নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (এ অপবাদের পক্ষে) কোনো সাক্ষী না থাকে ; তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলবে যে, সে অবশ্যই (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লানত পড়ুক। পক্ষান্তরে, স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে—যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে সে (পুরুষটি তার অভিযোগের ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী। তারপর (সেও) পঞ্চমবারে বলবে সে (স্বামী) সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক। আর যদি তোমাদের উপর (হে মুমিনগণ) আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো (তাহলে স্ত্রীদের উপর অভিযোগের বিষয়ে তোমরা বড় জটিলতার সম্মুখীন হতে) বস্তুত আল্লাহ তো তাওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময়।"

–সূরা আন নূর ঃ ৬-১০

নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও সাক্ষ-প্রমাণ দিতে হবে

আলোচ্য আয়াতে কারীমা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের অব্যবহিত পরে নাযিল হয়েছে। পূর্বে সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়ার বিধান আলোচনা হয়েছে। 'কযফ' বা অপবাদ সংক্রান্ত আয়াত এবং এর শাস্তি সংক্রান্ত বিধান আলোচনা হলে লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ভিন্ন নারী-পুরুষের

অসৎকাজ দেখে ৪জন সাক্ষী না পেলে তো মানুষ সবর করতে পারে, মুখ বন্ধ রেখে ঘটনাটি এড়িয়ে যেতে পারে ; কিন্তু কেউ যদি নিজ স্ত্রীর দুষ্কৃতি স্বচক্ষে দেখতে পায়, তখন সে কি করবে ? তাকে হত্যা করলে উল্টো তার শাস্তি পেতে হবে। সাক্ষী খোঁজ করতে গেলে তো অপরাধীরা এতক্ষণ বসে থাকবে না—তাদের কাজ সেরে কোথায় পালিয়ে যাবে। আর নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে এমনটি হলে কি সবর করা যায় ? স্ত্রীকে হয়ত তালাক দিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু এতে তো তার যেমন কোনো শাস্তি হলো না তেমনি তার প্রেমাস্পদও রেহাই পেয়ে গেল। তদুপরি স্ত্রীর অবৈধ সন্তান হলে পরের সন্তান লালন-পালনের দায়-দায়িত্বও বহন করতে হবে। প্রথমদিকে হযরত সাআদ ইবনে উবাদাহ রা. এরূপ একটি কল্পিত প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি এমনভাবে বললেন, "আল্লাহ না করুন, আমি যদি এরূপ ঘটনা আমার ঘরে হতে দেখি ; তাহলে কি সাক্ষী তালাশ করতে যাব, না তলোয়ার দিয়ে তৎক্ষণাৎ কাজ সমাধা করে দেব।" কয়েক দিনের মধ্যেই রাসূলের দরবারে এ ধরনের বাস্তব ঘটনা পেশ হতে শুরু করে। স্বামী-স্বচক্ষে এরূপ ঘটনা দেখে নবী করীম স.-এর দরবারে পেশ করতে থাকে।–তাফহীমুল কুরআন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন কুরআনে যিনার অপবাদের শাস্তি (হদ) সম্পর্কিত আয়াত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপকারী পুরুষকে স্বচক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যাদের একজন হবে সে নিজে। অন্যথা অপবাদকারীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে আশিটি বেত্রাঘাত পেতে হবে এবং তার সাক্ষ চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াতগুলো শুনে আনসারদের সরদার হযরত সাদ ইবনে উবাদা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে ? রসূলুল্লাহ স. সাদ ইবনে উবাদা রা.-এর মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা কি শুনেছ তোমাদের সরদার কি কথা বলেছেন ? আনসারগণ- বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না, তিনি তো নিজের তীব্র আত্মমর্যাবোধ থাকার কারণে একথা বলেছেন। অতপর হযরত সাদ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায়

দেখি যে তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি সেজন্যে তাকে শাসিয়ে দেই এবং সেখান থেকে ভাগিয়ে দেই ; না আমার জন্য এটা জরুরী যে আমি চারজন লোক ডেকে এনে অবস্থা দেখাই তাদের সাক্ষী বানাই ? যতক্ষণ আমি সাক্ষী ডাকতে যাব ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না ?–কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন

কযফের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এবং হযরত সাদ ইবনে উবাদার অল্প কিছুদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে তিনি ঘটনাটি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটি গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের সরদার সাদ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন তো শরীয়তের আইন অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স. হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি কোড়া মারবেন আর জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলা আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়াতে আরও বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. হিলালের ব্যাপার শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো, না হয় অপবাদের শাস্তি স্বরূপ তোমার পিঠে আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আরয করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এমন কোনো বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল আ. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ স. হিলালকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয করলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এ আশাই পোষণ করেছিলাম। অতপর রসূলুল্লাহ স. হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন, স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বললো, আমার স্বামী হিলাল আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন,

তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ্ জানেন। প্রশ্ন হলো তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আযাবের ভয়ে তাওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে ? হিলাল আরয করলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ স. আয়াত অনুযায়ী উভয়কে 'লিআন' করানোর আদেশ দিলেন। [لعان (লিআন)-এর শাব্দিক অর্থ কারো প্রতি আল্লাহর গযব নেমে আসার বদদুআ করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আলোচ্য আয়াতে (সূরা আন নূর ৬-১০) বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্র গযব দেয়ার কসমকে 'লিআন' বলে।]

প্রথমে হিলালকে বলা হলো, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ দাও, অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ দিলেন। পঞ্চম সাক্ষের কুরআনী ভাষা হলো যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে। এ সাক্ষের সময় রসূলুল্লাহ্ স. হিলালকে বললেন, দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহর আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এ পঞ্চম সাক্ষই শেষ সাক্ষ। এরই ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। হিলাল আরয করলেন, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ সাক্ষ্যের কারণে পরকালে আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের কসম সহ্ চার সাক্ষ নেয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষের সময় রসূলুল্লাহ স. বললেন, একটু থাম, আল্লাহকে ভয় করো। এ সাক্ষই শেষ সাক্ষ। পরকালে আল্লাহর আযাব দুনিয়াতে মানুষের আযাবের চেয়ে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগলো। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বললো : আল্লাহর কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না। অতপর সে পঞ্চমবার একথা বলে সাক্ষ দিল, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গযব পড়বে। এভাবে লিআনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন—অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফায়সালা দিলেন যে, এ গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে গণ্য ও কথিত হবে—পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। অথচ সন্তানটিকে ধিকৃত করাও যাবে না।—তাফসীরে মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন

তাফহীমুল কুরআনে আরও কিছু কথা যোগ করা হয়েছে, তাহলো ঃ যে কেউ তার বা তার সন্তানের উপর দোষারোপ করবে তার উপর কযফের শাস্তি জারি হবে। ইদ্দতের সময়ের খরচ ও বাসস্থান হিলালের কাছ থেকে পাওয়ার আর কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা সে তালাক কিংবা মৃত্যু ছাড়াই স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তারপর নবী করীম স. লোকদের বললেন, এ স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করলে তোমরা লক্ষ রাখবে সে সুরাত-সেকেলে কার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। হিলালের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে তা হিলালের সন্তান বিবেচিত হবে। অন্যথা এটা ঐ ব্যক্তির সন্তান বলে গণ্য হবে যার সাথে স্ত্রীলোকটি হারামী করেছে বলে অভিযোগ এসেছে। সন্তান ভুমিষ্ঠ হলে দেখা গেল যে সন্তানটি শেষোক্ত ব্যক্তির সুরাত-সেকেলের হয়েছে। তখন নবী করীম স. বললেন ঃ

لَوْلاَ الاَيْمَانَ (او لولا مضى من كتٰبِ اللّٰهِ لَكَان لى ولهاشان)

যদি কসম করা না হতো (অথবা আল্লাহর কিতাব আগেই ফায়সালা করে না দিতো) তাহলে আমি ওকে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন করে ছাড়তাম।–তাফহীমুল কুরআন,

লিআন সংক্রান্ত আইন বিষয়ে ফকীহগণের বিস্তারিত মতামত জানার জন্য দেখুন 'তাফহীমুল কুরআন'।

❒

চৌদ্দ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"যারা এ মিথ্যা অভিযোগ রচনা করেছে তারা তো তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এটাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ভেবো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; ওদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ওদের কৃত পাপের ফল। আর ওদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"–সূরা আন নূর ঃ ১১

নিষ্কলুস সম্ভ্রান্ত নারীর বিরুদ্ধেও অপবাদ রটানো হয়

সূরা আন নূর-এর প্রথম থেকে যিনার অপরাধ, যিনার শাস্তি, যিনার মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি এবং নিজ স্ত্রী বা স্বামীর বিরুদ্ধে অপবাদের মিমাংসা—ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ (শাস্তি) প্রসংগে চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারলে কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি কোড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যিনা ও এতদসংক্রান্ত অপবাদ ও মিথ্যা তোহমত দেয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত ছিল সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে। কিন্তু উপরোক্ত ১১ আয়াতে আলোচ্য জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রচনার বিষয়টিকে স্বয়ং রসূলের পবিত্র সহধর্মীনী সম্পর্কে রটানো হয়েছিল।

ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ রটনা করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি সেই আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ হিংসার বশবর্তী হয়ে কত জঘন্য কাজ করতে পারে এটা তারই একটা দৃষ্টান্ত।

আরবের মধ্যে আগত মানবকুল শিরোমণি শ্রেষ্ঠনবী ও দয়ামায়ার মূর্তপ্রতীক প্রাণ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-এর পরিবারের প্রতি নিছক কল্পনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যে কলংক লেপন করা হয়েছিল, তার বিষাক্ত

ছোবল-বেদনায় তৎকালীন গোটা মুসলিম সমাজকে জর্জরিত করেছিল। এ কঠিন জঘন্য মিথ্যা বানোয়াট অপবাদের ঘটনাটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই ১১ থেকে ২৬ আয়াত সম্বলিত দীর্ঘ একটি অধ্যায় ব্যাপী বিবৃত করেছেন।

এসব আয়াতে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা ছিল একটা সম্পূর্ণ বানোয়াট রটনা মাত্র। এ ঘটনা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পবিত্র কিছু মানুষের জীবনকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তাঁদের জীবনকে অসহনীয় বেদনায় ভরে দিয়েছিল যাতে তাঁদের অন্তর অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, গোটা মুসলিম উম্মাহকে এমন এক অব্যক্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যার নজীর সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ব্যথা দরদের নবী আল্লাহর প্রিয়তম হাবীবকে জর্জরিত করেছিল। তাঁর পরম প্রিয় পত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছিল। সিদ্দীকে আকবার ও তাঁর মমতাময়ী পত্নীর অন্তরকে পেরেশান করে দিয়েছিল। সরল-সহজ নিরপরাধ রসূলের পরম আস্থাভাজন মুয়াত্তাল ইবনে সফওয়ানের সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম ছড়িয়ে মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছিল।

নিদারুন সে ব্যথা-বেদনার করুণ কাহিনী আমরা মা আয়েশা রা.-এর যবানীতেই শুনবো—তিনি বলেন, রসূলে করীম স.-এর নিয়ম ছিল কোনো সফরে গেলে যে কোনো একজন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতেন। কাকে সাথে নিবেন সে বিষয়ে 'কারআ' বা লটারী দিয়ে যার নাম উঠতো তাকে সাথে নিতেন। পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিক-এ রওয়ানা হওয়ার সময় লটারীতে আমার নাম উঠলো। অতপর তাঁর সাথে আমি রওয়ানা হই। এ সময় হিজাব বা পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর আমাকে উটের পিঠে রক্ষিত হাওদাজে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ হাওদাজে আমি নিজেই উঠানামা করতাম। এভাবেই আমরা এগিয়ে গেলাম। অবশেষে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। পথে একস্থানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। আমরা তখন মদীনার নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমন সময় রাত্রিতে কাফেলাকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা শুনানো হলো। যখন ঘোষণা হচ্ছিলো, তখন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে আসার সময় বুকে হাত দিয়ে দেখলাম আমার গলার হারটি নেই। বুঝলাম নখে লেগে হারটি ছিড়ে গেছে। হারটি খুঁজতে ফিরে গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে বেশ কিছু দেরী

হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কাফেলা রওয়ানা করার সময় হয়ে গেছে। আমার হাওদাটি উটের পিঠে উঠিয়ে দেয়ার দায়িত্বে যারা ছিল, তারা আমাকে ভিতরে মনে করে হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দিল। আমি যে ভিতরে নেই তা তারা টেরও পায়নি। তখন আমার বয়স ছিল কম আর শরীর ছিল ক্ষীণ, হালকা-পাতলা। এভাবে তারা উটটিকে কাফেলার সাথে চালিয়ে দিল। আমি হারটি খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে দেখি সবাই বেশ পথ চলে গেছে। এজন্যে যেখানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম। ভাবলাম, কিছুদূর গিয়ে তারা অবশ্যই আমার অনুপস্থিতি টের পেয়ে আমার খোঁজে ফিরে আসবে। আমি বসে থাকতে থাকতে প্রবল ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। এ সময় সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল, যাকে পেছনে পড়ে থাকা কোনো কিছু কুড়িয়ে নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত দেখে আমার কাছে এলো এবং আমাকে চিনতে পেল। কারণ সে হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আমাকে দেখেছিল। সে বুঝতে পেল নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর আমাকে দেখে অমনি বলে উঠলো, "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।" তার এ আওয়ায শুনে আমি জেগে উঠি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাখি। আল্লাহর কসম সে আমার সাথে একটি কথাও বলেনি আর আমি তার ইন্না লিল্লাহি .... পড়া ছাড়া আর কোনো আওয়ায শুনিনি।

সে ব্যক্তি একটু চিন্তা করে নেয়ার পর তার উটনীটিকে বসতে বললো। উটনী তার সামনের দুপা বাড়িয়ে বসে পড়লো। তারপর আমি তার উপর সওয়ার হলাম। তখন সে এটিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। অবশেষে আমরা আমাদের বাহিনীর কাছে পৌছে গেলাম। সেখানে তারা পেছনে কিছু ছুটে গেল কিনা তা খোঁজার জন্য যাত্রা বিরতি করছিল। রেওয়ায়াতকারী বলেন, হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, এ সময় যে বা যারা আমার মান-সম্মান ধ্বংস করতে গিয়েছিল, মূলত সে বা তারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তোহমতের এ গুনাহের কাজে যে বিরাট অংশ নিয়েছিল সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক সরদার)। তারপর আমরা মদীনায় পৌছলাম। এরপর আমি পুরো মাস অসুস্থ ছিলাম। এ সময় রটনা সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছু বলাবলি করেছে। কিন্তু আমি এর কিছুই জানতে পারিনি। তবে আমার অসুস্থ অবস্থায় একটা কথা আমার মনে খটকা জাগাতো। তা হচ্ছে অন্য সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ হৃদয়াবেগ নিয়ে আমার কাছে আসতেন, বসতেন, খোঁজখবর নিতেন। এ সময় আমি কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে অনুরূপ মায়া মমতাপূর্ণ ব্যবহারটা দেখলাম না। তিনি অবশ্য আসতেন,

সালাম করতেন আর জিজ্ঞেস করতেন "কেমন আছো" ব্যাস, এই বলে চলে যেতেন। এ আচরণটা তাঁর সম্পর্কে আমার মনে বেশ কিছু সংশয় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

তারপর এক রাতে আমি ও মেসতাহের মা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম, সেখানে রাত্রিতে গিয়ে আমরা প্রয়োজন সেরে আসতাম। কারণ তখনও শৌচাগার তৈরি হয়ে উঠেনি, আর সেজন্যে আমরা রাত ছাড়া বের হতাম না। আমরা প্রয়োজন সেরে ফিরে আসার পথে উম্মে মেসতাহ হঠাৎ করে তার চাদরের আঁচলে বেধে পড়ে গেল। আর অমনি বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠলো, "তায়েসা মেসতাহ" (মেসতার মৃত্যু হোক) একথা শুনে আমি বললাম, ছিঃ তুমি বড়ই নিকৃষ্ট কথা বললে, তুমি গালি দিলে এমন এক ব্যক্তিকে যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন সে বললো, রাখ তার কথা, হায় তুমি শোননি সে কি কথা বলেছে ? জিজ্ঞেস করলাম, কি বলেছে সে ? তখন সে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বললো। ফলে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। তারপর আমি বাড়ীতে ঢুকতেই রসূলুল্লাহ স. ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন, কেমন আছ ? তখন আমি শুধু বললাম, আমাকে বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। সেখানে গিয়ে তাদের সামনেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি বাপ-মার কাছে চলে গেলাম। তারপর মাকে বললাম, লোকেরা এসব কি বলাবলি করছে ? তিনি বললেন, তোর উপর এ রটনার ব্যাপারটা আমার মান-সম্ভ্রম শেষ করে দিয়েছে। এটাই দুনিয়ার রীতি, যখনি কোনো মেয়ে সৌভাগ্যবতী হয়ে যায়, স্বামী সোহাগিনী হয়, স্বামীও তাকে ভালবাসেন, উপরন্তু যদি কয়েকজন সতীন থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে কিছু হিংসুটে লোক এ ধরনের মিথ্যা রটনা করে তার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করার অপপ্রয়াস চালায়, সতীনরাও এতে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। এসব শুনে আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ নিয়ে লোকেরাও এভাবে বলাবলি করতে পারছে ? রেওয়ায়াতকারী বলেন, তিনি (হযরত আয়েশা রা.) বললেন, অতপর আমি সারারাত ধরে কাঁদলাম, সকাল হয়ে গেল, এক মুহূর্তের জন্যও আমার চোখের পানি থামেনি, আর সারারাত একটি বারের জন্যও আমার চোখের পাতা বন্ধ হয়নি। এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থাতেই সকাল করেছি।

–ফী যিলালিল কুরআন

তিনি বলেন, অন্তত এক মাসকাল পর্যন্ত এ মিথ্যা দোষারোপের ভিত্তিহীন কথা সমাজে উড়ে বেড়াতে লাগলো। নবী করীম স. মানসিক কষ্ট ও দ্বন্দ্ব অনুভব করতে লাগলেন। আমি কান্নাকাটি করতে থাকলাম। আমার পিতা-

মাতা অপরিসীম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। অবশেষে একদিন নবী করীম স. এসে আমার কাছে বসলেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কাছে এসে বসেননি। হযরত আবু বকর রা.ও উম্মে রোমান (হযরত আয়েশার মা) ভাবলেন, আজ কোনো সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এজন্যে তাঁরা দুজনও নিকটে এসে বসলেন। নবী করীম স. বললেন, "আয়েশা তোমার সম্পর্কে এসব কথা আমার কাছে পৌছেছে। তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তবে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করে ক্ষমা চাও। বান্দা নিজের গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন।" একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমি পিতাকে বললাম, "আপনি রসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন।" তিনি বললেন, মারে, আমি কি বলবো— বুঝে উঠছি না।" আমি মাকে বললাম, "আপনিই কিছু বলুন।" তিনিও বললেন, "আমার বুঝে আসে না যে, আমি কি বলবো।" তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে, আর অমনি তা মনের মধ্যেও বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, "আমি নির্দোষ, আর আল্লাহ সাক্ষী আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ—তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা স্বীকার করে নেই যা আমি আদৌ করিনি— আল্লাহ তো জানেন আমি কোনো দোষের কাজ করিনি—তবে আপনারা তা সত্য বলে মেনে নেবেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তখন হযরত ইয়াকুবের নাম নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মরণে আসলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এ পরিস্থিতিতে আমি সে কথা বলা ছাড়া উপায় দেখছি না, যা বলেছিলেন হযরত ইউসুফের পিতা—"ফা-সাবরুন জামীল" فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ—একথা বলে আমি শুয়ে পড়লাম। আর অপরদিকে পাশ ফিরে শুইলাম। তর্খন আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ তো আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত ঘটনা লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দেবেন। অবশ্য আমার মনে এমন ধারণা আসেনি যে আমার পক্ষে ওহী নাযিল হবে, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পড়া হবে। আল্লাহ নিজে আমার ব্যাপারে কথা বলবেন, তা আমি কখনো ধারণা করতে পারিনি। আমি এতটুকু ভেবেছিলাম যে, রসূলুল্লাহ স. কোনো স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ ও প্রকাশ করে দেবেন।

এরি মধ্যে নবী করীম স.-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখা দিল। ওহী নাযিলের সময় ভীষণ শীতের মধ্যেও তাঁর চেহারা মোবারক

হতে ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে থাকতো। এ অবস্থা দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি তো পূর্ণ মাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা-মাতার অবস্থা ছিল এতই মর্মান্তিক যে কাটলেও রক্ত পড়তো না। আল্লাহ কোন্ মহাসত্য উদ্ঘাটিত করে দেন সে চিন্তায় তাঁরা ছিলেন খুবই উদ্বিগ্ন। ওহী নাযিলের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রসূলে করীম স.-কে খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। তিনি হাস্যাবস্থায় প্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল এই, "আয়েশা, তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন। অতপর তিনি ১১ থেকে ২১ পর্যন্ত দশটি আয়াত পড়ে শুনালেন। আমার মা বললেন, "উঠো, রসূলুল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।" আমি বললাম, আমি না ওনার শুকরিয়া আদায় করবো, না আপনাদের দুজনের ; আমি তো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ মিথ্যা অভিযোগকে অসত্য বলেও ঘোষণা করেননি।"—তাফহীমুল কুরআন

হযরত আয়েশা রা.-এর নামে যারা এ মিথ্যা গুযব ছড়িয়েছিল হাদীস শরীফে তাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। তারা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রেফায়া (সম্ভবত সে ছিল রেফায়া ইবনে যায়েদ নামক ইহুদী মুনাফিকের পুত্র) মিছতাহ ইবনে উছাছা, হাস্সান ইবনে ছাবেত ও হামনা বিনতে জাহাশ। এদের প্রথম দুজন ছিল মুনাফিক। বাকী তিনজন মুমিন। এ তিনজন দুর্বলতা ও ভ্রম বশত এ ফিতনায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া আর যারা কমবেশী এ গুনাহে অংশ নিয়েছিল, হাদীস ও জীবন চরিত গ্রন্থে তাদের কোনো উল্লেখ নেই।—তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে বুঝা যায় যে, হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর কাজ কোনো এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র নয়, বরং তারা হচ্ছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত একটি দল—এতে জড়িত কেবল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলই নয়, হাঁ সে এ কুচক্রী দলের প্রধান, সে-ই গোটা মুসলিম সংগঠন ও জনশক্তিকে ভেংগে চুরমার করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল, সে-ই পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর প্রিয় এ নবগঠিত ও সুসংহত দলটির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম জাতিকে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিল। এরা মূলত সেই জনগোষ্ঠী, যারা প্রকাশ্য যুদ্ধে মুসলমানদের হারাতে না পেরে গোপনে এক মাসের মধ্যেই এ মহাপরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছিল। পর্দার আড়ালে থেকে

তারা কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুসলিমকে তাদের কাজে লাগিয়েছিল। এ ঘটনাটি ছিল ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্তগুলোর মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মক ষড়যন্ত্র। এতে করে তারা ইসলামের মূলকেন্দ্র স্বয়ং নবীর ঘরেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। যে মহান ব্যক্তির নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলামের চূড়ান্ত অভিযান পরিচালিত হচ্ছিল সেই মহা বিপ্লবী বীরকে হতবল করার উদ্দেশ্যে তাঁর হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিতে চেয়েছিল তারা। কত আশ্চর্যজনক-ভাবে তারা রসূলের একান্ত ঘরের মানুষ হামনা বিনতে জাহাশ, তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ও গুনমুগ্ধ কবি হাসসান ইবনে সাবেত, তাঁর নিজ গোষ্ঠীর মানুষ বদরী সাহাবী মেস্তা ইবনে উছাছা প্রমুখ ব্যক্তিকেও সে এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিল, যার জন্য তারা এটা-ওটা দায়িত্বহীন মন্তব্য করে বসেছিল। কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজে।

এ মহা চক্রান্তের পরিণাম জানাতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলছেন যে, চক্রান্তকারীরা যাই আশা করুক না কেন এবং যত ক্ষতি করার চেষ্টা চালাক না কেন, আসলে ওরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের সকল প্রচেষ্টা বুমেরাং হয়ে ওদের উপরেই ফিরে আসবে। তাই আল কুরআন ঘোষণা করছে, তোমরা ভেব না যে, ওদের এসব চক্রান্ত তোমাদের জন্য ক্ষতিকর, বরং তোমাদের জন্য এটা হবে সবদিক থেকেই কল্যাণকর।–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ মিথ্যা অভিযোগকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ইফ্‌ক (إفك) ; মানে মূল কথাকে উল্টে দেয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত যা ইচ্ছা বলে বেড়ানো। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ অভিযোগের পূর্ণ প্রতিবাদ করেছেন।

ইফ্‌কের এ ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে তার তিনটি দিক রয়েছে। একটি হলো, মুসলমানদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা একটি গোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল। মিথ্যা অপবাদের এ ঘটনাটি সংগঠিত না হলে এ গোষ্ঠী কত মারাত্মক আকার ধারণ করতো আর তাদের দ্বারা মুসলমানরা কত যে ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতো— সে কথা হয়তো কখনো প্রকাশ পেত না। দ্বিতীয় দিক হলো, মুসলমানদের মধ্যে যেসব ঈমানী দুর্বলতা গোপন ছিল তা এ পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং যথাসময়ে তা সংশোধন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক স্বচ্ছতার দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তৃতীয় দিকটি

হলো, এ ঘটনাটি সমাজের সংশোধন ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত বহু আহকাম ও হেদায়াত নাযিল হওয়ার একটা মোক্ষম পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ ঘটনায় সৃষ্ট পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে অনেক লোক এতদসংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোনো মূল্যই দিতো না।–তাদাব্বুরে কুরআন

আল কুরআন 'ইফ্‌ক' বা তোহমতের এ ঘটনাকে মুমিনদের জন্য বিশেষত যাঁদের বিরুদ্ধে সেই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল তাঁদের জন্য কল্যাণকর বলার পেছনে আমরা উপরোক্ত দিকসমূহ দেখতে পেলাম। একথাটাই আল কুরআন এভাবে বলেছে ঃ

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

"এটাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ভেব না, বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

এভাবে সুদীর্ঘ একটি মাস ধরে নবী পরিবারকে চরম ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আয়েশা রা.-এর পবিত্রতা সম্পর্কে দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁদের পরীক্ষার সমাপ্তি টানলেন। রসূলুল্লাহ স. সহাস্যবদনে হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন ابشرى يا عائشة اما الله فقد ابراك–"আয়েশা! সুসংবাদ শোন। আল্লাহ তাআলা তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন।"

উম্মুল মুমিন হযরত আয়েশা রা.-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ইমাম বাগভী রহ. উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন, হযরত আয়েশা রা.-এর এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় বর্ণনা করতেন। এক. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল রেশমী কাপড়ে তাঁর ছবি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে দেখিয়ে বলেন, এ আপনার স্ত্রী। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন। দুই. রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ছাড়া আর কোনো কুমারীকে বিবাহ করেননি। তিন. তাঁর কোলে রসূলুল্লাহর ওফাত হয়। চার. তাঁর ঘরেই রসূলুল্লাহ স. সমাধিস্থ হন। পাঁচ. তাঁর সাথে একই লেপের নীচে শায়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহর উপর ওহী নাযিল হয়। অন্য কোনো বিবির এ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ছয়. তাঁর নির্দোষিতা সম্পর্কে আসমান থেকে আয়াত নাযিল হয়েছে। সাত. তিনি রসূলুল্লাহর খলীফার কন্যা ও সিদ্দীকা ছিলেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করা হয়। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে তাঁর পুত্র ঈসা শিশুর সাক্ষ দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করা হয়। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন।–মাআরেফুল কুরআন

❐

পনের

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا لا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ○ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ج فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ○ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○

"তোমরা যখন একথা শুনতে পেয়েছিলে, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলো না ? আর কেনই বা বলে দিল না যে এটা তো নির্জলা অপবাদ ? ওরা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না ? এখন যেহেতু ওরা চারজন সাক্ষী পেশ করলো না, কাজেই ওরাই আল্লাহর কাছে মিথ্যুক। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে তোমরা যেসব কথাবার্তায় জড়িত হয়ে পড়েছিলে, সে জন্যে গুরুতর আযাব তোমাদের গ্রাস করতো।"–সূরা আন নূর ঃ ১২-১৪

নিষ্কলুষ সম্ভ্রান্ত নারীর অপবাদ শুনে মুমিনদের কি করা উচিত ?

ইফ্‌কের ঘটনা সাজিয়ে মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ইসলামী সমাজের চরম বিরূপ চিত্র রটানোর অপচেষ্টা চলেছিল। স্বয়ং রসূলের স্ত্রীর চরিত্রে কল্পিত কালিমা লেপনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের ভিত প্রকম্পিত করে চিরতরে ইসলামের আলো ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। মেহেরবান আল্লাহ সেই কঠিন বিপদ থেকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছিলেন প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিয়ে। উপরোক্ত আয়াত কটিতে সেই অসহনীয় যন্ত্রণা ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ঈমানদারদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উড়ে চলা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে মুমিন নারী-পুরুষের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চলার জন্য রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন এসব আয়াতে। এসব আয়াতে যাকিছু বলা হয়েছে তাহলো ইফ্‌কের এ ঘটনাটি তো তেমন কোনো গভীর চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিল না। এটা শুনার সাথে সাথেই

প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত ছিল একে সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া ও অমূলক বলে প্রথম চোটেই উড়িয়ে দেয়া। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ

তোমরা যে সময় একথা শুনতে পেলে সে সময় মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন ? আয়াতাংশের আরেকটি তরজমা হতে পারে এই ঃ ঘটনাটি সাজিয়ে যখন রটানো হলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের লোক সম্পর্কে বা নিজেদের সমাজ ও মিল্লাতের লোকদের সম্পর্কে নেক ধারণা পোষণ করলো না কেন ? আয়াতের শব্দগুলোর এ দু প্রকারের অর্থই হতে পারে। আল কুরআন এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করেছে।

কথা হলো, হযরত আয়েশা রা. এবং সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. সম্পর্কে রটানো বিষয়টি ছিল কেবল এতটুকু যে, কাফেলার একজন মহিলা কাফেলা থেকে পেছনে পড়ে যায়। কাফেলার অপর এক ব্যক্তি যিনি পেছনে থেকে কোনো পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন—তাঁকে দেখে নিজের উটের উপর বসিয়ে নিয়ে এসেছেন। এখন কেউ যদি বলে, খোদা না খাস্তা তাঁরা দুজন পরস্পরকে একাকীত্বে পেয়েই গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে তার একথার বাহ্যিক শব্দের দুটো অর্থ ধরে নিতে হয়। এক. যে লোক এরূপ কথা বলে—সে স্ত্রী হোক বা পুরুষ—সে নিজেই যদি এরূপ অবস্থায় হতো, তাহলে সে গুনাহ না করে থাকতে পারতো না। যদি সে গুনাহ হতে বিরত থেকেই থাকে, তবে তা শুধু এজন্যে যে, সে বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কখনো একাকীত্বে পায়নি। পেলে কখনো এ মহাসুযোগ সে ছেড়ে দিতো না। দ্বিতীয় অর্থ হলো, সে যে সমাজের লোক, সে সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, এখানে কোনো নারী বা পুরুষ এমন নেই যে এ ধরনের কোনো সুযোগ পেলে গুনাহ থেকে বিরত থাকতো। অর্থাৎ কেউই বিরত থাকতো না। এটা তো তখন হতে পারে যখন তা কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারীর ব্যাপার হয়। আর সেই নারী ও পুরুষ যদি একই শহরের অধিবাসী হয়। আর নারী ঘটনাচক্রে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। সে যদি সেই পুরুষটির বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তির স্ত্রী, ভগ্নী বা কন্যা হয়। তাহলে ব্যাপারটি আরও কঠিন রূপ পরিগ্রহ করবে। কথাটির অর্থ দাঁড়ায় —যে ব্যক্তি একথা বলে সে নিজ ও তার সমাজ—উভয় সম্পর্কেই এমন

জঘন্য ধারণা পোষণ করে, যার সাথে শালীনতার দূরতম সম্পর্কও নেই। কোনো লোক যদি তার বন্ধু, প্রতিবেশী কিংবা পরিচিত ব্যক্তির ঘরের কোনো নারীকে ভুল-ভ্রান্তিতে পথে-ঘাটে পেতে পারে। তবে সে প্রথমেই মহিলাটির আবরু বিনষ্টের চেষ্টা করবে। তারপর হয়তো সে তাকে ঘরে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।

কিন্তু এ 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনায় তদপেক্ষাও সহস্রগুণ বেশী কঠিন। স্ত্রীলোকটি তো অপর কেউ নয় ; তিনি রসূলে করীম স.-এর স্ত্রী। প্রত্যেক ঈমানদারই যাঁকে নিজের মা অপেক্ষা অধিক সম্মানযোগ্য বলে মনে করে। যাকে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই মায়ের মতই হারাম করে দিয়েছেন। আর পুরুষ লোকটি সেই কাফেলারই এক লোক, সেই বাহিনীরই একজন সৈনিক এবং সে শহরেরই একজন নাগরিক ছিল—কেবল তাই নয়, বরং সে ছিল একজন মুসলিম, যে সেই মহিলার স্বামীকে আল্লাহর রসূল এবং নিজের হাদী ও নেতা রূপেই মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশে নিজের জানপ্রাণ কুরবান করার জন্য বদর যুদ্ধের মত ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। এমতাবস্থায় এরূপ কথার মানসিক পটভূমির জঘন্যতা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। এর চেয়ে অধিক জঘন্য ও বিভৎস ধারণা আর কিছু হতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, মুসলিম সমাজের যেসব ব্যক্তি এ অপবাদের কথা মুখে উচ্চারণ করেছে, কিংবা অন্তত সন্দেহযোগ্য বলে মনে করেছে। তারা নিজেরা এতে করে নিজেদেরই সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করেছে। আর নিজেদের লোকদের সম্পর্কে অত্যন্ত নিকৃষ্ট নৈতিকতার ধারক বলে মনে করেছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, সেই লোকেরা নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে চারজন সাক্ষী আনলো না কেন ? এখন যেখানে তারা তাদের আনীত অভিযোগ প্রমাণে সাক্ষী পেশ করতে পারলো না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যুক। মূলত তাদের এ অভিযোগ তো আসলেই মিথ্যা ছিল। অভিযোগের সমর্থনে তারা সাক্ষ দিতে পারেনি—কেবল এ কারণেই তা মিথ্যা ছিল—তা নয়। বরং আসলেই ওদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে ওদের সাক্ষ পেশ করতে না পারাকেই অভিযোগ মিথ্যা হওয়ার ভিত্তি বলে উল্লেখ করা হয়নি। আর মুসলমানদেরও সাক্ষ চারজন পেশ করতে না পারায় ওদের অভিযোগকে মিথ্যা বলে জানার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেখানে মূলত যা ঘটেছিল সেদিকে দৃষ্টি না থাকলেই এ ধরনের ভুল ধারণা হওয়ার কারণ ঘটে। অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এজন্যে অভিযোগ তোলেনি যে, তারা বা তাদের কেউ সে ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিল, যা তারা মুখে প্রচার

করছিল। বরং হযরত আয়েশা রা. কাফেলার পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সাফওয়ান রা. তাঁকে নিজের উটের উপর সওয়ার করিয়ে কাফেলার কাছে নিয়ে এসেছিলেন—শুধু এতটুকু ঘটনার উপরই তারা মিথ্যা অভিযোগের এক পাহাড় রচনা করে নিয়েছিল।

হযরত আয়েশা রা.-এর এভাবে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া (নাউযুবিল্লাহ) কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের ফল বলে কোনো সুস্থ বিবেকবান লোকই চিন্তা করতে পারে না। প্রধান সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী চুপচাপ কাফেলার পেছনে একজন পুরুষের সাথে পড়ে থাকবে, পরে সেই ব্যক্তিই তার নিজের উটের উপর বসিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সেই সেনাবাহিনীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে—কোনো ষড়যন্ত্র কখনও এমনটি করতে পারে না। বস্তুত এহেন অবস্থাটাই তাঁদের উভয়ের নির্দোষিতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। এতদসত্ত্বেও যদি এরূপ কোনো অভিযোগ তুলতেই হয়, তবে তা এ ভিত্তির উপর তোলা যেতে পারে যে, অভিযোগকারীরা স্বচক্ষেই তা দেখেছে। অন্যথা এসব যালিমরা যেসব লক্ষণের ভিত্তিতে অভিযোগ তুলেছে তাতে করে কোনোই সন্দেহ করা যেতে পারে না।–তাফহীমুল কুরআন

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, মুসলিম সমাজের সামনে যে দু জনের বিরুদ্ধে তোহমত দেয়া হয়েছিল—একজন তো তাদেরই নবীর স্ত্রী অন্যজন তাদেরই ভাই—একজন সাহাবী ও মুজাহিদ ব্যক্তি। দুজনই তো তাদের নিজেদের লোক, তারা তো জাহেলী যুগের ও জাহেলী সমাজের এমন লোক নয় যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় বা আখিরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা নেই। কাজেই এমন লোকদের ব্যাপারে তো প্রথম চোটেই ভাল চিন্তাটাই আসা উচিত ছিল। এটা কি তাদের মনে করা উচিত ছিল না যে, মুমিনদের নিজেদের কোনো মেয়ে এমন বিপদাপন্ন হলে এরূপ কিছু কি ঘটতে পারে ? 'ঈমান' মানে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি ও বিশ্বাস যাদের আছে তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে জীবনের শুদ্ধি রক্ষা করবে। আল্লাহর কাছে প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতার বিশ্বাস মনের ভেতর জাগরূক রেখেই তো তারা দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করাই তো ঈমানদারগণের কর্তব্য। তাদের দ্বারা এমনটি সম্ভব না হলে নবী স.-এর স্ত্রী দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে কি করে ?

আবু আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী রা. ও তাঁর স্ত্রী এভাবেই চিন্তা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, একদিন আইয়ুবের বাপকে আইয়ুবের মা বললেন ঃ আচ্ছা, আইয়ুবের বাপ, তুমি

কি শুননি লোকেরা আয়েশা রা. সম্পর্কে কি বলাবলি করছে ? তিনি বললেন, হাঁ—এটা তো ডাহা মিথ্যা। আইয়ুবের মা ! এমন পরিস্থিতি যদি তোমার হতো তাহলে কি তুমি এরূপ কোনো গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি এমন কাজ করতাম না। আবু আইয়ুব বললেন, আল্লাহর কসম, আয়েশা রা. অবশ্যই তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। আরেক বর্ণনা হতে একদিন আইয়ুবের মা আইয়ুবের বাপকে বললো, তুমি যদি সাফওয়ানের স্থানে হতে, তাহলে কি রসূলুল্লাহর ইয্যতের উপর হামলা করার কথা চিন্তা করতে পারতে ? তিনি বললেন, কখনও না। তখন আইয়ুবের মা বললেন, শোন, আমিও যদি আয়েশার স্থানে হতাম তাহলে কিছুতেই আল্লাহর রসূলের খেয়ানত করতে পারতাম না। অতপর অবশ্যই এটা সত্য যে, আয়েশা রা. আমার চেয়ে উত্তম এবং অবশ্যই সাফওয়ান তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। এভাবে মুসলমানদের কেউ কেউ তাদের বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং আন্তরিকভাবে ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করেছে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কারো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি এবং কোনো আলোচনাতে অংশ নেননি।

এ হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে মাথা ঘামানোর জন্য আল কুরআনে উপস্থাপিত পদ্ধতি। অর্থাৎ কোনো সাক্ষ-প্রমাণ তালাশ করার আগে প্রথমে নিজের বিবেককে ব্যবহার করা। এ হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য এবং সমস্যাদির সমাধানে তাদের প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে বাস্তব দলিল-প্রমাণ দ্বারা কোনো কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।–ফী যিলালিল কুরআন

ইসলামী সমাজের চারিত্রিক মূলনীতি

ইসলামী সমাজের প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অধিকার হলো সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলিল-প্রমাণে তাদের ব্যাপারে সুধারণার বিপরীত কোনো কিছু সাব্যস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এ অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। মুসলিম নর-নারীর উক্ত অধিকারের দাবী হলো, যদি কোনো মুসলিম সম্পর্কে আরেক মুসলিমের কানে এমন কোনো কথা শোনা যায়, যাতে করে সেই মুসলিমের প্রতি সুধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তিনি ঐ কথাকে সওগাত মনে করে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নেবে না। আর সে কথা বলে বেড়ানো শুরু করে দেবে না। বরং তখন তা অগ্রাহ্য করবে। এবং সে বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তা বিশ্বাসই করবে

না। এ জাতীয় কার্যক্রমে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করাও জায়েয নেই। এটাকে অন্যের ঝগড়া-বিবাদ ভেবে পাশকেটে যাওয়া (এই বলে যে, এটা তো অন্যের বদনামের বিষয়, এতে আমার কি সম্পর্ক) বৈধ নয়। বরং যথাসাধ্য এ জাতীয় বিষয়ের প্রতিরোধ নিজের ভাই হিসেবে করা উচিত। কারণ প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের উপর অন্য মুসলিম ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের যথাসাধ্য হেফাযত করা একটা ফরয—অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামী সমাজের এ চারিত্রিক মূলনীতির বিষয়ে এখানে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তোমাদের কানে এমন কথা আসলো, তখন তোমরা পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করলে না কেন ? আর কেন পরিষ্কার করে ঘোষণা করলে না যে, এটা তো একটা কল্পিত অভিযোগ—একটা সুস্পষ্ট তোহ্‌মত।

ইসলামী সমাজের এ মূলনীতি সামনে রেখে আজকের সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখুন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, আজ কাল এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। আজকের চিন্তাধারা হলো প্রত্যেক ব্যক্তিই কুধারণা পাওয়ার যোগ্য। তবে কারো সাথে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র। অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করা এ যুগে একটি স্বতন্ত্র বিষয় ও একটি বিশেষ স্বার্থক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কত শিক্ষিত ব্যক্তি এমন আছে যাদের দায়িত্বটাই যেন এই যে, তারা অন্যদের কুৎসা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।–তাদাব্বুরে কুরআন

মুসলিম উম্মাহর কেউ কারো পর নয়

আল কুরআন ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ বাক্যাংশ দ্বারা ইংগিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে এক করে দিয়েছে। যেমন অন্যত্র বলেছে لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। অর্থাৎ তোমরা এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে দোষারোপ করো না— তেমনি কুরআনে বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। এখানে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে। আরেক স্থানে বলা হয়েছে, وَلَا تُخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ তোমরা নিজেদেরকে অর্থাৎ কোনো মুসলিম ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা

হয়েছে, وَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলিম ভাইদের সালাম করো, তাদের শান্তির ব্যবস্থা করো।

উপরোক্ত আয়াতাংশ সমূহের মাধ্যমে আল কুরআন মুসলিম উম্মাহর সবাইকে পরস্পর এক করে বর্ণনা করেছে। লিঙ্গ, স্থান, কাল, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিম এক। সুতরাং এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ক্ষতি করলে বা তাকে দোষারোপ করলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি করা হলো অথবা নিজেকেই দোষারোপ করা হলো।–মাআরেফুল কুরআন

❒

ষোল

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○

"যারা পবিত্র চরিত্রের ও সাদাসিদা মুমিন স্ত্রীলোকদের উপর (যিনার) অপবাদ আরোপ করে তাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে লানত দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা—তারা যা করতো সে সম্বন্ধে; সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিয়ে দেবেন আর তারা জানতে পারবে যে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।"

–সূরা আন নূর ঃ ২৩-২৫

পবিত্র চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় পূর্বে বর্ণিত সূরা আন নূরের ৪ আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় একই বিষয়ের হুকুম পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটি বিরাট পার্থক্য। আর তাহলো পূর্বোক্ত আয়াতে (৪ আয়াত) তাওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। অথচ এখানে ২৩ আয়াতে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ২৩ আয়াত সেসব লোকদের সাথে সম্পৃক্ত যারা হযরত আয়েশা রা.-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তাওবা করেনি। এমনকি কুরআনে তাঁর দোষমুক্ত থাকার কথা নাযিল হওয়ার পরও তারা তাদের দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। উল্লেখ্য, এমন কাজ কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো মুমিন কুরআনের বিরোধীতা করতে পারে না।

বিরোধীতা করলে সে আর মুমিন থাকতে পারে না। তাই এ আয়াতগুলো ঐসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা দোষ মুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও এ অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফির-মুনাফিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাওবাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ বলে দুনিয়া ও আখিরাতে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে যারা তাওবা করেনি, তাদেরকে এ আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তাওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর যারা তাওবা করেনি তাদের জন্য কঠোর আযাবের হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাওবাকারীদেরকে اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর যারা তাওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে শাস্তির যোগ্য হওয়ার ধমক দেয়া হয়েছে।–মাআরেফুল কুরআন, বায়ানুল কুরআন থেকে।

এ আয়াতে সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদেরকে غَافِلَاتٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সরলমনা সেসব সাদাসিদা ভদ্র স্ত্রীলোক যারা কোনো ছল-চাতুরী জানে না, যাদের দিল পবিত্র, যারা চরিত্রহীনতা ও পাপ কি—কিরূপে তা করা হয়, তা জানে না। তাদের মতো মহিলাদের বিরুদ্ধেও কেউ কোনো চরিত্রহীনতার অভিযোগ তুলতে পারে, তা তাদের চিন্তা-ভাবনায়ও কখনো আসে না। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম স. বলেছেন, পাক চরিত্রের স্ত্রীলোকদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা সেই সাতটি কবীরা গুনাহর মধ্যে শামিল যা অত্যন্ত মারাত্মক (موبقات) তিবরানী শরীফে হযরত হুযায়ফার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে নবী করীম স. এরশাদ করেছেন : قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة "একজন চরিত্রবান স্ত্রীলোকের উপর চরিত্রহীনতার মিথ্যা দোষারোপ করা একশ বছরের আমল বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।"

–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ মানে 'পবিত্র চরিত্রের ভদ্র মহিলাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে।' অর্থাৎ তাদের চরিত্রে মিথ্যা দোষ আরোপ করা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার মত জঘন্য মারাত্মক, দুঃখজনক ও যন্ত্রণাদায়ক। رَمْىٌ শব্দ থেকে يَرْمُوْنَ এর শাব্দিক অর্থ তীর নিক্ষেপ করা যা কারো পরে তোহমত বা অপবাদ আরোপের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।–তাদাব্বুরে কুরআন

সতী-সাধ্বী মুমিন নারীগণ সরলমনা হওয়ার কারণে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা সম্পর্কে উদাসীন ও অসতর্ক থাকে। কারণ তারা তো

এমন কিছু করেই না, যে জন্য সতর্ক থাকার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং এমন মহিলাদের চরিত্রে কালীমা লেপন করা এমন এক অপরাধ যা একদিকে যেমন পাশবিক অন্যদিকে তেমনি নোংরা মানসিকতারও পরিচায়ক। সে জন্যে এমন এমন অপরাধে লিপ্ত লোকদেরকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে আল্লাহর অভিশাপগ্রস্থ এবং তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত। এরপর আখিরাতে তাকে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তাহলো এই—

সেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে। সেই সাক্ষ হবে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। অথচ তারা যে অপবাদ রটাতো তা ছিল মিথ্যে। সেদিন আল্লাহ তাদের উপযুক্ত সঠিক বদলা দিবেন। তাদের অত্যন্ত নিখুঁত ও ন্যায়সংগত প্রতিফল দিবেন আর তাদের কৃতকর্মের নির্ভুল হিসেব নিবেন। সেদিন তাদের সকল সন্দেহ দূর হবে আর তারা জানতে পারবে যে আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য।-ফী যিলালিল কুরআন

❐

সতের

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ ـ

"হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এটা তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মুমিন নারীগণকেও বলুন তারাও যেন তাদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে। এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন নিজেদের দেহের যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের উপর মাথার ওড়নার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে, আর নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।–সূরা আন নূর ঃ ৩১

সমাজে নর-নারী পরস্পর থেকে কিভাবে পর্দা করবে ?

সূরা আন নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরী সালে। এ আলোচনা থেকে জানা যায়, সূরা আন নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহযাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে নাযিল হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়।

–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

আয়াতে يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ 'তাদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে' বলা হয়েছে। يَغُضُّوْا শব্দটির মূল শব্দ غض এর অর্থ কোনো জিনিসকে মাত্রায় কমিয়ে দেয়া,হ্রাস করা ও নীচু করা। আরবীতেও غض بصر মানে চক্ষু নীচু করা বা নীচু করে রাখা। কিন্তু এর মানে সবসময়ই কেবল নীচের দিকে দেখা নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ দৃষ্টিতে বা চোখ ভরে না দেখা এবং দেখার কাজ সম্পাদন করার জন্য চোখকে অবাধ ও লাগাম

শূন্য করে ছেড়ে না দেয়া। অবশ্য 'চোখ বাঁচিয়ে চলা' বললে আয়াতের অর্থ সম্যক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিস দেখা অবাঞ্ছনীয়, তা থেকে চোখ বাঁচিয়ে ও সরিয়ে রাখা—সে জন্যে চোখ নীচু করুক বা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিক—তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আবার مِنْ اَبْصَارِهِمْ বলে বুঝানো হয়েছে যে সকল দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলা বা ফিরিয়ে নেয়াটা উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কোনো দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেয়া ও বাঁচিয়ে চলা। অন্য কথায়, 'কোনো কিছুই চোখ ভরে দেখা যাবে না' একথা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ পরিবেশে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করাই একথার উদ্দেশ্য। এখন পূর্বাপর মিলিয়ে পড়লে জানা যায়, এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে পুরুষদের পক্ষে নারীদের দেখা, অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো কিংবা নির্লজ্জ ধরনের জিনিসের উপর চোখ ফেলা ইত্যাদি কথার উপর।

পুরুষদের পর্দা

নিজের স্ত্রী অথবা মুহাররম মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে চোখ ভরে দেখা কারো জন্য হালাল নয়। একবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে তা তো মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষিত হয়ে পুনর্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা মাফ হবে না। এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপকে নবী করীম স. চোখের যিনা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের পূর্ণ অনুভূতি শক্তি ও ইন্দ্রিয় দিয়ে যিনা করে থাকে। চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, রসের ও মনভোলানো কথাবার্তা হচ্ছে বাকশক্তির যিনা, কণ্ঠস্বর শুনে মনে স্বাদ আস্বাদন করা হচ্ছে শ্রবণশক্তির যিনা, স্পর্শ করা ও অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা হচ্ছে হাত-পায়ের যিনা। যিনার এসব প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ হয় কার্যত কাজটির পূর্ণতা বিধান করে নতুবা তা অপূর্ণ থেকে যায়।–বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ। হযরত আবু বুরাইদা রা-এর বর্ণনা এই যে ঃ নবী করীম স. হযরত আলী রা.-কে লক্ষ করে বলেছেন ঃ

يَا عَلِيُّ لاَتَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاَوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاُخْرَى ـ احمد، ترمذى، ابو داؤد، دارمى

"হে আলী! একবার দেখার পর আবার তাকাবে না। প্রথমবারের হঠাৎ দেখা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলে তা মাফ হবে না।"

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রা. বলেন, আমি নবী করীম স.-এর কাছে জানতে চাইলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো ? তিনি বললেন, অবিলম্বে চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নীচু করে দাও।–মুসলিম,

আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ-

"দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দিব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।"–তিবরানী

আবু উমামার বর্ণনায় বলা হয়েছে নবী করীম স. বলেছেন ঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا-

"যে কোনো মুসলিমের দৃষ্টি কোনো নারীর উপর পড়ে আর সে ঐ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, তাহলে আল্লাহ তার ইবাদাতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দেবেন।"–মুসনাদে আহমদ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম স.-এর চাচাতো ভাই ফজল ইবনে আব্বাস রা. যিনি তখন যুবক বয়সের ছিলেন—মাশআরে হারাম থেকে ফিরে আসার সময় নবী করীম স.-এর সাথে একই উটের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। পথে যখন স্ত্রীলোকেরা চলে যাচ্ছিল, তখন ফজল রা. তাদের প্রতি তাকাচ্ছিল। নবী করীম স. তাঁর মুখের উপর হাত রাখলেন ও তাঁকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। বিদায় হজ্জের সময়ের আরেকটি ঘটনা এই–খাসআম কবিলার এক স্ত্রীলোক পথের মধ্যে নবী করীম স.-কে থামিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করছিলেন। তখন ফজল ইবনে আব্বাস রা. তার প্রতি চোখ জমিয়ে অপলকনেত্রে তাকে দেখছিল। নবী করীম স. তার মুখ ধরে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।–বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী

উপরোল্লিখিত ঘটনারাজি থেকে কেউ যেন এমনটি না ভাবেন যে তখন বোধহয় মহিলারা খোলামুখে চলাফেরা করার অনুমতি পেয়েছিল। আর সে জন্যেই তাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার ও নিচু করার নির্দেশ এসেছিল। না হয় চেহারা ঢেকে রাখার প্রচলন থাকলে তো চোখ বাঁচানোর আর না বাঁচানোর প্রশ্ন উঠতো না। কারণ বাস্তবে চেহারা ঢেকে রাখার পর্দা প্রচলিত থাকলেও কোনো কোনো সময় এমন অবস্থা দেখা যেতে পারে যখন একজন

নারী ও একজন পুরুষ মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পর্দানশীল স্ত্রীলোকও অনেক সময় নিজের চেহারা খুলে ফেলতে বাধ্য হতে পারে। তাছাড়া মুসলিম মহিলারা পর্দা করলেও এবং মুখ ঢেকে রাখলেও অমুসলিম মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা করার সমস্যা তো থেকেই যাবে। কাজেই চোখ নীচু করার হুকুমটি প্রমাণ করে না যে, মহিলারা বুঝি মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করতো। কেননা সূরা আহযাবে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর মুসলিম সমাজে যে পর্দা প্রথা চালু করা হয়, তাতে মুখাবয়বের পর্দাও শামিল ছিল। আর খোদ নবী করীম স.-এর জীবদ্দশাতেই যে তা কার্যকর হয়েছিল তা অনেকগুলো বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয়। 'ইফ্ক'-এর ঘটনা সংক্রান্ত হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনাসমূহ তো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, জংগল হতে ফিরে এসে আমি যখন দেখলাম যে কাফেলা চলে গেছে। তখন আমি বসে পড়লাম, আর ঘুমের চাপ এতবেশী ছিল যে আমি সেখানে পড়ে ঘুমাতে লাগলাম। সকাল বেলা সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সেস্থান দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকে দেখলেন কে যেন পড়ে আছে। আর সেদিকে তিনি আসলেন।

فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَأٰنِيْ وَكَانَ قَدْرَاٰنِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ

حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ-

"তিনি আমাকে দেখেই চিনতে পেলেন। কেননা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ...." বলে উঠলেন। তাঁর এ আওয়াজ শুনেই আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। তখন আমি আমার চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে নিলাম।"–তাফহীমুল কুরআন–বুখারী, মুসলিম, আহমদ, ইবনে জরীর, সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে।

আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে, উম্মে খাল্লাদ নামী এক মহিলার পুত্র এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। মহিলাটি পুত্রের সম্পর্কে খবর নিতে নবী করীম স.-এর নিকট আসলো। তখন তার চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। কোনো কোনো সাহাবী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এমন মুহূর্তেও তোমার মুখাবয়বে নেকাব রয়েছে ! অর্থাৎ পুত্রের শহীদ হওয়ার খবর শুনে তো একজন মা এতদূর উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায় যখন তার কাপড়-চোপড় বা দেহের ব্যাপারে কোনো হুঁশ থাকার কথা নয়। অথচ তুমি তো নিশ্চিন্তে বেশ পর্দা সহকারেই এখানে এসেছ। জবাবে মহিলাটি বললেন ঃ

ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائى

"আমি আমার পুত্রকে তো হারিয়েছি, কিন্তু নিজের লজ্জা-শরম হারাইনি।"

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা রা.-এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক মহিলা পর্দার ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে নবী করীম স.-এর নিকট কোনো বিষয়ে দরখাস্ত পেশ করলে নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মহিলার হাত না পুরুষের হাত ? সে ভিতর থেকে বললো এটা মহিলার হাত। তখন নবী করীম স. বললেন, মহিলার হাত হলে তো অন্তত নখগুলো মেহেদীর রঙ্গে রঙ্গীন করা উচিত ছিল।"

পূর্বে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর চাচাত ভাই ফজল ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কিত বিদায় হজ্জ কালীন সময়ের দুটো ঘটনা নবী করীম স.-এর সময়ে চেহারার পর্দা চালু না হওয়ার কোনো দলিল হতে পারে না। কেননা ইহরামের পোশাকে মুখাবরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও এক্ষেত্রে সতর্ক মহিলারা পর পুরুষের সামনে মুখাবয়ব উন্মুক্ত করে দেয়া পসন্দ করতে পারে না। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, "বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহরাম অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিক যখন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়তো, তখন আমরা মহিলারা নিজেদের মাথার উপর থেকে চাদর টেনে মুখের উপর দিয়ে মুখাবয়ব ঢেকে ফেলতাম। আবার তারা চলে গেলে মুখ খুলে ফেলতাম।–আবু দাউদ

চক্ষু নীচু করা বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার হুকুমটার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে দেখা আবশ্যক—অন্ততপক্ষে মুস্তাহাব। মুগিরা ইবনে শো'বা রা. বর্ণনা করেছেন, "আমি একস্থানে বিবাহ প্রস্তাব পাঠালাম। নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মেয়েটিকে দেখে নিয়েছ ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهٗ احرى ان يؤدم بينكما "তুমি তাকে দেখে নাও, এতে তোমাদের উভয়ের মাঝে বনিবনা হবে বলে আশা করা যায়।–তাফহীমুল কুরআন–তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ, ইবনে মাজা, দারেমী থেকে।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিল, নবী করীম স. তাকে বললেন, اُنْظُرْ اليها فان فى اعين الانصار شيئًا "তুমি তাকে দেখে নাও, কেননা আনসার বংশের লোকদের চোখে কিছু দোষ থাকে।–তাফহীমুল কুরআন–মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ থেকে।

৮—

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ اَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়, তখন যথাসম্ভব তাকে দেখে এ নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যে, মহিলার মাঝে এমন কোনো গুণ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা তাকে বিয়ে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কারণ হতে পারে।"–আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমায়দার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এ উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখা সম্পর্কে নবী করীম স. বলেছেন, فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ "এতে কোনো দোষ নেই।" স্ত্রীলোকটির অলক্ষে ও অজ্ঞাতে তাকে দেখে নেয়ারও অনুমতি রয়েছে। ফিকাহবিদগণ এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, বিবাহ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও মহিলাদের দেখা জায়েয আছে। যেমন, অপরাধ অনুসন্ধান ব্যাপদেশে কোনো স্ত্রীলোককে দেখা জায়েয। তেমনিভাবে আদালতে সাক্ষ্যদানের সময় বিচারকের কোনো সাক্ষী মহিলাকে দেখা। কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কোনো স্ত্রী রোগীকে দেখা ইত্যাদি।–তাফহীমুল কুরআন

মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্যও চক্ষু নীচু করে দেয়া বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার একই বিধান প্রযোজ্য। ইচ্ছে করে কোনো স্ত্রীলোকের জন্য পর পুরুষের প্রতি তাকানো উচিত নয়। কোনো পর পুরুষের প্রতি তাদের চোখ পড়লে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য। অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি তাকানো তেমনি পুরুষ পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি আর নারী নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো একই পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু পুরুষদের মহিলার প্রতি তাকানো আর মহিলাদের পুরুষদের প্রতি তাকানোর বিষয়ে শরীয়তের বিধানে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এ পর্যায়ে তাফহীমুল কুরআনে উল্লিখিত তিনটি হাদীসের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. হযরত উম্মে সালমা ও হযরত মায়মুনা রা. নবী করীম স.-এর কাছে বসা ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নবী করীম স. উভয় স্ত্রীকে বললেন, اِحْتَجِبَا مِنْهُ তোমরা উভয়েই ওর থেকে পর্দা করো। তাঁরা উভয়ই তাঁকে বললেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَعْمٰى لاَيَبْصُرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا ـ

"হে আল্লাহর রসূল ! এ লোকটি কি অন্ধ নয় ? ওতো আমাদের দেখতেও পাবে না চিনতেও পারবে না।"

তখন নবী করীম স. বললেন ঃ

اَفَعُمْيَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تَبْصُرَانِهِ

"তোমরা দুজনও কি অন্ধ হয়ে গেছো ? তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখতে পাবে না ?"

হযরত উম্মে সালমা রা. স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ اَمَرَ بِالْحِجَابِ এ ঘটনা পর্দার আদেশ নাযিল হওয়ার পর ঘটেছিল।–আহমদ, তিরিমিযী, আবু দাউদ

মুয়াত্তা কিতাবে উদ্ধৃত একটি বর্ণনা হতেও উক্ত বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে একজন অন্ধ লোক আসলো। তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি এর থেকে পর্দা করছেন, এতো আপনাকে দেখতে পায় না ? জবাবে উম্মুল মুমিনীন বললেন ঃ لكني انظر اليه "কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পারি।"–তাফহীমুল কুরআন

দুই. হযরত আয়েশা রা.-এর আর একটি বর্ণনাও আমরা দেখতে পাই। হিজরী ৭ম সনে আবিসিনিয়ার এক প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। তারা মসজিদে নববীর চৌহদ্দির মধ্যে একটা বিশেষ খেলার আয়োজন করে। নবী করীম স. নিজে হযরত আয়েশা রা.-কে এ খেলা দেখিয়েছিলেন।-বুখারী, মুসলিম, আহমদ, থেকে তাফহীমুল কুরআন।

তিন. ফাতেমা কায়েসকে তার স্বামী তালাক দিলে প্রশ্ন উঠেছিল সে কোথায় ইদ্দত পালন করবে ? প্রথমে নবী করীম স. বললেন, উম্মে শরীফ আনসারিয়ার কাছে বসবাস করো। পরে বললেন, তার সেখানে তো আমার সাহাবারা খুব বেশী আশা যাওয়া করে। (কেননা তিনি একজন বড় ধনী ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। অনেক লোকই তার কাছে মেহমান হয়ে থাকতো, তিনি তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।) সুতরাং তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে থাক। সে একজন অন্ধ ব্যক্তি। তুমি সেখানে কোনোরূপ অসুবিধা ছাড়াই থাকতে পারবে।–মুসলিম, আবু দাউদ

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ একত্রিত করলে জানা যায়, নারীদের পক্ষে পুরুষদের দেখার বিষয়টিতে অতটা কড়াকড়ি নেই যতটা পুরুষদের বেলায়

রয়েছে স্ত্রীলোকদের দেখার বিষয়ে। এক মজলিসে বসে দেখা নিষিদ্ধ কিন্তু পথের মধ্যে চলাচলের সময় কিংবা দূর থেকে কোনো বৈধ খেলাধূলা অবলোকন কালে পুরুষদের উপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। কোনো প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়ীতে বসবাস করতে গিয়ে দেখায়ও কোনো দোষ নেই। ইমাম গাযালী ও ইবনে হাজার আসকালানীর বর্ণনা থেকেও প্রায় এ ধরনের কথাই পাওয়া যায়। ইমাম শওকানী 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে ইবনে হাজারের একথা উদ্ধৃত করেছেন। এটা জায়েয হওয়ার সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকদের বাইরে যাতায়াতের ব্যাপারটি সবসময় জায়েয রূপেই সমর্থিত হয়েছে। মসজিদে, হাট-বাজারে ও সফর ব্যাপদেশে মহিলারা মুখের উপর নেকাব রেখেই যাতায়াত করে। উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষেরা যেন তাকে দেখতে না পারে। কিন্তু পুরুষদের তো কখনো চেহারায় নেকাব দিয়ে বাইরে যেতে বলা হয়নি যাতে করে মহিলারা তাদের দেখতে না পারে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, নারী-পুরুষের পর্দার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান একরূপ নয়—বরং ভিন্ন ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও মহিলারা আগ্রহ সহকারে পরপুরুষকে দেখবে আর তাদের যৌবন সৌন্দর্য সুধায় চক্ষু পিপাসা মিটাবে—এটা কখনও জায়েয হতে পারে না।–তাফহীমুল কুরআন

সূরা আন নূরের ৩১ আয়াত যা নারী-পুরুষের পর্দা করার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে তাতে নারী-পুরুষ উভয়কেই غض بصر অর্থাৎ পরস্পর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়ার পর তেমনি উভয়কেই পৃথকভাবে حفاظت فروج বা লজ্জাস্থানের হেফাযত করার জন্যেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গের হেফাযত করবে। অর্থাৎ অবৈধ যৌন লালসা চর্চা থেকে বিরত থাকবে। নিজেদের লজ্জাস্থান অপরের সামনে খুলতে কখনো প্রস্তুত হবে না। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শরীয়তের বিধান অভিন্ন। যদিও মহিলাদের 'সতর' বা লজ্জাস্থানের সীমানা পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন পরিধির। আবার মহিলাদের লজ্জাস্থান পুরুষদের ব্যাপারে এক রকম আর তাদের সমজাতীয় লিংগ মহিলাদের জন্য আরেক রকম। পুরুষদের জন্য মহিলাদের সতর হাতের কব্জি ও মুখাবয়ব ছাড়া দেহের সমগ্র অংগ। সেসব অংগ স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে এমনকি নিজের পিতা ও ভাইয়ের সামনেও খোলা যাবে না। স্ত্রীলোকদের জন্য এমন পাতলা ও আঁটসাট পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, যাতে দেহের অংগ-সৌষ্ঠব ও যৌবন-শ্রী বাইরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তে পারে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. রসূলে করীম স.-এর

সামনে আসলেন। তিনি ছিলেন খুব পাতলা কাপড় পরিহিতা। নবী করীম স. তখন মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর বললেন ঃ

يَا اَسْمَاءَ اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْحَيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا اَوْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ

"হে আসমা! জেনে রেখ, মেয়ে যখন বালেগা হয় তখন তার হাত-কব্জি ও মুখাবয়ব ছাড়া দেহের অন্য কোনো অংগ প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।"

অবশ্য নিজের পিতা ও ভাইয়ের দেহের এ পরিমাণ প্রকাশ করা যায় যে পরিমাণ কাজকর্ম করার জন্য আবশ্যক হয়। যেমন, আটা তৈরির জন্য আস্তিন গুটানো।

মহিলার সামনে মহিলার সতর হলো ঠিক একজন পুরুষের সামনে আরেকজন পুরুষের সতরের মত।

অর্থাৎ নাভী ও হাটুর মধ্যবর্তী অংশ। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, মহিলারা একে অপরের সামনে অর্ধোলংগ হয়ে থাকবে। বরং একথার তাৎপর্য হলো হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী অংশ ঢেকে রাখা ফরয। অন্যান্য অংশ অন্য মহিলার সামনে ঢেকে রাখা ফরয নয়।-তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে নারী-পুরুষের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও যৌনাঙ্গের হেফাযত সংক্রান্ত বিধান আলোচনার পর وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশমান।" বলে মহিলাদের বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে তাদের পুরুষদের চেয়ে অতিরিক্ত যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহলো মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। উক্ত বাক্যাংশে বলা হয়েছে তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করে না বেড়ায়। তবে যা আপনা হতে এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা দূষণীয় নয়। এখানে তবে আপনা হতে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে—যেমন চাদরটা বাতাসে উড়ে পড়লো আর তাতে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা কিছুটা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। এটা তো স্বেচ্ছায় সৌন্দর্য প্রকাশের আওতায় নয়। তবে যা আপনিতে প্রকাশিত অবস্থায় থাকে যেমন এমন চাদর যা গায়ে জড়ানো হয়েছে। কেননা এ চাদর তো আর ঢেকে রাখা বা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অধিকন্তু মহিলার দেহাবরণ হওয়ার কারণে তাতে কিছুটা আকর্ষণ থেকেই যায়। সেজন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হবে না। এ আয়াতের এমন

অর্থই বুঝিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নখঈ, প্রমুখ মনীষী।

নবী করীম স.-এর যামানায় পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সমাজের মহিলারা মুখ খোলা রেখে চলতো না। মুখাবয়ব আবৃত করা ও পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'ইহরাম' ছাড়া অন্য সব অবস্থাতেই মুখাবরণকে মহিলাদের পোশাকের একটি অপরিহার্য অংশ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এ পর্যায়ে কেউ কেউ বলেন যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের মধ্যে শামিল নয়। অথচ সতর ও পর্দার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। 'সতর' হলো যা মুহাররম পুরুষদের সামনেও অনাবৃত ও উন্মুক্ত করা জায়েয নয়। আর 'পর্দা' ও তো 'সতর' থেকেও অধিক এবং ব্যাপক যাকে নারী ও গায়ের মুহাররম পুরুষের মধ্যে অন্তরায় করে দেয়া হয়েছে। আর এখানে তো আলোচনাটা হচ্ছে 'পর্দা' সম্পর্কে সতর সম্পর্কে নয়।–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতের শেষাংশে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজেদের বুকের উপর মাথার ওড়নার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে। জাহেলিয়াতের যামানায় নারীরা মাথার উপর এক প্রকার চাদর দিয়ে পেছনে খোপা বেঁধে রাখতো। সামনের দিকের বোতাম থাকতো খোলা। এতে করে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। বুকের উপর জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটি বা তিনটি চুলের মুঠি বা বেণী ঝুলিয়ে রাখতো। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলিম নারীদের মধ্যে দোপাট্টা ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয়। আধুনিকা যুবতীদের মতো তা ভাঁজ করে শুধু গলদেশে সাপের মতো বেড়ী দিয়ে ফেলে রাখাই দোপাট্টা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল তা দিয়ে মাথা, বুক ও কোমর—সব অংগ ভালভাবে ঢেকে রাখা। ঈমানদার মহিলারা কুরআনের এ নির্দেশ শুনেই অবিলম্বে সে মোতাবেক আমল করতে শুরু করেন। এরি প্রশংসা করে হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, যখন সূরাটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম স. থেকে তা শুনে লোকেরা নিজেদের ঘরে ফিরে এসে নিজেদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের এ আয়াত শুনায়। আনসার বংশের কোনো স্ত্রীলোকই এমন ছিল না যে, আয়াতটি শুনে নিজের জায়গায় বসে রয়েছিল। বরং প্রত্যেকে উঠে কেউ নিজ কোমর থেকে কাপড় খুলে, কেউ গায়ের চাদর উঠিয়ে দোপাট্টা বানিয়ে সর্বাংগ জড়িয়ে রাখলো। পরদিন ফযরের জামায়াতে যত মহিলারা মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো, তারা সবাই দোপাট্টা পরেছিল। এ পর্যায়ে আরেকটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা রা. ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, মহিলারা পাতলা কাপড়

পরিত্যাগ করে মোটা কাপড় বাছাই করে দোপাট্টা বানিয়ে নিয়েছিল।
–ইবনে কাসীর, আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস

দোপাট্টা পাতলা কাপড়ে হওয়া উচিত নয়। তাই আনসার বংশের মহিলারা এ হুকুম শুনার সাথে সাথে বুঝেছিলো যে কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে দোপাট্টা তৈরি করলে এ হুকুমের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। নবী করীম স. কথাটি বুঝে নেয়ার বিষয়টি লোকদের উপর ছেড়ে দেননি। বরং নিজেই তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, হযরত দাহইয়ায়ে কলবী রা. বলেন, নবী করীম স.-এর কাছে মিসরের তৈরি পাতলা মলমলের কাপড় আসলো, তিনি তা থেকে এক টুকরা আমাকে দিয়ে বললেন, এটির একাংশ দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরি করো, আরেক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে বলে দিবে যে, এটির নীচে যেন আরেক খণ্ড কাপড় লাগিয়ে দেয়, যাতে করে ভিতর থেকে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শিত না হয় বা তা বিচ্ছুরিত হয়ে না পড়ে।–আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস

পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত কতিপয় মুহাররম ব্যক্তি ছাড়া একজন স্ত্রীলোক নিজের পূর্ণ অলংকার ও সাজ-সজ্জা সহকারে আযাদী প্রদর্শীর মাধ্যমে অন্য কোনো লোকের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে না। এদের বাইরে যারা থাকবে তারা আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় তাদের সামনে কোনো মহিলা স্বীয় সাজ-সজ্জা সহকারে আসতে পারে না।–তাফহীমুল কুরআন

❒

আঠার

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"মুসলিম নারীগণ তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে পারবে কেবল তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের মেলা-মেশার মহিলাগণ, নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং এমন বালকগণ, যারা নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন এমনভাবে পদচারনা না করে যাতে তাদের গোপন করা সাজ-সজ্জা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, আর তোমরা মুমিনগণ, সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো যেন সফলকাম হতে পার।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা না করা ও দেখা দেয়া জায়েয

আলোচ্য আয়াতে মহিলাদের যাদের সাথে দেখা দেয়া পর্দা না করা যাবে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বারজন এমন পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সাথে পর্দা করা প্রয়োজনীয় নয়—যাদের সামনে মহিলারা সাজগোজ করে দেখা দিতে পারে। আয়াতে বর্ণিত ৮ প্রকার মুহাররম পুরুষ এবং ৪ প্রকার অন্যান্য পুরুষের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পর্দার ব্যতিক্রমী এ বারজন থেকে মহিলাদের পর্দা না করার কারণ দুটো। এক. পর্দার ব্যতিক্রমী এ বারজন পুরুষ এমন যে, এদের থেকে মহিলাদের কোনো অনর্থের বা সমস্যা দেখা দেয়ার আশংকা নেই। তারা এমন স্বভাবের যে আল্লাহ তাআলা তাদের স্বভাবকে সৃষ্টিগতভাবে এমন করে তৈরি করেছেন

যে, এরা নারীর সতীত্ব রক্ষা করে। স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনর্থের আশংকা নেই। দুই. সদাসর্বদা একই জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পর সরল-সহজ সম্পর্ক বজায় রাখে। উল্লেখ্য, স্বামী ছাড়া অন্যান্য যেসব ব্যতিক্রমী পুরুষ রয়েছে—এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রমী—গোপন অংগ অনাবৃত করা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যেসব অংগ নামাযে খোলা রাখা জায়েয নয় তা দেখা মুহাররমদের জন্যও জায়েয নয়।

—মাআরেফুল কুরআন

ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যাদের সাথে বিবাহ জায়েয নেই তাদেরকে মুহাররম বলা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সেই অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বার প্রকারের ব্যতিক্রমী পুরুষের বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

প্রথম, স্বামী ; যার সাথে স্ত্রীর কোনো অংগের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অংগ না দেখাই উত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, مَا رَأَى مِنِّى وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. আমার বিশেষ অংগ দেখেননি, আর আমিও তাঁর দেখিনি। **দ্বিতীয়** পিতা ; দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। **তৃতীয়, শ্বশুর** ; তাতেও স্বামীর দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত আছে। **চতুর্থ**, নিজ গর্ভজাত পুত্র। **পঞ্চম**, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। **ষষ্ঠ**, ভাই, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফুর পুত্র—যাদের সাধারণ ভাই বলা হয়ে থাকে, তারা এ ব্যতিক্রমীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ তাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নেই। **সপ্তম**, ভাতিজা (ভাইয়ের পুত্র) এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। **অষ্টম**, বোনের ছেলে। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন বুঝানো হয়েছে। এ আট প্রকার পুরুষ হলো মুহাররাম। **নবম**, اَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য মুসলিম নারী। তাদের সামনেও যেসব অংগ খোলা যায় যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বেও বলা হয়েছে, এ ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে গোপন অংগ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অংগ মুহাররাম পুরুষের সামনে খুলতে পারে না সেসব অংগ কোনো মুসলিম মহিলার সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা। 'মুসলিম নারী' বলার কারণে কাফির মুশরিক নারীদের থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের মধ্যে গণ্য। **দশম**, প্রকার ব্যতিক্রমী পুরুষ হলো নারীদের মালিকানাধীন লোক। এতে দাস-দাসী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ

হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মুহাররমের মত পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ঃ لا يغرنكم اية النور فانه فى الاماء دون الذكور তোমরা সূরা আন নূরের আয়াতে এ অর্থ গ্রহণ করো না যে ملكت ايمانكم শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এ আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। **একাদশ**, পর্দার ব্যতিক্রমী পুরুষ হলো যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ লোক। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে যাদের নারীর প্রতি কোনো আগ্রহ, উত্তেজনা ও ঔৎসুক্যই নেই।–ইবনে কাসীর আয়াতে এমনসব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোনো ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করতো। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত কামভাবমুক্ত পুরুষ মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। এ কারণেই ইবনে হজর মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন, পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন লিংগ কর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয় তবুও সে غير اولى الاربة শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার থেকে পর্দা করা ওয়াজিব। **দ্বাদশ প্রকার**, এমন অল্প বয়স্ক বালক যে নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। ইমাম জাস্সাস বলেন, এখানে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না।"–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ "মুমিন নারীগণ যেন এমনভাবে পদচারণা না করে যাতে করে তাদের গোপন রাখা সাজসজ্জা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।" এ পর্যায়ে নবী করীম স. এ হুকুমকে কেবলমাত্র অলংকারাদির সুর-ঝংকার পর্যন্ত সীমিত রাখেননি। বরং তিনি এ থেকে এ মূলনীতি ঠিক করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়াও যেসব জিনিস যৌন অনুভূতিকে উত্তেজিত করে সেসবও ঐ উদ্দেশ্যের খেলাফ, যে জন্যে আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। এজন্যেই তো তিনি নারীদের নির্দেশ দিলেন, "সুগন্ধি লাগিয়ে বের হবে না।"

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٍ ـ

"আল্লাহর বান্দী নারীদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন সুগন্ধি মেখে বাইরে না আসে।"–আবু দাউদ, আহমদ, তাফহীমুল কুরআন

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, এক মহিলা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, হযরত আবু হুরাইরা রা. তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে মহিলাটি সুগন্ধি ব্যবহার করেছে। তিনি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাশক্তিমান আল্লাহর বান্দী ! তুমি মসজিদ থেকে আসছো ? সে বললো, জি-হাঁ। তিনি বললেন, আমি আমার প্রিয়নবী আবুল কাসেম স.-কে বলতে শুনেছি—যে মহিলা মসজিদে সুগন্ধি মেখে আসবে, তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসল—ফরয গোসল সেরে না নেয়।-আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, নাসাঈ–তাফহীমুল কুরআন

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

.... قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا ـ

"যে মহিলা আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে পথে-ঘাটে চলাফেরা করে এ উদ্দেশ্যে যে এতে লোকেরা মেতে উঠবে—সে তো এমন এমন .... খুব শক্ত কথাই বললেন তিনি।–তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ

প্রয়োজন ছাড়াও মহিলারা নিজেদের কণ্ঠস্বর পর-পুরুষদের শোনাবে —তা নবী করীম স. আদৌ পসন্দ করতেন না। প্রয়োজন বশতঃ কথা বলার অনুমতি তো স্বয়ং কুরআন মজীদই দিয়েছে। নবী করীম স.-এর স্ত্রীগণ তো লোকদেরকে দীনি বা নৈতিক মাসয়ালা-মাসায়েল বলে দিতেন। যেখানে এমন কোনো দীনি প্রয়োজন বা নৈতিক ফায়দা নেই, সেখানে পর-পুরুষদেরকে মহিলাদের আওয়ায শুনানো আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্যে নামাযে ইমাম ভুল করলে কেবল পুরুষ নামাযীদের হুকুম করা হয়েছে, তারা 'আল্লাহু আকবার' বা 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। অথচ মহিলাদের বলা হয়েছে, তারা হাতে হাত মেরে শব্দ করে ইমামকে সাবধান করবে। বলা হয়েছে, التسبيح للرجال والتصفيق।

النساء -বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, নাসাঈ, তাফহীমুল কুরআন।

নারীর অলংকারের আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনানো জায়েয নেই। আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে নারীদের সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই—গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ হোক, তাও জায়েয নয়। অলংকারাদির ভিতর এমন জিনিস রাখা যদ্দরুণ অলংকার ঝংকৃত হতে থাকে কিংবা অলংকারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা, কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলংকারের শব্দ হয় এবং তা বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে—এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতের আলোকে নাজায়েয। এজন্যেই অনেক ফিকহবিদ বলেন, যখন অলংকারের আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনানো এ আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়ায আরও কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তাঁরা নারীর আওয়াযকেও গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াযেল' গ্রন্থে বলা হয়েছে যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআন শিক্ষা নারীদের থেকেই গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের থেকে গ্রহণ করা জায়েয।

সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নামাযে যদি কেউ মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে তবে পুরুষ মুসল্লির উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করে দেয়া। কিন্তু নারী আওয়ায করতে পারবে না ; বরং সে এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।-মাআরেফুল কুরআন

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, নারীরাও মসজিদে নামাযের জামায়াতে শরীক হতো।

নারীর আওয়ায গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং বেগানা পুরুষকে আওয়ায শোনানো জায়েয কিনা—এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ র.-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াযকে গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াযেল-এর বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীগণের মতে মহিলার আযান মাকরূহ। তবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও পর্দার আড়ালে থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যেখানে মহিলার

আওয়াযের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেখানে তা নিষিদ্ধ ; আর যেখানে আশংকা নেই সেখানে তা জায়েয।-(জাস্সাস) কিন্তু অপ্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যে সাবধানতা নিহিত। নারী বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলে সে বাইরে যাবে। তবে পর্দা সহকারে। এবং সুগন্ধি লাগিয়ে নয়। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজ-সজ্জারও অন্তর্ভুক্ত। বেগানা পুরুষের কাছে ঐ সুগন্ধি পৌঁছা 'নাজায়েয'। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও জায়েয নয়। ইমাম জাস্সাস বলেন, কুরআনুল করীম নারীর আওয়াযকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙীন ও কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও কঠোররূপে নিষিদ্ধ। এতে আরো বুঝা গেল যে, নারীর চেহারা যদিও গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র।-[জাস্সাস থেকে মাআরেফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষে বলা হয়েছে ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

"তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, হে মুমিনগণ! যেন তোমরা কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারো।"

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার ও লজ্জাস্থান হেফাযতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর মহিলাদেরও তেমনি হুকুম দেয়া হয়েছে অতপর নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের থেকে পর্দা করার জন্য আলাদা আলাদা আদেশ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলো কাম-প্রবৃত্তি ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উপরোল্লিখিত বিধানসমূহে যদি কোনো সময় কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে সে জন্যে তাওবা করা খুবই জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করবে।

এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত হুকুম আহকাম নাযিল হওয়ার পর নবী করীম স. কুরআনের ভাবধারা অনুসারে ইসলামী সমাজে যেসব সংশোধনী কার্যকর করেছিলেন, তার অতি সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় নিম্নরূপ ঃ

এক. নবী করীম স. কোনো মুহরিম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য লোকদের সাথে (এমনকি আত্মীয় হলেও) কোনো মহিলার একাকীত্বে দেখা-সাক্ষাত করা বা একত্রে বসা ও চলাফেরা করা নিষেধ করে দিয়েছেন। যেমন হযরত যাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

لاَ تَلْجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"স্বামী অনুপস্থিত—এমন স্ত্রীলোকদের কাছে তোমরা যাবে না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত ধারায় (শিরা-উপশিরায়) প্রবাহিত হয়।"-তিরমিযী

তাঁর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلاَ يَخْلُوْا بِامْرَاَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مُحْرِمٍ مِنْهَا - فَاِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ -

"যে লোক আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে কখনো একাকিত্বে কোনো মহিলার সাথে বসবে না, যতক্ষণ সে মহিলার সাথে তার কোনো মুহরিম পুরুষ উপস্থিত না থাকবে। কেননা তা করলে সেখানে তৃতীয় লোক থাকে শয়তান।"-আহমদ

ইমাম আহমদ আমের ইবনে রবীআ প্রায় এরূপ অর্থেরই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে নবী করীম স.-এর নিজের সতর্কতার অবস্থা ছিল এই ঃ একবার রাত্রিকালে তিনি হযরত সফিয়া রা.-কে সাথে করে তাঁর ঘরের দিকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে দুজন আনসারী তাঁদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের থামিয়ে বললেন, "আমার সাথে আমার স্ত্রী সফিয়া, অন্য কেউ নয়। তাঁরা বললেন, হে রসূল! আল্লাহ পাক তো পবিত্র। আপনার সম্পর্কে কি আমাদের কোনো খারাপ ধারণা হতে পারে ?" নবী করীম স. বললেন, "শয়তান ব্যক্তির দেহে রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। সে তোমাদের মনে আমার সম্পর্কে যেন কোনো খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে সে আশংকায়ই আমি তোমাদের কাছে একথা বলা দরকার মনে করেছি।"-আবু দাউদ-কিতাবুস সওম থেকে তাফহীমুল কুরআন

দুই. বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرِمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِىْ مُحْرِمٍ

কোনো পুরুষ কোনো পরনারীর সাথে নিভৃতে মিলিত হবে না, যতক্ষণ না তার সাথে কোনো 'মুহরিম পুরুষ উপস্থিত থাকে। আর কোনো মহিলা কোনো মুহরিম পুরুষ সংগী ছাড়া একাকিনী কোনো দূরবর্তী স্থানে সফর করবে না। এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে। আর আমার নাম তো অমুক অভিযানে গমনকারীদের তালিকায় লিস্ট ভুক্ত হয়ে আছে। এখন কি করা যাবে ? নবী করীম স. বললেন ঃ

فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ

"তাহলে তুমি চলে যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।"

নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস ইবনে উমর রা., আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। এসব হাদীসের বক্তব্যে শুধু সফরের মেয়াদ কিংবা দূরত্বের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সব কটি হাদীসই একত্রে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো মহিলার পক্ষে কোনো মুহরিম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর করা জায়েয নয়। এ জাতীয় হাদীস-সমূহের শিক্ষা হলো মেয়াদ কিংবা দূরত্ব নির্বিশেষে প্রচলিত অর্থের যে কোনো সফরে কোনো মহিলা মুহরিম পুরুষ ছাড়া সফর করতে পারবে না।–তাফহীমুল কুরআন

নারীদের জুমআ ও জামায়াত

নবী করীম স. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করার কার্যত চেষ্টাও করেছিলেন, মুখে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। ইসলামে জুমআ ও জামায়াতের যে গুরুত্ব, তা অভিজ্ঞ কারো অজানা নয়। জুমআর নামায তো আল্লাহ নিজে ফরয করেছেন। আর জামায়াতের সাথে নামাযের গুরুত্ব এভাবে উপলব্ধি করা যায়, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে মসজিদে অনুপস্থিত থেকে নিজের ঘরে বসে নামায আদায় করলো, নবী করীম স.-এর ঘোষণা মতে তার নামাযই কবুল হয় না।-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী, হাকেম ইবনে আব্বাস থেকে–তাফহীমুল কুরআন। কিন্তু নবী করীম স. মহিলাদের জন্য জুমআর নামায ফরয করেননি।-আবু দাউদ, উম্মে আতিয়া থেকে, দারে কুতনী ও বায়হাকী–জাবের রা. থেকে, আবু

দাউদ ও হাকেম–তারেক ইবনে শিহাব থেকে।) আর তিনি মহিলা সমাজ কে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায়ে বাধ্য করেননি ; বরং তার অনুমতি দিয়েছেন এ ভাষায় যে, তারা যদি আসতেই চায়, তাহলে তাদের নিষেধ করবে না। তার সাথে একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামায অপেক্ষা উত্তম। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বলেছেন لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর ঘরে (মসজিদে) আসতে নিষেধ করো না।- আবু দাউদ। এরি অনুরূপ ইবনে উমর রা.-এর আরেকটি বর্ণনা হলো ঃ اِئْذَنُوا النِّسَاءَ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ। মহিলাদের রাত্রিবেলায় মসজিদে আসতে দাও।–বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ।

আরেকটি বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

لَاتَمْنَعُوا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ-

"তোমাদের মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করো না, যদিও তাদের ঘরই তাদের জন্য অধিক উত্তম।"–আহমদ, আবু দাউদ

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন, আমি নিবেদন করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পেছনে নামায আদায় করতে আমার বড় ইচ্ছে করে। তিনি বললেন, তোমাদের নিজেদের কামরায় নামায আদায় করা দহলিজে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। তোমাদের নিজেদের ঘরে নামায আদায় করা মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা জামে মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম।

প্রায় এ রকম কথাই বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে। হযরত উম্মে সালমা রা.-এর বর্ণনায় নবী করীম স.-এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে তাদের ঘরের নিভৃততম কক্ষ (আহমদ ও তিবরানী) কিন্তু হযরত আয়েশা রা. বনী উমাইয়া যুগের পরিবেশ দেখে বলেছিলেন, "নবী করীম স. যদি মহিলাদের বর্তমান সময়ের চাল-চলন নিজ চক্ষে দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি তাদের মসজিদে আসা তেমনিভাবে বন্ধ করে দিতেন যেমন বনী ইসরাঈলীদের মহিলাদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।- বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ। মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য নবী করীম স. আলাদা প্রবেশ পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর রা.

তাঁর খেলাফত আমলে পুরুষদেরকে সে পথে যাতায়াত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

ابو داؤد باب اعتزل النساء فى المساجد، باب ما جاء فى خروج النساء الى المساجد

জামায়াতে মহিলাদের কাতার রাখা হতো পুরুষদের পেছনে। আর নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে নবী করীম স. কিছুক্ষণ দেরী করতেন, যেন পুরুষদের উঠার আগেই মহিলারা বের হয়ে চলে যেতে পারে। আহমদ, বুখারী, উম্মে সালমা থেকে–তাফহীমুল কুরআন।

নারীদের সাজসজ্জা করার জন্য নবী করীম স. অনুমতি দিয়েছেন, বরং সে জন্যে তিনি তাদের উপদেশও দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমালংঘন করতে তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তৎকালে যে ধরনের সাজ-সজ্জা করা নারীদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল, তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলোকে তিনি লানত যোগ্য এবং অভিসম্পাতের কারণরূপে নির্ধারিত করেছেন ঃ ১. নারীদের পরচুলা লাগিয়ে অধিক লম্বা বা ঘন বানাতে চেষ্টা করা, ২. দেহের বিভিন্ন অংগে নকশা বা ছবি অংকন করা, ৩. কৃত্রিমভাবে তিল রচনা করা, ৪. চুল উপড়িয়ে ভ্রূ-কে বিশেষ ধরনের বানানো, ৫. লোম খুঁচে খুঁচে মুখ পরিষ্কার করা, ৬. দাঁত ঘষে ঘষে চিকণ ও শাণিত করানো, ৭. দাঁতসমূহের মধ্যে কৃত্রিম ফাঁক সৃষ্টি করা, ৮. জাফরান বা পাউডারের কৃত্রিম সংযোগে চেহারার কৃত্রিম রঙ বানানো। সীহাহ সিত্তাহ মুসনাদে আহমদ-এ হযরত আয়েশা রা. হযরত আসমা বিনতে আবি বকর রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং আমীর মুআবিয়া রা. থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ ও রসূলের এসব সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে নেয়ার পর একজন ঈমানদারের জন্য দুটো পথ খোলা রয়েছে ঃ (ক) সে এসব মেনে নিয়ে নিজের ঘর ও পরিবেশকে এসব ফেতনা ও বিপর্যয়মূলক আপদ থেকে পবিত্র করে নেবে অথবা (খ) সে নিজের ঈমানী দুর্বলতার কারণে এসব নির্দেশের বা কোনো কোনোটির বিরোধীতা করবে, তবে এটাকে গুনাহ মনে করেই করবে। এ সবের অপব্যাখ্যা করে গুনাহকে সওয়াবের কাজ বানাবে না। বস্তুত পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার হুবহু অনুসরণ করেও মুসলিম নাম ধারণ করার মত আত্ম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি হতে পারে না। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর হেফাযত করুন।–তাফহীমুল কুরআন অনুসরণে

উনিশ

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط -

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও। তাছাড়া তোমাদের দাস-দাসীদের যারা চরিত্রবান তাদেরও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ নেই, তারা যেন নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করে। যতক্ষণ না আল্লাহর নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩২-৩৩

বিবাহযোগ্য নর-নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া অভিভাবক ও সমাজপতিদের কর্তব্য। অসমর্থরা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে

আলোচ্য আয়াতে اَيَامٰى (আয়ামা) শব্দটি اَيِّم। শব্দের বহুবচন। এর অর্থ যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই। আয়াতের তরজমায় 'জুড়িহীন' শব্দ দিয়ে একথাটি বুঝানো হয়েছে। শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে নারী বা পুরুষের এখনো বিয়ে হয়নি, অথবা বিয়ে হয়েছে ; কিন্তু নারীটির স্বামী বা পুরুষটির স্ত্রী মারা গেছে ; অথবা তালাক হয়ে গেছে। এসবের যে কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীবিহীন নর-নারীকে বিয়ে করানোর নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তেমনি ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। একদিকে মানুষের স্বভাবগত কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, আর অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ী ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই একদিকে মানুষকে অবৈধ পন্থায় নিজ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে স্বভাবগত চাহিদা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ রেখে এর বৈধ বিশুদ্ধ পথও বলে দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর-নারীর মেলামেশার কোনো পন্থা প্রবর্তন করাটা যুক্তি ও শরীয়তের দাবী। কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় এ পন্থার নাম বিবাহ। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নর-নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে এদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভংগী থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনূন তরিকা ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ, তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে—এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য ইমামের মতে এ বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নাত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া 'কুফু' সম্মত তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নাতের খেলাপ হওয়ার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য ইমামের মতে অভিভাবকদের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহও বাতিল বলে গণ্য হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত সে ব্যাপারে নিরব। বিশেষত এ কারণেই যে أَيَامَى শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ—কেউ এটাকে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ার কারণে উভয়কেই তিরস্কার করা হবে।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে অভিভাবক ও মুসলিম সমাজকে আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়ে সম্পাদন করে দেয়। অধিকাংশ

ইমাম ও তাফসীরকারের মতে এ আদেশ বাধ্যতামূলক নয়, বরং উপদেশ-মূলক। তাদের প্রমাণ হলো রসূলের যুগে অনেক লোক স্বামীহীন স্ত্রীহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে। তাদের তো বিয়ে দেয়া হয়নি। এ আয়াতের আদেশ বাধ্যতামূলক হলে তাদেরকে অবশ্যই বিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু তাফসীরে "ফী যিলালিল কুরআন"-এর লেখক সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর মতে এ আদেশ অবশ্যই বাধ্যতামূলক। তবে তা এ অর্থে নয় যে, রাষ্ট্র ও সরকার স্বামী-স্ত্রীহীন নর-নারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। বরং তার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সতীত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ রাখা ও সংরক্ষণ করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজিব। কেননা বিয়ে হচ্ছে সতীত্বকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ এবং সমাজকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার পন্থা ও উপায়। সমাজকে ব্যভিচার থেকে পবিত্র রাখা যখন ওয়াজিব, তখন তার পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাও ওয়াজিব।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধানও দিয়ে থাকে। তাই ইসলাম সকল সুস্থ ও সবল মানুষকে নিজের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ ও জীবিকা উপার্জনের সমর্থ বানায়। মানুষ যেন অপরের মুখাপেক্ষী না থাকে সে ব্যবস্থা করে থাকে। সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করাকে ইসলাম রাষ্ট্রের কর্তব্যরূপে ধার্য করে দেয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামী সমাজে যদি কখনো এমন কিছু অবিবাহিত নর-নারী বিদ্যমান থাকে, যাদের নিজস্ব সহায় সম্পদ বিয়ের খরচের জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে তাদের অভিভাবক যতক্ষণ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, ততক্ষণ এটা তাদেরই দায়িত্ব থাকবে।

নারী হোক বা পুরুষ হোক যারা বিয়ের যোগ্য ও বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদের বিয়ে শুধু অর্থাভাবে আটকে থাকবে, এটা অন্যায় ও অবৈধ। মনে রাখতে হবে, জীবিকা আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহই তাদের অভাব দূর করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যদি তারা নিজেদের সতীত্ব ও শ্লীলতা রক্ষার পবিত্র পথ অবলম্বন করে। তারা যদি অভাবী হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী, যে পরাধীন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক এবং যে ব্যক্তি বিয়ে করে নিজের সতীত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ করতে চায়।–তিরমিযী ও নাসাঈ সূত্রে ফী যিলালিল কুরআন।

সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বামীহীন নারী ও স্ত্রীহীন পুরুষকে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা যাতে নিজেদের সতীত্ব ও শ্লীলতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে, সে জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে, যারা বিয়ে করার সামর্থবান নয় তাদের উচিত নিজ নিজ শ্লীলতা রক্ষা করা—যতক্ষণ না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করেন ...... বস্তুত আল্লাহ্ তাআলা সৎজীবন যাপনে ইচ্ছুকদের পথ সংকীর্ণ করেন না। কেননা তিনি তাদের ইচ্ছা ও সততা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এভাবে ইসলাম সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান দেয়। বিয়ের যোগ্য কোনো ব্যক্তি কেবল আর্থিক অক্ষমতার কারণে বিয়ে করতে না পারলে সে তাকে আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা যোগায়। বিয়ে করার পথে সম্ভবত অর্থাভাবই সবচেয়ে দুর্লংঘ বাধা।–ফী যিলালিল কুরআন

এখানে ৩২ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ۔

"তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।" এর অর্থ এ নয় যে, যে ব্যক্তিরই বিবাহ সম্পন্ন হবে তাকেই আল্লাহ্ খুব মাল-দৌলত দিয়ে দেবেন। বরং এর মানে বিয়ে করার ব্যাপারে লোকেরা যেন বড় হিসাবী হয়ে না দাঁড়ায়। রিযকের সংকীর্ণতা এসে যাওয়ার আশংকা যেন কাউকে কাবু করে না বসে। বস্তুত এখানে কন্যা পক্ষকে এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, কোনো ভাল চরিত্রের ছেলের পক্ষ থেকে যদি তাদের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠায়, তবে কেবল তার দরিদ্র অবস্থার কথা চিন্তা করে যেন তা প্রত্যাখ্যান করে না বসে। পক্ষান্তরে ছেলের পক্ষের প্রতি হেদায়াত এই যে, ছেলে এখনো বেশী কামাই রোজগার করতে পারছে না বলে তাকে যেন অবিবাহিত না রাখা হয়। আর সাধারণভাবে সকল যুবকের প্রতি হেদায়াত ও শিক্ষা এই যে, অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় বিয়ের ব্যাপারটিকে মুলতবী করে রাখা তাদের উচিত হবে না। অল্প আয় হলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে বিয়ে করা উচিত। অনেক সময় শুধু বিয়ের ফলেই মানুষের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে যায়। স্ত্রীর সাহায্যে ব্যয় নির্বাহের কাজটা সহজ ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া দায়িত্ব মাথার উপর এসে গেলে মানুষ অধিক পরিশ্রম করতে ও আয় বৃদ্ধি করতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। রুজী রোজগারের ব্যাপারে স্ত্রীও সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কার ভাগ্যে ভবিষ্যতের জন্য কি লেখা আছে তা কেউ বলতে পারে না। ভাল অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে আবার খারাপ অবস্থাও

পরিবর্তিত হয়ে ভাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং অত্যধিক হিসেবী হয়ে চলা ভাল কাজ নয়।–তাফহীমুল কুরআন

তাদাব্বুরে কুরআনে আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী বলেন, পুরুষের ব্যাপারে বিয়ে না করে থাকার সাধারণ কারণ হলো দারিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তি কোনো পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমে নিজেই তো শংকিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কোনো মহিলা নিজেকে ঐ ধরনের পুরুষের সাথে বিয়ের সূত্রে আবদ্ধ হতে সম্মত হবে কি করে ? এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিদূরীত করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা দরিদ্র তারা এবং অপরপক্ষও যেন নিশ্চিন্ত থাকে যে বিবাহ দারিদ্র বৃদ্ধি করে না বরং আল্লাহর রিয্ক ও অনুগ্রহের বৃদ্ধি সাধন করে থাকে। যে লোক নিজের ঈমান ও চরিত্রের হেফাযতের জন্যে বিবাহ করে তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয় ও তার প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করা হয়। পুরুষ যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীবিহীন থাকে ততদিন সে যাযাবর জীবন যাপন করে এবং তার অনেক যোগ্যতা সংকুচিত ও প্রদমিত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মহিলা যতদিন স্বামীহীন অবিবাহিতা থাকে তার উদাহরণ হলো সেই লতা-গুল্মের মত যা কোনো ভর না পাওয়ার কারণে প্রসারণ, বর্ধন ও ফলন থেকে বঞ্চিত থাকে। তবে স্ত্রীলোক যখন স্বামী পেয়ে যায় আর পুরুষ যদি স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, তাহলে উভয়ের যোগ্যতা বৃদ্ধিলাভ করে। জীবন ক্ষেত্রে যখন তারা উভয়ে মিলে চেষ্টা-সাধনা চালায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সেই চেষ্টা-সাধনায় বরকত দান করেন আর তখন তাদের অবস্থার সার্বিক পরিবর্তন সূচিত হয়।–তাদাব্বুরে কুরআন

এতো গেল স্বল্প আয়ের লোকদের কথা। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا "আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ নেই, তারা যেন নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করে।" এখানে সেসব লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা এতই অসচ্ছল যে তাদের পক্ষে বিয়ে করা মোটেই সম্ভব নয়। এ ধরনের লোকদের হেদায়াত দেয়া হয়েছে তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে অভাবমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সবর করে আর নিজেদের পবিত্র রাখে। এ পর্যায়ে নবী করীম স.-এর একটি হাদীস খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাহলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেনঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - بخارى، مسلم

"হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ্ করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ্ করে। কেননা, বিবাহ্ খারাপ দৃষ্টি থেকে আত্ম রক্ষার এবং নিজের পবিত্রতা রক্ষা করার বড় উপায়। আর যে লোক এর সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে।"–বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

ثلثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازى فى سبيل الله - ترمذى، نسائى، ابن ماجه، احمد

"তিনজন লোকের সাহায্য আল্লাহ্‌র জিম্মায়। একজন সেই ব্যক্তি যে পবিত্র-চরিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে। দ্বিতীয় চুক্তিকারী দাস যে মালিকের প্রাপ্য আদায় করার নিয়ত রাখে। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়।"

এ পরবর্তী আয়াত ৩৩ এ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বের আয়াতে ছিল সমাজের প্রতি হেদায়াত আর এ আয়াত ৩৩ এ ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তির উপরই বর্তাবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহ্ করার মত সামর্থ থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে তার এ বঞ্চনা কোনো অবস্থাতেই নৈতিকতা বিরোধী কাজের কারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ধরনের লোকের কর্তব্য হলো তারা নিজেদেরকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আবার আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণার জন্য অপেক্ষা করবে। যে ব্যক্তি নিজের ঈমান ও চরিত্রের হেফাযতের জন্য এভাবে জিহাদ করতে থাকবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য পথ করে দেবেন। আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথাই প্রকাশ পায়।–তাদাব্বুরে কুরআন

❒

বিশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের সালাম না করে প্রবেশ করো না। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়, তোমরা এ দিকে খেয়াল রাখবে বলে আশা করা যায়। যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও তবে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে ; এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। তোমরা যাকিছু করো, আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন। অবশ্য তোমাদের জন্য এমন ঘরে প্রবেশ করায় কোনো দোষ নেই যাতে কেউ বসবাস করে না। আর সেখানে তোমাদের কোনো জিনিসপত্রও রয়েছে। আল্লাহ্ তো জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো আর যা তোমরা গোপন করো।"–সূরা আন নূর ঃ ২৭-২৯

কারও ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ ঃ দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার

সূরা আন নূরের শুরু থেকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতাজনিত অপরাধের শাস্তির বর্ণনা, কারও প্রতি তোহ্‌মত বা অপবাদের নিন্দা ও শাস্তি এবং এতদসংক্রান্ত কিছু ইতিহাস আলোচনা করে ইসলামী সমাজের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বিধানের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম তার ইপ্সিত পরিচ্ছন্ন ও সৎ সমাজ গড়ার ব্যাপারে কেবল কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার শাস্তি বিধানের উপরই নির্ভর করে না, বরং সবকিছুর আগে ইসলাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম

মানুষের স্বভাবগত চাহিদাকে দমন বা প্রতিহত করে না, বরং এগুলোকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে এবং এগুলোর জন্য এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে কোনো কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপকরণ থাকবে না। অর্থাৎ ইসলাম সমাজের পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য কেবল অপরাধ সংঘটিত হলে পরে শাস্তির বিধান দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং শুরু থেকেই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এভাবে ইসলাম অপরাধ সৃষ্টির সকল চোরাপথ বন্ধ করার ব্যবস্থা (Preventive Check) নিয়ে থাকে। তারপরও কোথায়ও যদি কখনও কোনো অপরাধ ঘটেই যায়, তবে তার প্রতিবিধান ব্যবস্থাও (Curative Measure) বাস্তবায়ন করে থাকে। অবশ্য ইসলাম সর্বপ্রথম ভেতরের মানুষটিকেই তো স্বচ্ছ করে গড়ে তোলে তার নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে দিয়ে। আর যখন কোনো ব্যক্তির মন-মানসিকতা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়, তখন তার থেকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশংকাও হ্রাস পায়। এরূপ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত সমাজই প্রকৃত অর্থে পরিচ্ছন্ন সমাজ—উন্নত সমাজ। আলোচ্য আয়াতে কারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান উন্নত সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা। সূরা আন নূরের ৩১ আয়াতে শরীয়তসম্মত পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহ যোগ্য নর-নারীকে বিবাহ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বিবাহ হচ্ছে যাবতীয় যৌন অপরাধের প্রতিরোধমূলক স্বাভাবিক ব্যবস্থা। ইসলাম নারী-পুরুষের বিয়ের পথকে সুগম করেছে আর ব্যভিচারের পথকে করেছে রুদ্ধ।

ইসলাম মুসলমানদের বাড়ী-ঘরকে এতটা পবিত্র ও সুরক্ষিত করেছে যে, ইসলাম বাড়ী-ঘরের পবিত্রতা বিনষ্ট করার প্রাথমিক ধাপকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাই তো কোনো আগন্তুকের গৃহকর্তার অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বিনা অনুমমিতে অপরের ঘরে প্রবেশের ফল দাঁড়ায় এই যে, হঠাৎ কোনো গোপনীয় ও অবাঞ্ছিত দৃশ্য চোখে পড়ে যেতে পারে, কোনো আপত্তিকর কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যাপারও দৃষ্টিগোচর হয়ে যেতে পারে। অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক দৃষ্টিপাত বার বার হতে গেলে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতে রূপান্তরিত হয়ে বিপথগামীতার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অতপর ক্রমশ তা পাপাচারমূলক এবং অবৈধ সম্পর্কেরও জন্ম দিতে পারে।

জাহেলী যুগে এমন রীতি প্রচলিত ছিল যে, একজন আরব অতর্কিতে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়তো আর বলতো, 'ঢুকে পড়েছি'। এভাবে কখনো গৃহকর্তাকে স্বীয় স্ত্রীর সাথে এমন অবস্থায় দেখতে পেতো যা অন্য কারো

দেখা উচিত নয়। অথবা নারী বা পুরুষকে নগ্ন কিংবা দেহের গোপনীয় অংশ অনাবৃত অবস্থায় দেখতে পেতো। এটা গৃহকর্তার জন্য বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক হতো এবং গৃহের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতো। তাছাড়া উত্তেজনাকর দৃষ্টি বহিরাগতের চোখে পড়ার কারণে স্থানে স্থানে গণ্ডোগোল ও উচ্ছৃংখলতার ঘটনাও ঘটতো।

এসব কারণে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এ উঁচুমানের আদব ও ভদ্র আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যে অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে ঘরের অধিবাসীর অনুমতি নিতে হবে। তাদেরকে সালাম দিয়ে তাদের আপন করে নিতে হবে এবং তাদের মন থেকে যাবতীয় বিরূপ ভাব ও শংকা দূর করতে হবে।–ফী যিলালিল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে কারো ঘরে ঢুকতে হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا –অর্থাৎ "যতক্ষণ না গৃহকর্তার সন্তোষময় অনুমতি নাও ও ঘরে বসবাসকারীদের প্রতি সালাম না পাঠাও।" এখানে মূল কুরআনী আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا বলা হলে অর্থ হতো অনুমতি নেয়া পর্যন্ত কিন্তু বলা হয়েছে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا এখানে تَسْتَاْنِسُوْا শব্দ এসেছে اِسْتِيْنَاسٌ থেকে, যার مَاده বা মূল হলো اُنْسٌ শব্দ। اِسْتِيْنَاسٌ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'পরিচয় জানা' অথবা 'নিজের সাথে পরিচিত করা' তাহলে আয়াতের যথার্থ মানে দাঁড়ায়, 'অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তাদেরকে পরিচিত করে নাও।" অথবা যতক্ষণ তাদের আপন হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে না পারো। অর্থাৎ নিজেকে তাদের পরিচিতজন হিসেবে বুঝিয়ে দিতে পারলে এবং তারাও যেন আগন্তুককে পরিচিত বলে উপলব্ধি করতে পারে অথবা আগমনকারীর ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত ও শংকামুক্ত হতে পারে।–তাফহীমুল কুরআন

দ্বিতীয়ত, ঘরের অধিবাসীদের প্রতি সালাম দেয়া কর্তব্য। কোনো কোনো তাফসীরকারক আয়াতের অর্থ করেছেন কারো ঘরে প্রবেশের জন্য প্রথমে অনুমতি নেবে অতপর ঘরে ঢোকার সময় সালাম করবে। কুরতুবীতে এ অর্থকেই পসন্দনীয় বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে আগে সালাম না দিয়ে সুন্নাত তরিকার খেলাফ করেছে।-রুহুল মাআনী থেকে মুফতী শফী রহ.

আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বাইর থেকে বললো اَاَلِجُ ? আমি কি ঢুকে

পড়বো ? তখন তিনি খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে যেন বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ –অর্থাৎ সে যেন সালাম দিয়ে বলে "আমি কি ভিতরে আসতে পারি ?" খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর কথা শুনে বললো, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ। অতপর তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।-ইবনে কাসীর

বায়হাকী হযরত জাবের রা.-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ স.-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন, لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام যে প্রথমে সালাম করে না তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিও না।-মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন। উপরোক্ত হাদীস থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর দুটো সংশোধনী জানা যায়। এক. প্রথমে সালাম করা উচিত, দুই. اَاَلِجُ। –আমি কি ঢুকে পড়বো ? একথার পরিবর্তে বলবে ااَدْخُلُ। আমি কি ভিতরের আসতে পারি ? উল্লেখ্য, আয়াতে যে সালামের উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো আগন্তুক বাইরে থেকে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য সালাম। এতে করে ভেতরের লোকজন এদিকে মনোনিবেশ করতে পারে ও অনুমতি চাওয়ার বাক্য শুনতে পায়। অনুমতি পাওয়ার পর ঘরে প্রবেশ করার সময় পুনরায় যথারীতি সালাম করতে হবে।

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হয়। তবে এতে নিজের নাম উল্লেখ করা উত্তম। হযরত উমর রা. তাই করতেন। একদা তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারে এসে বললেন, اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ অর্থাৎ তিনি সালাম দিয়ে বললেন, 'উমর আসতে পারে কি ?' অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও তাই করতেন।-মাআরেফুল কুরআন

আমাদের সমাজে ইসলামের এমন রুচীশীল মার্জিত আচরণ বিলুপ্ত প্রায়। কেউ কেউ তো দরজা নক করে মাত্র। সালাম তো করেই না। অধিকন্তু দরজা নক করার আওয়ায শুনে যদি ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়—কে ? তখন জবাবে বলে দেয় 'আমি'। কিন্তু আমি শব্দ দ্বারা তো প্রশ্নের উত্তর হলো না, বরং তা গৃহকর্তার জন্য আরো বিভ্রান্তিকর ও আশংকার কারণ হয়ে পড়ে।

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শোবার সাক্ষাত প্রার্থী হন। তিনি এসে দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তর আসলো, اَنَا -

'আমি'। হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের কারো নাম তো أَنَا - 'আমি' নেই! এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন। একদিন হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্যে দরজার কড়া নাড়লেন। রসূলুল্লাহ স. ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তরে জাবের أَنَا -'আমি' বলে জবাব দিলেন। এতে রসূলুল্লাহ স. তাকে শাসিয়ে বললেন, أَنَا ؟ أَنَا ؟ অর্থাৎ আমি, আমি বললে কাউকেও চেনা যায় নাকি ?-মাআরেফুল কুরআন

আজকাল অনেক শিক্ষিত লোককে এর চেয়ে মন্দ পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়। দরজা নক করার পর যখন ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয় কে ? তখন তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোনো জবাবই দেয় না। এটা তো গৃহকর্তাদেরকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা।

দরজা নক্ করার পর যদি কোনো জবাব না আসে অথবা অন্য কোনোভাবে জানা যায় যে, ঘরে কোনো লোক্ নেই, তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাবে না। অথবা যদি ভিতর থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয়, তখন বিরক্ত না হয়ে ফিরে যেতে হবে। এভাবে চলাটা নিজের জন্য পবিত্রতম পন্থা। ঘরে বসবাসকারীগণ কি কারণে এখন চলে যেতে বললো—তা তো জানা যায়নি। তবুও নিজের আত্মসম্মানবোধের চেয়ে গৃহকর্তার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে হেকমত ও শয়তানের ফিতনা থেকে বেঁচে যাওয়ার রহস্য।–তাদাব্বুরে কুরআন

কারো দরজায় অনুমতি চাওয়ার পর যদি ভিতর থেকে জবাব না আসে, তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নাত। তৃতীয়বারও যদি জবাব না আসে তবে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কারণ তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়াতে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়ায শুনেছে কিন্তু নামাযরত থাকায় অথবা গোসলখানায় অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জবাব দিতে পারছে না। কিংবা এ মুহূর্তে তার কোনো ব্যক্তিগত কারণে সে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। সর্বাবস্থায় সেখানে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অবিরাম দরজা নক করতে থাকা কষ্টের কারণ বিধায় তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষই কষ্টদান থেকে বিরত থাকা। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ

إِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

"তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি জবাব না আসে তবে ফিরে যাওয়া উচিত।"–ইবনে কাসীর

অবশ্য কোনো বিশিষ্ট আলেমে দীন বা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি না চেয়ে তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকে—আশা রাখে যে তিনি বেরিয়ে আসলে সাক্ষাত করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটাই আদব ও উচ্চপর্যায়ের শিষ্টাচার। অবশ্য সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ স.-এর শানে কুরআন এমনি ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ ط لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

"ওরা যদি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে ডাকাডাকি না করে সবর করতো যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসতেন, তবে তা ওদের জন্য ভাল হতো।"–সূরা হুজুরাত ঃ ৫

হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, যখন কারো বসবাসের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এ নিষেধাজ্ঞার পর কুরাইশ ব্যবসায়ী লোকেরা কি করবে ? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শ্যাম দেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে না। এগুলোতে কোনো বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া হবে। এরি প্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط-

"তোমাদের জন্য এমন ঘরে প্রবেশ করায় কোনো দোষ নেই, যাতে কেউ বসবাস করে না ; অথচ সেখানে তোমাদের কোনো জিনিসপত্রও রয়েছে।"–সূরা আন নূর ঃ ২৯

শানে নুযূলের উক্ত ঘটনা থেকে জানা গেল, আয়াতে بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ বলে এমন ঘর বুঝানো হয়েছে যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়। বরং সেখানে সকলের ভোগ করার বা অবস্থান করার অধিকার রয়েছে। যেমন, খানকাহ, মুসাফিরখানা, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলস্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য জনহিতকর যেসব প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক বা মোতাওয়াল্লী রয়েছে সেগুলোর নিয়ম-নীতি পালন করা ওয়াজিব। উদাহরণ

স্বরূপ যে রেলস্টেশনের প্লাটফরমে টিকেট ছাড়া ঢোকার অনুমতি নেই তাতে অবশ্য টিকেট নিতে হবে। সরকারী রেস্ট হাউস, গেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস ইত্যাদির বেলায় নির্ধারিত বিধি-বিধান অবশ্যই পালন করতে হবে।

আয়াতের বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশাধিকারের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আগুন ধরে গেলে, বাসগৃহ ধ্বসে পড়তে লাগলে, চোর ডাকাত ঢুকলে তাদের সাহায্যের জন্য বিনা অনুমতিতেই ঘরে প্রবেশাধিকার রয়েছে। বরং তখন সাহায্যার্থে প্রবেশ করা কর্তব্য। –তাফসীরে মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন

কোনো বাড়ীর মালিকের দূতের সাথে ঐ ঘরে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। দূতের সাথে থাকাটাই অনুমতি। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَه اِذْنٌ -

"যাকে ডেকে পাঠানো হয় সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভিতরে আসার অনুমতি।"–আবু দাউদ, মাহযারী

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কারো ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণের উক্ত নির্দেশ কেবল পুরুষদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং নারী-পুরুষ সকলের বেলায় তা কার্যকর। আল কুরআনের বহু স্থানে পুরুষবাচক শব্দে নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দেখা যায়। যেমন রোযা-নামায ফরয হওয়ার আয়াতসমূহে রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীরা কারো ঘরে যেতে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস রা. বলেন, আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশা রা.-এর ঘরে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতাম।-ইবনে কাসীর

আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের সাধারণভাবে সম্বোধন করার ব্যাপকতায় অন্য কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের বিধানে নারী-পুরুষ এবং মুহ্‌রিম গায়রে মুহ্‌রিম সবাই শামিল রয়েছে। নারী-নারীর ঘরে যেতে হলে, পুরুষ পুরুষের ঘরে যেতে হলে সবাইর জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে কেউ যদি নিজের মা, বোন অথবা কোনো মুহ্‌রিম নারীর কাছে যেতে চায়—তারও এসব অবস্থায় অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতেও অনুমতি চাইবো ? তিনি বললেন, হাঁ, অনুমতি চাইবে।

লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তুবও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করবে না। সে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছে থাকি। তিনি বললেন, তবুও তুমি অনুমতি ছাড়া ঘরে যাবে না ; اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পসন্দ করো ? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কারণ, ঘরের ভিতরে কোনো প্রয়োজনে তার দেহের কোনো অপ্রকাশযোগ্য অংগ খোলা থাকতে পারে।–মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন

যে ঘরে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে সে ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব না হলেও সুন্নাত-মোস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত। হঠাৎ সেখানেও বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। পদধ্বনী বা গলা ঝেড়ে হুঁশিয়ার করে ঘরে যাওয়া দরকার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ যখন বাইর থেকে ঘরে আসতেন তখন প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপসন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।-ইবনে কাসীর

এখানে আয়াতে বলা হয়েছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না পেলে আগন্তুক ফিরে যাবে। তেমনি এক হাদীসে বাড়ীওয়ালার কর্তব্যও বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে اَن لزورك عليك حقا সাক্ষাত প্রার্থী ব্যক্তির হক আছে আপনার (বাড়ী ওয়ালার) উপর। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে এসে তার সাথে সাক্ষাত করুন, তার কথা শুনুন, তাকে সম্মান করুন এবং গুরুতর ওযর না থাকলে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।
–মাআরেফুল কুরআন

একুশ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قف ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মালিকানাধীন লোক আর তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় যেন তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে—ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমাদের পোশাক শিথিল করো এবং ইশার নামাযের পরে। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া তোমাদের ও তাদের কোনো গুনাহ নেই—তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। আল্লাহ্ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৮

যে তিন সময়ে মা-বাবার কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হবে

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের সম্বোধন করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দাস-দাসী তথা চাকর-চাকরানীগণ আর তোমাদের যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌছেনি অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা তোমাদের কক্ষে যেতে হলে এমন তিনটি সময় আছে যখন ওরা তোমাদের কাছ থেকে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করবে। কারণ এ তিনটি সময় হচ্ছে তোমাদের পর্দার সময়। অর্থাৎ এ তিনটি সময় মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী একান্তবাস ও বিশ্রাম নেয়ার সময়। এ সময়

মানুষ খোলামেলা থাকতে চায়, একান্তে এ সময়ে কখনো কখনো আবৃত অংগও খুলে যায় অথবা শরীর হালকা করার জন্য মানুষ কিছুটা অনাবৃত অবস্থায় থাকে বা প্রয়োজনে কোনো অংগ খোলা হয়ে থাকে। তাই এমন তিনটি সময়ে নিজের চাকর-চাকরানী বা ছেলেমেয়েরা তোমাদের কক্ষে যেতে হলে অবশ্যই আগে তোমাদের অনুমতি নিতে হবে। সেই তিনটি সময় হলো ঃ ১. ফজরের নামাযের পূর্বে, ২. দুপুরে যখন তোমরা দেহের শিথিলতাকল্পে কিছুটা অনাবৃত হয়ে থাক, ৩. ইশার নামাযের পর। এ তিন সময় ছাড়া ওদের তোমাদের কাছে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। কেননা তোমাদের একে অন্যের কাছে বার বার আসা যাওয়া করতেই হয়। সুতরাং সবসময় অনুমতি চেয়ে প্রবেশ করা কষ্টকর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এমনিভাবে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে ভাল হয়ে থাকতে পার। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। কাজেই মানুষের জন্য কিসে কল্যাণ আর কিসে ক্ষতি তা তিনিই ভাল জানেন। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির স্রষ্টা রব্বুল আলামীন। তিনিই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন মানুষের সার্বিক অবস্থা। আর সেভাবেই তিনি মানুষের জন্য হুকুম-আহকাম দিয়ে থাকেন।

আল কুরআনে উক্ত তিন সময়কে বলা হয়েছে ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের জন্য তিনটি 'আওরাত'। আরবীতে 'আওরাত' বলতে সাধারণত স্ত্রীলোকদের বুঝায়। শব্দটির অর্থ 'ফাঁক ও বিপদের স্থান'। আর যে স্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় লজ্জার কারণ হয় কিংবা যার প্রকাশিত হয়ে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় তাকেও 'আওরাত' বলা হয়। অরক্ষিত জিনিসকেও আওরাত বলা হয় এবং শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এসব অর্থ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আয়াতের বক্তব্যের সাথে এর প্রত্যেকটি অর্থের কোনো না কোনোরূপ সংগতি রয়েছে। আয়াতের তাৎপর্য হলো, এ তিনটি সময়ে একাকী কিংবা নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এমন অবস্থায় পড়ে থাকো, যখন ঘরের ছেলেমেয়েদের চাকর-চাকরাণীদের হঠাৎ করে তোমাদের কাছে এসে পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং তাদের বলে রাখ তারা এ তিন সময়ে যদি তোমাদের কাছে আসতে চায় তবে তারা যেন তোমাদের অনুমতি নিয়ে আসে।

এ তিন সময় ছাড়া অন্য যে কোনো সময়ে নাবালেগ ছেলেমেয়েও ঘরের চাকর-চাকরানী নারী-পুরুষের কাছে তাদের কক্ষে বা নিভৃত স্থানে অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে। এ সময় তোমরা যদি অসতর্ক অবস্থায় থাক, আর তারা পূর্বানুমতি ছাড়াই তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করে বসে তাহলে তোমাদের কড়া কথা বলার বা শাসানোর অধিকার থাকবে না। কেননা

কাজকর্মের সময় নিজেদেরকে অসতর্কাবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই নির্বুদ্ধিতা। তারা যদি নিভৃতির পূর্বোক্ত তিন সময়ের কোনো এক সময়ে তোমাদের কক্ষে বিনা অনুমতিতে আসে, তবে তারা দোষী হবে ; অন্যথা তোমরা নিজেরাই দোষী হবে, কারণ, তোমরা ঘরের ছেলে মেয়েদের এবং খাদেম-চাকরদের এমনি ধরনের সুশিক্ষা দাওনি। এ তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময়ে ছেলেমেয়েদের ও দাস-দাসীদের কক্ষে প্রবেশের সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط -

এ তিন সময় ছাড়া তোমাদের ও তাদের গুনাহ নেই—তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এখান থেকে ফিক্‌হ্ নীতির একথা বুঝতে পারা যায় যে, শরীয়তের বিধান কল্যাণমূলক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি বিধানের মূলে কোনো না কোনো কারণ নিহিত রয়েছে। সে কারণ বলে দেয়া হোক বা নাই বলা হোক।–তাফহীমুল কুরআন

ইতিপূর্বে বর্ণিত সূরা আন নূরের ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল কুরআনে ঘর-বাড়ীর মালিক ও অধিবাসীদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার বিধান বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করো না। পুরুষের ঘর হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক বা নারী হোক—সকলের জন্যই অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে পূর্বেই প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এসব বিধানাবলী তো ছিল বাইর থেকে আগমনকারী অপরিচিত বা অনাত্মীয়দের জন্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মুহ্‌রিম ব্যক্তিগণের সাথে, যারা সাধারণত একই ঘরে বসবাস করে এবং সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে আর তাদের সাথে নারীগণের পর্দা করাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে হলে খবর দিয়ে কিংবা অন্তত সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে ঘরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়—মোস্তাহাব। এটা তরক করা মাকরূহ তান্‌জিহী। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ

فمن اراد الدخول فى بيت نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول فيه من غير استيذان تنزيها الاحتمال رواية واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف مقتضاه التنزه-

উপরে ঘরে প্রবেশের পূর্বের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঘরে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে উক্ত তিনটি বিশেষ সময়ে আরেক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য ৫৮ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

উক্ত তিন সময়ে মুহ্‌রিম আত্মীয়-স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদের আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করে। এসব সময়ে কোনো বুদ্ধিমান বালক অথবা ঘরের কোনো নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ অনুমতি ছাড়া ঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে।

—মাআরেফুল কুরআন

পূর্বে সূরা আন নূরের ৩১ আয়াতে ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, তা থেকে বালক এবং নাবালেগ শিশুদের বাদ রাখা হয়েছিল। অতপর তাদের জন্যও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তিনটি বিশেষ সময়ে তারাও যেন প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করে। উক্ত তিনটি বিশেষ সময়ে বিশেষ সাবধানতার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উক্ত তিনটি সময় হলো অসাবধানতা ও পর্দাহীনতার সময়। ফজরের পূর্বের আর ইশার পরের সময়ে সাবধানতার বিষয়টি তো পরিষ্কার। বাকী দুপুরের সময়টাও সাধারণত বিশ্রামের সময় বিশেষত আরব দেশে গরমের দেশ হওয়ার কারণে এ সময় লোকেরা কায়লুলা করে থাকে। 'কায়লুলা' মানে দুপুরের খাবার পর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়া। এ সময় শিশু-কিশোরগণ অনুমতি ছাড়া কক্ষে ঢুকে পড়লে সম্ভাবনা থাকে যে, ওরা কক্ষের লোকদের এমন অবস্থায় দেখে ফেলবে যে অবস্থায় তাদেরকে দেখা অপসন্দনীয়। এসব কারণে উল্লিখিত বিধান ও শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে। আর এসব বিধি-বিধানে একটা ক্রমিক ধারার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যেন এ

বিধান পালনে মন-মানসিকতায় কঠোরতার ছাপ না লাগে। উক্ত তিন সময় ছাড়া ওদের জন্য অনুমতি গ্রহণের কোনো শর্ত নেই। কারণ ঘরের সকলকেই পরস্পরের কাছে আসা-যাওয়া করতে হয়। এজন্যে আল্লাহ তাআলা কাউকে কঠোর অবস্থায় ফেলতে চান না।

তবে এসব নাবালেগ শিশুরাও অনুমতি গ্রহণ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী হবে তখন পর্যন্ত যখন পর্যন্ত তারা নাবালেগ থাকে। বালেগ হওয়ার পর তাদের উপরও ঐসব শর্তাদী ও বিধি-বিধান কার্যকর হবে যা অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য। ওরা শিশুকাল থেকে তো এ ঘরে আসা-যাওয়া করে আসছে— এ অজুহাতে ওদের জন্য কোনো ছাড় নেই।

আলোচ্য ৫৮ আয়াতের সাথে ৫৯ আয়াত মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, পরবর্তী আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের বিধানের ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর এটা আল্লাহ তাআলার ইল্‌ম ও হিকমতের উপরই ভিত্তিশীল। কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন যে বান্দাদের প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য কি বিধান দরকার এবং কি রকম ক্রমধারায় বিধানাদি নাযিল করা দরকার।

-তাদাব্বুরে কুরআন

❒

বাইশ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَايَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"নারীদের মধ্য হতে যারা যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, বিবাহ করার আকাংখী নয় ; তারা নিজেদের চাদর খুলে রাখলে কোনো দোষ নেই। অবশ্য যদি তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী না হয়। তবে তা থেকে বিরত থাকাটাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"

–সূরা আন নূর ঃ ৬০

যেসব বৃদ্ধার জন্য পর্দার বিধান শিথিলযোগ্য

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী শরীয়তে পর্দার বিধানের কঠোরতা অঘটনের আশংকার উপর নির্ভরশীল। যেখানে স্বভাবত কোনো অঘটনীয় কাজের আশংকা থাকে না সেখানে পর্দার বিধান শিথিলযোগ্য। যেমন এমন নারী যে বিবাহের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ যার কোনো প্রকার যৌন আকাংখা আর নেই এবং যাকে দেখলে কোনো পুরুষ আকর্ষিত হয় না। এ ধরনের বৃদ্ধা নারীরা শরীরের পর্দার জন্য ব্যবহৃত কাপড় গায়রে মুহরিম পুরুষদের সামনেও খুলে রাখতে পারবে—এতে তাদের গুনাহ্ হবে না। তবে শর্ত হলো এতে করে তাদের মনে যেন কোনো প্রকার সৌন্দর্য দেখানোর ভাব না থাকে। অথবা তারা যেন সৌন্দর্য প্রকাশের স্থানসমূহ প্রকাশ না করে। অর্থাৎ মুখাবয়ব, হাতের তালু এবং কারো কারো মতে পদযুগল খোলা রাখতে পারবে। কিন্তু অঘটনের আশংকা থাকলে যুবতী নারীর মুখাবয়ব, হাতের তালু ও পদযুগল ইত্যাদির পর্দা জরুরী। বৃদ্ধা মহিলার জন্য এসব খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। কারণ এর উদ্দেশ্য পর্দাহীনতাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা। আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুই শোনেন আর সবকিছুই তাঁর ভালভাবে জানা আছে।

আলোচ্য আয়াতে নারীদের পর্দার একটা ব্যতিক্রম অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণবোধ করে না, আর

সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান এমনভাবে শিথিল করা হয়েছে যে, একজন অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার জন্য মুহরিমের মত হয়ে যায়। মুহরিমের সামনে যেসব অংগ আবৃত করা জরুরী নয় এ বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের সামনেও সেসব অংগ আবৃত করা জরুরী নয়। কিন্তু তবুও সাবধানতা রক্ষার জন্যে তাদের এমনটি না করাই শ্রেয়। তাছাড়া এসব অংগ খোলার পেছনে তার সৌন্দর্য প্রকাশের সামান্যতম ভাবও থাকতে পারবে না।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে اَلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ-এর অর্থ যেসব মহিলা বসে গেছে অর্থাৎ বিবাহের বয়স যাদের আর বাকী নেই, যাদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ নেই ; তাদের জন্য পর্দার এক বিশেষ অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বসে যাওয়া মহিলা বলে এমন সব মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যারা সন্তান হওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে। যাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। যাদের নিজেদের যৌন কামনা-বাসনা অবশিষ্ট নেই যাদের দেখে পুরুষদের মনে যৌন-বাসনা জাগ্রত হয় না। আবার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ-

তাদের কাপড় খুলে রাখাতে কোনো গুনাহ্ হবে না। এখানে কাপড় খুলে রাখার মানে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে যাওয়া বা উলংগ হয়ে যাওয়া নয়। এ ব্যাপারে সকল ফেকাহবিদ ও তাফসীরকার একমত হয়ে এর অর্থ করেছেন এখানে কাপড় মানে সেই চাদর যা দিয়ে মহিলাদের দেহের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য সূরা আহযাবে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ-

"তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে।"

এখানে اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ অর্থাৎ "বৃদ্ধা মহিলার কাপড় খুলে রাখলে কোনো দোষ নেই" বলে সে কাপড়কে বুঝানো হয়েছে, যা মহিলারা সেলোয়ার-কামীসের উপরে বড় চাদর অথবা বোরকা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। তবে শর্ত হলো কাপড় খুলে রাখার উদ্দেশ্যে যেন নিজের সৌন্দর্য ও দেহের গঠন দেখান না হয়। এর মানে কোনো মহিলা নিজের যৌন আকর্ষণ হারিয়ে যাওয়ার পরেও যদি সেগেগুজে দেহের গঠন প্রদর্শনী করার রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে পর্দার এ শিথিলতা তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না। বরং তাকে পুরোপুরি শরয়ী পর্দা করতে হবে।–মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ ঃ কুরআনুল কারীম

আঁলোচ্য সূরা আন নূরের ৬০ আয়াতে চাদর খুলে রাখার এ অনুমতি সেসব বৃদ্ধা মহিলার জন্য দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে সেজেগুজে থাকার প্রবর্ণতা আর অবশিষ্ট নেই, যাদের যৌন স্পৃহা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু এ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া আগুনের কোনো স্ফুলিংগ এখনো বাকী থেকে থাকে আর তা তার রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনে পরিণত হয়, তাহলে এমন মহিলার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ–আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ—অর্থাৎ তিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। মানুষ মুখে কি বলেন, সে সম্পর্কে যেমন তিনি অবগত আছেন তেমনি মনের গভীরে কি সব জল্পনা-কল্পনা চলে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন। কারণ গোটা বিষয়টি হচ্ছে বিবেক নির্ভর ও সদিচ্ছা নির্ভর। বিবেকের খবরও যেহেতু আল্লাহর জানা আছে, কাজেই এখানে কপটতার কোনো অবকাশ নেই।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

তেইশ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

"আর যারা দুআ করতে থাকে এই বলে যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের এমন জোড় ও সন্তান-সন্ততি দান করো যারা আমাদের জন্য হবে চক্ষু শীতলকারী। আর তুমি আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।"–সূরা ফুরকান ঃ ৭৪

দীনদার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ও সন্তানাদির জন্য মুত্তাকী হওয়ার দুআ করে

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের একটি বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৬৪ আয়াত থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, বরং তাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে থাকে। এ চেষ্টার চূড়ান্ত অংশ হলো তারা পরস্পরের জন্য ও সন্তান-সন্ততির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে থাকে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানিয়ে দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারের নেতা ও ইমাম স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকেন। কাজেই এ দুআর সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন। তারা সবাই মুত্তাকী হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই লোক মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা বলে সাব্যস্ত হবেন।

এখানে নিজের উন্নতির জন্য দুআ করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও নিজ নিজ জোড়ের (স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর) জন্যেও দুআ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নখঈ বলেন, এ দুআয় নিজের জন্য কোনো সরদারী ও নেতৃত্বের প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং এতে উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের এমন যোগ্য করে দিন, যাতে সবাই ধর্ম ও

আমলের দিক থেকে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের ইল্‌ম ও আমল দ্বারা সবাই উপকৃত হতে পারে। হযরত মকহুল শামী বলেন, এ দুআর উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির এমন স্তর অর্জন করা যদ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের নিজেদের পরিণাম চিন্তার সাথে সাথে তারা যে পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির পরিণামও চিন্তা করে থাকে সেকথা প্রতিভাত হয়েছে। তারা তো আল্লাহ্‌র নবীর বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন থাকে। নবীর বাণী اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য রাখাল তুল্য দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে এ দায়িত্বানুভূতি পূর্ণভাবে বিরাজমান থাকার কারণে তারা নিজেদের পরিবার-সদস্যদের লাগামহীন জীবন যাপনকারীর ন্যায় জীবনযাপন করতে দেয় না। লাগামহীন জীবন-যাপনকারী লোকেরা কেবল দুনিয়ার জীবনের তুষ্টি কামনা করে, তাদের পরিবার সদস্যরা ভাল পথে দীনের পথে জীবন পরিচালিত করার জন্য তো তাদের কোনো মাথা ব্যথা থাকে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র পথের পথিকরা তো নিজের লোকদের জন্য দুনিয়ার সুখ শান্তির চেয়ে আখিরাতের সুখ-শান্তির প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততির কেউ যেন শয়তানের পদাংক অনুসরণে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে—এটাই হয় তাদের কাম্য। সূরা আত তূর-এর ২৬ আয়াত اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ।–"আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।" এ আয়াতে তাদের এ চিন্তা ও আশংকার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ আশংকার কারণে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের রবের কাছে দুআ করতে থাকে—হে আমাদের রব! আমাদেরকে নিজেদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করো ; তাদের আমল-আখলাক তোমার পসন্দনীয় আর আমাদের আকাংখা মোতাবেক হোক ; এবং আমরা যেন এ দুনিয়াতে সৎলোক ও মুত্তাকীগণের নেতারূপে উঠতে পারি—অসৎ ও ফাসেক লোকদের নেতারূপে যেন না উঠি। এখানে আয়াতের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এটা নেতৃত্ব পাওয়ার জন্যে দুআ নয় ; বরং প্রত্যেক পরিবার ও গোত্রের বাস্তবে যে নেতৃত্ব হাসিল হয় তার দায়িত্বসমূহ যথাযথ আনজামদানে সক্ষম হওয়ার জন্য দুআ।–তাদাব্বুরে কুরআন

এটাই হচ্ছে স্বভাবজাত অনুভূতি যা গভীর ঈমান থেকে উৎসারিত। একজন প্রকৃত মুমিন স্বভাবতই কামনা করবে যেন আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের

সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর এ পথিকদের প্রথম সারিতে তার স্ত্রী বা স্বামী ও সন্তান সন্ততিরা থাকুক। কারণ তারা হচ্ছে তার আপনজন ও তাদের কাছে আল্লাহর আমানত স্বরূপ। যাদের ব্যাপারে তার কাছে অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করা হবে। একজন প্রকৃত ও খাঁটি মুমিন এটা কামনা করবে সে যেন সত্য ও কল্যাণের দিশারী হতে পারে এবং আল্লাহর পথের পথিকদের নেতৃত্ব দিতে পারে। এ কামনার মধ্যে নিজেকে বড় মনে করার কিছুই নেই। এতে আত্ম গরিমারও কিছু নেই। কারণ, তারা সবাই তো একই কাফেলার লোক। তারা সবাই আল্লাহর পথের পথিক।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

চব্বিশ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

"আর লূতকে পাঠালাম, সে তার কওমকে বলেছিল ঃ তোমরা কি দেখেশুনে এমন কুকাজ করছো ? তোমরা কি যৌন তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করছো ? তবে তো তোমরা এক বর্বর সম্প্রদায় ! উত্তরে তার কওম একথাই বললো, নিজেদের লোকালয় থেকে লূতের লোকদেরকে বের করে দাও। এরাতো বড্ড পবিত্রতা দেখাচ্ছে। অতপর আমরা তাকে ও তার পরিজনকে নাজাত দিলাম ; কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়—তাকে তো আমরা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছি। তাদের উপর আমরা ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সেই সতর্ককৃত লোকদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কতই না মারাত্মক ছিল।"

—সূরা আন নামল ঃ ৫৪-৫৭

আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় নবীর স্ত্রী হয়েও রক্ষা পেল না যে নারী

হযরত লূত আ. ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভাই 'বারান.-এর ছেলে। হযরত লূত আ. একবার যুদ্ধে রোমানদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লে হযরত ইবরাহীম তাকে বন্দীমুক্ত করে দেন। এক সময় সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হযরত লূত আ.-এর আশপাশের গ্রামগুলো ছিল কিছুটা সচ্ছল। ফলে দূরদুরান্ত থেকে লোকজন সেখানে এসে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য ভিড় জমাতো। অসভ্য গ্রামবাসীরা এতে হিংসার বশবর্তী হয়ে একটা অতি খারাপ ফন্দি আঁটলো। তারা খাদ্য সংগ্রহকারীদের সাথে কুকাজে (সমকামিতায়) লিপ্ত হতো। ফলে বাইরের লোকদের আগমন হ্রাস পেয়ে গেল। কিন্তু তারা আর সেই কু-অভ্যাস ছাড়তে পারলো না। অতপর যখনি

তারা কোনো সুন্দর বালক পেতো নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুকাজে লিপ্ত হতো আর তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক একেবারেই ছেড়ে দিল। তাদের এহেন চরিত্র বিধ্বংসী অমানুসিক কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াতের জন্য হযরত লূত আ.-কে পাঠালেন। আলোচ্য আয়াতে وَلُوْطًا শব্দ থেকে একথাই বুঝানো হয়েছে।–কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু

সূরা আল আরাফের ৮০-৮২ আয়াতে বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে এভাবে, আমি লূত আ.-কে পাঠালে সে তার জাতিকে বললো তোমরা কি এমন লজ্জাহীনতার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, যে কাজে তোমাদের পূর্বে কোনো লোককে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি ? তোমরা তো নারীর পরিবর্তে পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সীমালংঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছ। এর কোনো সদুত্তর না দিয়ে তারা পরস্পরকে বলতো, এদেরকে— লূত ও তার সাথীদেরকে দেশ থেকে বের করে দাও, এরা তো বড্ড পবিত্র সেজে বসতে চায়।

সূরা আন নমলের আলোচ্য আয়াতে হযরত লূত আ.-এর কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর জাতি কিভাবে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অথচ তাঁর অপরাধটা কি ছিল ? তিনি তাদের জঘন্য কুৎসিৎ ও অশ্লীল কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। তারা তাদের এ অপকর্মের ব্যাপারে এতোই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, এ ব্যাপারে সমগ্র জাতিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানব জাতি কেন, কোনো প্রাণী জগতেও এ কাজের উদাহরণ পাওয়া যাবে না কোথাও। বরং এ ছিল আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যেহেতু সৃষ্টিজগতের নিয়মনীতিতে জোড়ায় জোড়ায় জন্মানোই জীবনের ভিত্তি। অন্য কথায় জোড়া জোড়া হওয়া ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। সেহেতু আল্লাহ তাআলা নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণকে জন্মগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। এ আকর্ষণ শিখিয়ে দেয়ার বা উদ্বুদ্ধ করার অপেক্ষা রাখে না। এরূপ ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য স্বতস্ফূর্ত জন্মগত তাড়নার ভিত্তিতেই যেন জীবনের বিকাশ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক প্রাণী তার এ জন্মগত তাড়না চরিতার্থ করে আনন্দ পায়। প্রাণীর দেহের ভিতরে সংরক্ষিত এ স্বাদ ও আনন্দের ভিতর দিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা আপন ইচ্ছা এমনভাবে বাস্তবায়িত করেন যে, তারা নিজেরাও তা টের পায় না। আর অন্য কেউ তাকে সে সম্পর্কে কোনো

দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা নারী-পুরুষের অংগ-প্রত্যংগগুলোকে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠন করেছেন যেন উভয়ের মিলন স্বাভাবিক আনন্দকে বাস্তবায়িত করে। এ সামঞ্জস্য বা সমন্বয় তিনি একই লিংগের দুই ব্যক্তির অংগ-প্রতংগের মধ্যে সৃষ্টি করেননি। এ জন্মগত বৈশিষ্ট্যের যেরূপ সর্বব্যাপী বিকৃতি হযরত লূত আ.-এর জাতির ভিতরে সংঘটিত হয়েছিল তা যথার্থই বিস্ময়কর ও স্বাভাবিক নিয়মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এজন্যেই হযরত লূত আ. জাতির এ অপকর্মের প্রতিবাদে বিস্ময় জড়িত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

তাদের বিকৃতির এ প্রতিবাদের জবাবে হযরত লূতের জাতি সঠিক জবাবদানের পরিবর্তে কেবল একথাই বলেছিল যে, লূত ও তার অনুসারীরা খুব সৎ ও পবিত্র মানুষ সাজতে চায়। ওদের স্থান এখানে নেই। ওদেরকে এদেশ থেকে বের করে দিতে হবে। হযরত লূত আ.-এর অনুসারীরা তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কেবল তাঁর স্ত্রী ছাড়া। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এ মহিলাটি ছিল চরিত্রহীনা, সে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সমকামিতাকে সমর্থন করতো। তাই আল্লাহর ইনসাফের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য দুশ্চরিত্রের লোকদের সাথে লূত আ.-এর স্ত্রীকেও ধ্বংস করে দেয়া হলো।–ফী যিলালিল কুরআন

আল্লাহর বাণী قَدَّرْنَـهَـا مِنَ الْغَـبِـرِيْنَ তাকে পেছনে পড়ে 'থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছি' কথা দ্বারা কেবল এটা বুঝানো হয়নি যে, হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী আল্লাহর নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং কথাটার অর্থ এও হতে পারে যে, এ পাথর বৃষ্টির শাস্তি তার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করা ছিল। এটা এজন্যে যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও যখন তার সহানুভূতি ছিল সেই অযোগ্য জাতির প্রতি তখন অন্যদের তুলনায় আল্লাহর আযাব তার প্রতি অধিক হওয়াই উচিত। কারণ আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি তার অনুকম্পা তাকে আল্লাহর গযবের অধিকতর যোগ্য করে তুলেছে। আল্লাহ্ যাকে শিক্ষা ও হেদায়াতের সুযোগ যত বেশী পরিমাণে সংস্থান করে দেবেন, সে তার যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা না দিলে তার প্রতি আল্লাহর শাস্তিও সেই হারেই হতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা তো দায়িত্ব অনুপাতেই পারিতোষিক দিয়ে থাকেন।–তাদাব্বুরে কুরআন

কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী কওমে লূতের প্রতি আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই নবীর সাথীগণকে লোকালয় থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। আর নির্দেশ ছিল কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়। এ

নির্দেশ সবাই যথাযথ মেনে চলেছিল। কিন্তু হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী সকলের পেছনে থেকে পেছনের দিকে তাকাতে ছিল। পরিণামে সেও আল্লাহর আযাবগ্রস্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেল। সে তো একদিকে নবীর আদর্শ বিরোধীদের সহযোগী ছিল। আবার আল্লাহর আযাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে না দেখার আল্লাহর নির্দেশও অমান্য করেছিল। সুতরাং নবী স্বামীর আদর্শ বিচ্যুতির অপরাধের শাস্তি থেকে তাকে নবী স্বামীর স্ত্রী হওয়ার সম্পর্ক আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

❐

পঁচিশ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○

"ফিরাউন পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বসলো। সে দেশবাসীকে দলে দলে বিভক্ত করে রেখেছিল, যাদের একদলকে সে হীনবল করে রেখেছিল—ওদের পুত্র সন্তান হলে তাকে সে হত্যা করে ফেলতো, আর কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত থাকতে দিতো। সে তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৪

অনৈসলামী সমাজে নারী-নিরাপত্তাহীনতার করুণ ইতিহাসের একটি দিক

হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হবার বছরের এ ঘটনাটি কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ৪৯ আয়াতেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যা এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

তৎকালীন মিশরের বাদশাদের উপাধী ছিল 'ফিরাউন'। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি হযরত মূসা আ. জন্মের সময়কার অবস্থা। সে সময়ে মিশরের যে অধিপতি ছিল, সে ছিল মিশরের দ্বিতীয় ফিরাউন একজন জালিম জঘন্য চরিত্রের রাজা। সে স্বপ্নে দেখলো যে, বনী ইসরাঈলের এক লোকের হাতে তার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। এ স্বপ্ন দেখার পর জালিম বাদশাহ রাজ্যের নবজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ জারি করে দিলো, কিন্তু কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিত। এভাবে সে তার বিভক্তিকৃত জনপদের একটি গোত্রকে পদানত করে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ –"ফিরাউন পৃথিবীর বুকে তার বড়ত্ব প্রদর্শন করে বসলো। সে অহংকারে মেতে উঠে পড়লো। সে রাজ্যের জনগণকে যিম্মি করে রেখেছিল। সে নানা কূটকৌশল অবলম্বনে মিশরবাসীকে বহু বিবাদমান দলে বিভক্ত করে রেখেছিল, যাতে তারা কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে না পারে এবং কখনো একজোট

হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারে। তার অহংকার, যুলুম ও দমননীতির প্রধান শিকার ছিল বনী ইসরাঈলরা। কারণ তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি তার ও তার কওমের নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তারা তাদের দাদা ইবরাহীম আ. ও পিতা ইয়াকুব আ.-এর প্রবর্তিত নিয়ম ও বিধান মেনে চলতো। ক্রমান্বয়ে তাদেরও জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে লাগলো। এতদসত্ত্বেও বিশ্বজগতের মালিক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা—এ মূল বিশ্বাস তখনও তাদের মধ্যে জীবন্ত ছিল। শত নিষ্পেষণেও তারা ফিরাউনের 'সর্বময় ক্ষমতার মালিক' হওয়ার দাবীকে স্বীকার করতো না, সবাই তার শিরক ও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল।

এভাবে চরম অহংকারী ফিরাউন অনুভব করতে লাগলো যে, এ ভিন্ন মতাবলম্বী জাতির আকীদা-বিশ্বাস ও মিশরে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব তার ক্ষমতা ও রাজত্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা এতবেশী যে, সামগ্রিকভাবে তাদেরকে মিশর থেকে বহিষ্কার করাও কঠিন। আদম শুমারীতে দেখা গেছে তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ পরিমাণের। সে আরও সন্দেহ করতো যে, তারা বিরুদ্ধবাদী প্রতিবেশী দেশগুলোর সহযোগিতা নিয়ে তাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই সে এ অনমনীয় ও তার অবাধ্য জাতিকে দমন করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার জঘন্য ও নিপীড়নমূলক উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেল। বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা আবিষ্কার করলো, তাদেরকে দেশের কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো, তাদের জীবনকে সর্বদিক থেকে দুর্বিসহ করে তুললো, তাদের জীবনে এনে দিল নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা আর অশান্তির সীমাহীন অত্যাচার-অনাচার। সর্বশেষে তাদের সংখ্যা কমানোর হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে কুরআনে বর্ণিত বিষয়ে অর্থাৎ তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার ব্যবস্থা নিলো। ফিরাউন তার প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ জারি করলো, যখনি বনী ইসরাঈলীদের কোনো পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তখনি যেন তাকে হত্যা করা হয়। আর কন্যা সন্তান হলে যেন তাকে জীবিত রেখে দেয়া হয়। তার উদ্দেশ্য নানা ধরনের যুলুম-অত্যাচারের পাশাপাশি এ পুত্র নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকলে ক্রমান্বয়ে তাদের বংশ হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। এ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এ যালিম শাসক বনী ইসরাঈলীদের উপর দমননীতি চালানোর সময় একটু ভেবে দেখলো না যে, সে নিজে কত দিন বাঁচতে পারবে। তার চেয়ে শক্তিধর কত রাজাধিরাজ এ

সুন্দর পৃথিবীতে কত জাকজমকের সাথে চলেছিল, কিন্তু তাদের আয়ূ শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও তো তারা দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারেনি। নির্দিষ্ট সময় শেষে তারা সবাই এ সুন্দর ভুবন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত মূসা আ.-এর জন্ম ও লালন-পালন হয়েছিল এমনি এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে—সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার ফলে। মূসা আ.-এর এ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে বা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। আর আল্লাহ্ কাউকে ধ্বংস করতে চাইলে পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত হয়েও তাকে বাঁচাতে পারে না।

মানব জাতির মুক্তি ও শান্তির একমাত্র ব্যবস্থা ইসলামী জীবন বিধান কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সেখানে কি রকম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে তার কিছু বর্ণনাও আমরা আলোচ্য আয়াত থেকে উপলব্ধি করতে পারি। ঔদ্ধ্যত ফিরাউন যেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করে তার বিরোধী ইসরাঈলীদের বংশ ধ্বংস করার লক্ষে রাজ্যের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল ; তেমনি যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহী রাজ শক্তিসম্পন্ন ঔদ্ধ্যত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের নানাবিধ কষ্ট-যন্ত্রণার অক্টোপাশে আবদ্ধ করে রাখার সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে থাকে। মূসা আ.-এর যুগের ফিরাউনের মত সকল যুগের নব্য ফিরাউনরাও রাজ্যের জনগণকে নানা দল-উপদলে বিভক্ত করে কাউকে দেয় সীমাহীন প্রশ্রয় আর কারো উপর চালায় অত্যাচারের স্টীম রোলার। নিজের মতের বিরোধীদের প্রতি চালাতে থাকে যুলুম-অত্যাচারের চরম দমননীতি। এ জাতীয় জালিমদের হাতে অত্যাচারিত হয় অবলা-অসহায় নারী সমাজ সর্বাধিক। যেমন ফিরাউন ইসরাঈলীদের কন্যা সন্তানকে হত্যা না করে জীবিত রাখতো অথচ পুত্র সন্তানকে জন্মের সাথে সাথে হত্যা করতো। এতে করে সে আসলে নারী জাতিকে চরম অসহায়ত্বের মুখে ঠেলে দিতো। কারণ পুত্র সন্তানগুলোকে হত্যা করার ফলে ঐ সমাজ পুরুষ বিহীন সমাজে পরিণত হতো। ওরা নারীদের বানাতো নিজেদের দাসী, আর তাদের সাথে আচরণ করতো অমানবিক ও পাশবিক ধরনের। এভাবে নারীগণ চরমভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহিত হতো তাদের হাতে। বস্তুত সমাজকে উত্তম ও অধম তথা সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত শ্রেণী—দুটো গ্রুপে বিভক্ত করা হয় মানব সাধারণকে। কারণ একটা অনৈসলামী সমাজে সমাজপতিরা হয় স্বেচ্ছাচারী

চরিত্রের তারা স্বীয় স্বার্থকে দেখে সবকিছুর ঊর্ধে। কাউকে সুবিধা দেয়া আর কাউকে অধিকারহত করাই হয় তাদের স্বভাব।

আল কুরআন হয় যে সমাজের দিকনির্দেশক, সেই ইসলামী সমাজে মানবতা আর মানবাধিকার রক্ষিত থাকে গোটা সমাজব্যাপি। সেখানে আল্লাহর হকের চেয়ে বান্দার হকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় সর্বাধিক। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জীবনযাপন প্রণালীও দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গভাবে। আল্লাহর বিধানে যেমন ভেদাভেদ নেই সাদা মানুষ আর কালো মানুষে, ঠিক তেমনি এতে পার্থক্য নেই নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকারে। বরং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্বামীর উপর। এতে নর হত্যাকে যতটুকু পাপ নারী হত্যাও ঠিক ততটুকুই পাপ। অধিকন্তু আল্লাহর সৃষ্টিরাজিকে ভালবাসা মুমিনের কর্তব্য। ইসলামী বিধান যেমন মানব ও জিন জাতির জীবন পথের একমাত্র কল্যাণব্যবস্থা তেমনি একমাত্র ইসলামই সৃষ্টিকূলের প্রকৃত রক্ষাকবচ। তাফহীমুল কুরআনের লেখক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ফিরাউনের মিশর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে কাউকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শাসক-গোষ্ঠীর মর্যাদা দিতো, আর কাউকে অধীন ও প্রজাসাধারণে পরিণত করতো বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু, সে বনী ইসরাঈলের জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য কার্যকর নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। তাদের বংশের পুত্র সন্তানকে হত্যা করার কারণে তাদের স্ত্রীরা ধীরে ধীরে কিবতীদের অধীনে আসতো এবং তাদের গর্ভে ইসরাঈলী নয়—কিব্‌তী সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। এভাবে জাতীয় পর্যায়ে আল্লাহদ্রোহী ফিরাউনীরা ইসরাঈলী নারীদের নাজেহাল করতো।

তাফহীমুল কুরআন তালমূদ থেকে লিখেছে যে, ফিরাউনের সরকার প্রথমত, বনী ইসরাঈলকে তাদের শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমি-ক্ষেত, তাদের ঘরবাড়ী ও বিত্ত-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয়। অতপর তাদেরকে সকল প্রকার পদ ও ক্ষমতা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তারপরও শাসকগণ যখন মনে করলো বনী ইসরাঈল এবং তাদের সম ধর্মের লোক মিশরে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখন তারা ইসরাঈলীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে শুরু করে দেয়, তাদেরকে সব ধরনের ও প্রণান্তকর পরিশ্রম করতে বাধ্য করে ; বিনিময়ে হয় অতি সামান্য পারিশ্রমিক দেয়া হতো, নয়তো কোনো মজুরীই দেয়া হতো না। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ফেরাউনীরা বনী ইসরাঈলকে নির্মম শাস্তি ও

কঠোর আযাব দিতো। ওদের এ আযাবের ধরণই ছিল অমানবিক। তার মধ্যে পুরুষদের নিপাত করে বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা, নারীদেরকে নিজেদের দাসী বানিয়ে ইসরাঈলীদের নাম-নিশানা নিঃশেষ করতে গিয়ে বাস্তবে মহিলাদের উপরই চলতো মানসিক, দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক যাতনা, সর্বোপরী তাদের জাতিসত্তার উপর চরম আঘাত।

❒

ছাব্বিশ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○ فَالْتَقَطَهٗٓ
اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ط اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا
كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ○ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَاتَقْتُلُوْهُ ق
عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ ○ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ
مُوْسٰى فٰرِغًا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَايَشْعُرُوْنَ ۙ○ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى
اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ○ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ○ ع

"আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইংগিতে নির্দেশ করলাম যে, শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক। অতপর যখন তার ব্যাপারে আশংকা করবে তখন তাকে নদীতে ছেড়ে দিবে, তার জন্যে ভয় করবে না চিন্তিত হবে না, আমি তাকে অবশ্যই তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব আর তাকে রসূলদের মধ্যে শামিল করে নেবো। শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের লোকেরা তাকে নদী থেকে তুলে আনলো। পরে যেন সে ওদের দুশমন আর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সান্তরাই তো ছিল অপরাধী। ফিরাউনের স্ত্রী তাকে বললো, শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীলতকারী, একে হত্যা করো না। এতো আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে আমাদের পুত্র বানিয়ে নিতেও পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা পরিণামটা বুঝতেই পারেনি। এদিকে মূসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে উঠলো। আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিলে তো সে ওদের কাছে শিশুর পরিচয় প্রকাশ করেই দিতো। সে শিশুর ভগ্নিকে বললো, "এর পিছে পিছে যাও।" মেয়েটি দূরে থেকে শিশুকে এমনভাবে

দেখতে লাগলো যে, শত্রুরা টেরও পেল না। আমি তো শিশুর জন্য ধাত্রীদের দুধ বন্ধ করে রেখেছি সে কারো স্তনে মুখ লাগাচ্ছিলো না। মূসার ভগ্নি বললো, আমি তোমাদেরকে এমন পরিবারের সন্ধান দেব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং কল্যাণ-কামনা সহকারে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে ? এভাবে আমি মূসাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চোখ জুড়ায় ও সে চিন্তায় কাতর না হয়ে পড়ে। এবং সে যেন জানতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য ; যদিও অনেক লোকই তা জানে না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৭-১৩

যে তিন নারীর মাধ্যমে আল্লাহ্ শিশু মূসাকে ফিরাউনের হাত থেকে বাঁচালেন

যে সময়ে হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হয়েছিল, সে সময়ে বনী ইসরাঈলের ছেলে সন্তানদের ধ্বংস করার স্কীম চলছিল খুব জোরেশোরে। প্রথমদিকে ফিরাউন ও তার সহায়তাকারীরা ধাত্রীদের মাধ্যমে এ কাজ আনজাম দিতো। কিন্তু তাওরাত থেকে জানা যায় যে, ধাত্রীগণ এ কাজে তেমন একটা সহায়তা করতো না। অবশেষে ফিরাউন কিবতীদের এ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে দিল যে, বনী ইসরাঈলীদের ঘরে যে ছেলে শিশু জন্ম নেবে, তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। ঠিক সেই ভয়াবহ সময়েই জন্মগ্রহণ করেন হযরত মূসা আ.। তাঁর ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তিনজন মহিলা—১. মূসা আ.-এর মা, ২. তাঁর বোন এবং ৩. খোদ ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া—এদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পূরণ হয় আর ফিরাউনের সকল নীলনকশা ব্যর্থ হয়ে যায়। হযরত মূসা আ. এতসব বাধা সত্ত্বেও বেঁচে যান।

হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হলে তাঁর মা সর্বক্ষণ আতংকে জড়ো হয়ে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর মায়ের অন্তরে সস্থিরতা ঢেলে দিলেন। বললেন, তুমি ওকে বুকের দুধ পান করাতে থাক। যখন ওর ব্যাপারে আশংকা ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়, তখন শিশুটিকে বিনা দ্বিধায় সিন্দুকে ভরে নদীতে ছেড়ে দেবে। আর ওর জন্যে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা করবে না। আমি ওকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে দেব। তাছাড়া ভবিষ্যতে ওকে আমি রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করবো। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর মাতাকে নিজ সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার নির্দেশ

দানের মধ্যে যে রহস্য লুকায়িত আছে তাহলো ফিরাউন বনী ইসরাঈলদের ছেলে শিশুর ধ্বংসের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, ঠিক সে পন্থায়ই তিনি হযরত মূসা আ.-কে নাজাত দেয়ার জন্য স্থির করেছিলেন।–তাদাব্বুরে কুরআন

আল কুরআনের আয়াতের কথা এ ছিল না যে, সন্তান জন্ম নিলে সাথে সাথে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে। বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, যতদিন কোনো বিপদের আশংকা দেখা না দিবে ততদিন তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক। যখন এর গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিবে, অথবা যদি শিশুর আওয়ায শোনার অথবা অন্য কোনো উপায়ে শত্রুরা শিশুর জন্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিংবা বনী ইসরাঈলের কেউ হিংসা করে যদি সরকারকে জানিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়, তখন কোনোরূপ ভয়ভীতি ছাড়াই শিশুটিকে একটি তাবুতে—সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। বাইবেলে বলা হয়েছে, হযরত মূসা আ.-এর মাতা তাঁকে তিন মাস পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তালমূদে বলা হয়েছে তিন মাসের মাথায় ফেরাউনী সরকার গোয়েন্দা স্ত্রীলোক নিয়োগ দিয়েছিল। তারা নিজেদের সাথে ছোট শিশুকে নিয়ে ইসরাঈলীদের ঘরে যেতো এবং সেখানে গিয়ে তাদেরকে কৌশলে কাঁদিয়ে দিতো। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি কোনো ঘরে কেউ কোনো শিশু লুকিয়ে রাখে তাহলে এ শিশুর কান্না শুনে লুকিয়ে রাখা শিশুটিও কেঁদে উঠবে। এ নতুন পদ্ধতির গোয়েন্দাগিরিতে হযরত মূসা আ.-এর মাতা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিজের সন্তানকে ভাসিয়ে দিলেন নদীর পানিতে। এ পর্যায়ে কুরআন শরীফ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছে যা কোনো ইসরাঈলী বর্ণনায় পাওয়া যায় না। কথাটি হলো এই যে, হযরত মূসা আ.-এর মাতা তাঁকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলার দেয়া আশ্বাস ও তার নির্দেশক্রমে। আল্লাহ পূর্বেই তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন, এ কাজ করলে আমি কেবল তোমার সন্তানকেই বাঁচিয়ে রাখবো না, বরং তাকে আমি আবার তোমারই কোলে ফিরিয়ে আনবো, পরিশেষে তাকে আমি আমার রসূল বানিয়ে দেবো। কেবল আল্লাহর এ আশ্বাসবাণী ও নির্দেশনার প্রতি অবিচল বিশ্বাসই মূসা আ.-এর মাকে নিজ শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার কাজে শক্তি-সাহস যুগিয়েছিল। অন্যথা কোনো মা কি কখনো নিজ শিশু সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারে ?–তাফহীমুল কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআন

হযরত মূসা আ. এভাবে তাঁর মায়ের সচেতন সংরক্ষণ ও সুকৌশল লালন-পালন ব্যবস্থাপনায় তিনটি মাস পর্যন্ত গোপনে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। সর্বশক্তিমান রব্বুল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মূসা আ.-এর মাতা যখন এভাবে গোপনে শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না বলে আশংকা দেখা দিল, তখন তিনি শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর নির্দেশনায় ভরসা করে বাক্সে করে নদীতে—নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। এ নদীটি ইসরাঈলী এলাকা থেকে ফিরাউনের বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। বাক্সটি ভেসে ভেসে ঠিক ফিরাউনের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলো। এদিকে মূসা আ.-এর মায়ের অন্তর অস্থির ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তো শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তবুও তো মার অন্তর কেঁপে উঠলো। মা মূসা আ.-এর বোনকে বললেন, তুমি বাক্সটি দেখতে দেখতে এটির পেছনে পেছনে যেতে থাক। এখান থেকে শুরু হলো মূসা এর বোনের ভূমিকা। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা আ.-এর এ বোনের বয়স ছিল তখন ১০/১২ বছর। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতি। মায়ের নির্দেশ মোতাবেক মেয়েটি শিশু মূসাকে রাখা সেই বাক্সটির প্রতি দৃষ্টি রেখে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগলো। সে খুব সতর্কতার সাথে বাক্সটি দেখতে দেখতে নদীর পাশ দিয়ে এমনভাবে চলছিল যেন কেউ বুঝতে না পারে যে, সে ঐ বাক্সটির অনুসরণ করছিল। অবশেষে বাক্সটি ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

ঐ সময় ফিরাউনের চাকর-বাকররা বাক্সটি ধরে ফেলে এবং তা ফিরাউনের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে, ফিরাউনের স্ত্রী নদীর তীরে পরিভ্রমণে মশগুল ছিল আর চাকর-বাকররা তা দেখতে পেল। পরে তারই নির্দেশে ওটা তুলে নেয়া হয়। বাক্সে একটি শিশু দেখতে পেয়ে তাদের বুঝতে দেরী হলো না যে, এটি কোনো ইসরাঈলীর বাচ্চা। কারণ ঐ সময়টি ছিল ওদের শিশু হত্যা করে ফেলার নির্দেশ কার্যকর হওয়ার সময়কার (ঘটনা)। তাছাড়া বাক্সটি ভেসে আসছিল ইসরাঈলী মহল্লারই দিক থেকে। কাজেই ধারণা করা যেতে পারে যে, কোনো দম্পতি নিজের শিশু-সন্তানকে কিছুকাল লুকিয়ে রেখে লালন-পালন করতে থাকে। পরে ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা হলে শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় এ আশায় যে, হয়তো এতে করে ওর প্রাণ বেঁচে যাবে আর কেউ তাকে তুলে নিয়ে লালন-পালন করবে। এ কারণে কোনো কোনো অনুগত চাকর নিবেদন করলো, স্যার, একে এ মুহূর্তেই হত্যা করিয়ে ফেলুন। এও হয়তো অজগর সন্তান হয়ে থাকবে। কিন্তু ফিরাউনের স্ত্রী তো একজন নারী। সম্ভবত সন্তানহীনা নারী ছিলেন। আর শিশুটা

ছিল অত্যন্ত সুদর্শন। যেমন সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা আ.-কে বলেছিলেন وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি মুহাব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম (ত্বা-হা ঃ ৩১) অর্থাৎ তোমাকে এমন সুন্দর আকৃতি দিয়ে বানিয়েছিলাম যে, যে-ই দেখবে সে-ই তোমাকে স্নেহ করবে। এ কারণে শিশু মূসাকে দেখে স্থির থাকতে পারলো না। সে বললো, "একে হত্যা করবে না, বরং ওকে লালন-পালন করা হবে। আমাদের হাতে লালিত-পালিত হয়ে যখন সে বড় হবে আর আমরা তাকে নিজেদের পুত্র বানিয়ে নেব। তখন সে যে ইসরাঈলী বংশজাত তা তার মনে থাকবে না। বরং সে নিজেকে ফিরাউনী বংশের একজন মনে করবে। তখন তার যোগ্যতা কর্মক্ষমতা ইসরাঈলীদের পরিবর্তে আমাদেরই কাজে লাগবে।–তাফহীমুল কুরআন

এভাবে হযরত মূসা আ. শিশু অবস্থায় স্বয়ং ফিরাউনের স্ত্রীর আন্তরিকতা ও স্নেহ-মমতায় ফিরাউনেরই ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। তিন মাস পর্যন্ত নিজের মায়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তার প্রতিপালনের পর রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় হত্যা হয়ে যাওয়ার অবস্থার সম্মুখীন হলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতে সেই হত্যার নির্দেশদানকারীর ঘরেই শিশু মূসার প্রতিপালনের ব্যবস্থা হতে থাকে। শিশুটিকে ঘরে এনে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী নিযুক্তির পালা এলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! শিশুটি কোনো ধাত্রীর স্তনই যে মুখে নিচ্ছে না!

এদিকে মূসা আ.-এর বোন অতি সুকৌশলে ভাইয়ের কোনো ধাত্রীর দুধ পান না করার কথা জেনে গেল। সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাজ প্রাসাদের আশপাশে ঘোরাফিরা করতে থেকে জেনে গেল যে শিশুটি (তার ভাই) কারো স্তন মুখে না নেয়াতে ফিরাউনের স্ত্রী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো এবং শিশুটির পসন্দসই কোনো ধাত্রী পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজ নিতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তার মালিক শিশু মূসার বোনটি সোজাসুজি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো এবং বললো আমি এমন এক ভাল পরিবারের খবর দেব কি, যে এ শিশুটিকে অতি যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে এবং কল্যাণ কামনা সহকারে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এ বলে মূসার বোন তার মায়ের সন্ধান দিলে শেষ পর্যন্ত মূসার মা-ই ধাত্রী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। ঠিক এ ঘটনাংশটির প্রতি ইংগিত দিয়েই রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে বলছেন ঃ

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

"এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চোখ ঠাণ্ডা হয় আর সে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে। তাছাড়া যেন দেখতে পায় যে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ১৩

হযরত মূসা আ. তাঁর জন্মকালের সেই অতি ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হওয়া থেকে মহান রাব্বুল আলামীন তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। অধিকন্তু আল্লাহর কুদরত বুঝার ক্ষমতা আছে কার ! যে ফিরাউন সকল ইসরাঈলী নবজাতক হত্যা রাষ্ট্রীয় আইন করে দিয়েছিল। সেই রাষ্ট্রীয় আইন পুরোদমে রাষ্ট্রে জারি থাকা অবস্থায়ই মূসার লালন-পালন হতে থাকে। হতে থাকে স্বয়ং সেই আইন প্রণেতারই ঘরে তারই স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। এখানে মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতী রহস্যের আরেকটি দিক হলো শেষ পর্যন্ত মূসার প্রতিপালনের ভার মূসার মায়ের উপরই ন্যস্ত হলো এবং মূসার মা দুধ খাওয়ালেন নিজের সন্তানকে অথচ সে জন্য ভাতাও পেলেন ঐ শিশুটি হত্যার ঘোষণাকারীর পকেট থেকে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ তাআলার এ হিকমতময় ব্যবস্থার ফলে আরও যে ফায়দা পাওয়া গেল, তাহলো হযরত মূসাকে ফিরাউন তার শাহজাদা বানাতে পারলো না। বরং হযরত মূসা আ. নিজেরই মাতা-পিতা ও ভাই-বোনের মধ্য থেকে লালিত-পালিত হয়ে নিজ বংশের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছিলেন। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য, পৈত্রিক ধর্ম ও স্বীয় জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক মোটেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তিনি একজন ফিরাউনী বা ফিরাউনী নীতিবাদী হয়ে গড়ে উঠার পরিবর্তে তাঁর মনের ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির দিক থেকে একজন ইসরাঈলী হয়েই বড় হয়ে উঠেছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِىْ يَعْمَلُ وَيَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ كَمَثَلِ اُمِّ مُوْسٰى، تَرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَاْخُذُ اَجْرَهَا ـ

"যে ব্যক্তি নিজের রুজী-রোজগারের জন্য কাজ করে এবং এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করাই হয় তার লক্ষ ; সে তো মূসার মায়ের মত—সে নিজেরই সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, আর তার বিনিময়ে মজুরীও গ্রহণ করে।"

অর্থাৎ এরূপ লোক যদিও নিজেরই ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্য কাজ করে ; কিন্তু আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে ঈমানদারী সহকারে কাজ করে, যার সাথেই কোনো কাজ করে তারই হক ঠিকভাবে আদায় করে এবং হালাল রিয্ক দিয়ে নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন করে আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে। এ কারণে সেই নিজের রুজী-রোজগার করার জন্যও আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করার যোগ্য। ফলে সে রুজীও হাসিল করলো আবার সওয়াব এবং পুরস্কারও লাভ করলো।"—তাফহীমুল কুরআন

❐

সাতাইশ

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

"যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের কাছে এলো, তখন তাদের আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা বললো, ভয় করো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই ; তবে তোমার স্ত্রীকে নয়। সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এ জনপদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করবো। কেননা এরা পাপাচার করছিল।"
–সূরা আনকাবূত ঃ ৩৩-৩৪

কওমে লূতের অভূতপূর্ব নাফরমানী সমর্থন করায় নবী-পত্নী আল্লাহর গযবে পতিত হলো যেভাবে

হযরত লূত আ.-এর কওম চরিত্রহীনতার এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কেউ কোনোদিন করেনি। তারা কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির বিপরীত নারীর পরিবর্তে পুরুষের কাছে গমন করার জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত লূত আ.-কে পাঠালেন। হযরত লূত আ. তাদের অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য চরম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা হলো, অবাধ্য কাওমে লূতকে ধ্বংস করে দেয়ার।

একদা আল্লাহ তাআলা একদল ফেরেশতা পাঠালেন ওদের শাস্তি দেয়ার জন্যে। ফেরেশতারা সুশ্রী বালকের ছবি ধরে হযরত লূত আ.-এর বাড়ীতে গেলেন। ইতিমধ্যে ঐসব ফেরেশতাদের গ্রামের দুষ্ট লোকেরা মানুষ ভেবে দৌড়ে আসলো তাদের কুমতলব চরিতার্থ করার মানসে। হযরত লূত আ. তো ফেরেশতাদের দেখেই চরম অস্থিরতায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন এ মেহমানদের যদি সেখানে থাকতে দেয়া হয়, তাহলে সেই চরিত্রহীন

দুষ্ট জাতির লোকদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে মেহমানদের সেখানে থাকতে দেয়া না হলেও তা হবে নিতান্ত অভদ্রতা ও সৌজন্য পরিপন্থী। তাছাড়া এ বিদেশী মুসাফিরদেরকে নিজের ঘরে থাকতে না দিলে, তাদেরকে অন্য কোথায়ও রাত যাপন করতে দিতে হবে। আর সেটা হবে নিজের হাতেই তাদেরকে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়ার মতো। পুরো ঘটনাটি সবিস্তারে বলা হয়েছে সূরা হূদ, আল হিজর ও আল কামার-এ। সেসব স্থানে বলা হয়েছে এ সুদর্শন বালকদের আগমনের খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে শহরের অগণিত লোক হযরত লূত আ.-এর বাড়ির উপর চড়াও হলো এবং অশ্লীল কর্মের জন্য বালকদেরকে ওদের কাছে সোপর্দ করার দাবী জানাতে থাকে।

সূরা হূদ-এ স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, লোকেরা যখন হযরত লূত আ.-এর বাড়ীতে ভীড় জমিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিল, তখন তিনি আগত মেহমানদেরকে দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না বলে মনে করলেন এবং নিরুপায় ও দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ -

"হায় আমার হাতে যদি তোমাদের দমন করার শক্তি থাকতো, কিংবা কোনো শক্তিমানের সাহায্য যদি পেতাম।"

তখন ফেরেশতাগণ বললেন ঃ

يَا لُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ -

"হে লূত! আমরা তো তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কিছুতেই তোমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।"

অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তোমার অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ দুষ্ট লোকেরা আমাদের কোনো ক্ষতি বা সৃষ্টির অসুবিধা করতে পারবে না। ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য কোনো চিন্তা করো না, ফেরেশতারা এ সময় হযরত লূতকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা মানুষ নন, মানুষের বেশে ফেরেশতা তাঁরা। এ জাতির উপর আযাব নাযিল করার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে।"—তাফহীমুল কুরআন

হযরত মাওলানা আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হাক্কানী দেহলভী রহ. তাঁর তাফসীর 'তাফসীরে ফাতহুল মান্নান' (তাফসীরে হাক্কানী) তে উল্লেখ করেন ঃ

মানুষরূপী ফেরেশতারা হযরত লূত আ.-এর ঘরে এখনো শুইতে যায়নি —এমন সময় শহরের আবাল-বৃদ্ধ বহু লোক এসে তাঁর ঘর ঘেরাও করে

ফেলে। আর বলে এসব মেহমানদের আমাদের সোপর্দ করো। হযরত লূত আ. দরজা খুলে বাইরে গিয়ে তাদেরকে সাধ্যমত বুঝালেন যে এরা তো আমার মেহমান। দুষ্ট লোকেরা এবার ধমক দিয়ে বললো, তুমি কি এখানে বসবাস করার ইচ্ছে রাখ, না কি শাসন করতে এসেছো। এই বলে তারা দরজা ভেংগে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো। ফেরেশতারা লূত আ.-কে টেনে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর ওদেরকে অন্ধ করে দিলেন। ওরা দরজা খুঁজতে খুঁজতে থেমে গেল। তখন মেহমানরা লূত আ.-কে বললেন, আপনি ভীতসন্ত্রস্ত হবেন না, আমরা তো ফেরেশতা। আমরা এসেছি এ শহরকে ধ্বংস করার জন্যে। আপনি ভোর হওয়ার পূর্বেই নিজের লোকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। লূত আ. ভোর হওয়ার পূর্বেই বেরিয়ে পড়লেন। সূর্যোদয়ের সময় সাদুম ও আমুরায় গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করা হলো। তাঁর স্ত্রী পেছনে ফিরে গেলে ওখানেই জমে গেল।–তাফসীরে হাক্কানী

আলোচ্য আয়াত দুটোতে হযরত লূত আ.-এর কওমের পরিণতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে অতিসংক্ষেপে। আয়াতগুলোর মাফহুমের আলোকে পূর্বোক্ত আলোচনা করা হয়েছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.-এর তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' থেকে নিম্নে মূল বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

হযরত লূত আ.-এর জাতির মধ্যে সব ধরনের অনাচার অপকর্ম ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল তার মধ্যে প্রধান অনাচারটি ছিল তারা সমকামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল—যা ইতিপূর্বে কোনো মানুষের মধ্যে ছিল না ; এমনকি অদ্যাবধি কোনো পশুর মধ্যেও সংঘটিত হয়নি। তাদের পুরুষে পুরুষে সমকাম ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নোংরা ধরনের এক বিরল কুকর্ম—যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের স্বভাব ও প্রকৃতির সার্বিক বিকৃতিরই লক্ষণ। নারীর সাথে যৌন সম্পর্কে ও স্বভাবের বিকৃতি ঘটতে পারে, যদি তা শালীনতা ও পবিত্রতার সীমা অতিক্রম করে যায়। সে ক্ষেত্রেও যৌন সম্পর্ক অশ্লীল অপরাধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারপরও তা স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত নযীরবিহীন বিকৃতি সমগ্র জীব জগতের স্বাভাবিক নিয়ম লংঘনের শামিল। ওটা মানসিক ও দৈহিক—উভয় ধরনের বিকৃতি। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের স্বাদ ও আনন্দকে জীবনের বৃহত্তর ধারাবাহিকতার সাথে এবং এ মিলনঘটিত প্রজাতিক বিস্তৃতি ও বংশ বৃদ্ধির সাথে সমন্বিত করেছেন। আর স্বামী ও স্ত্রী—উভয়কে এ মিলনের আনন্দ উপভোগ করার শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতাও তেমনি সমন্বিতভাবে দান করেছেন। কিন্তু একই লিংগধারী দু ব্যক্তির

অস্বাভাবিক যৌন মিলনের যেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই তেমনি এ কাজের ভেতর স্বাভাবিক স্বাদ-আনন্দও নেই। যদি কেউ এতে কোনো স্বাদ ও আনন্দ পায়, তবে বুঝতে হবে যে সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা থেকে তার যোগসূত্র চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার এমন রুচীবিকৃতি ঘটেছে যে, তাকে আর কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন বলা যায় না।

তাদের আর একটি দুষ্কর্ম ছিল সড়ক পথে ডাকাতি ও রাহাযানি। পথচারীদের টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি ছাড়াও তাদের উপর পাশবিক বলাৎকার করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছিনতাই, লুণ্ঠন এবং দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি ইত্যাদি তাদের সমকামকে ব্যাপকতর করার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

ওদের এ সমকামিতার কাজটা তারা করতো প্রকাশ্যে, সম্মিলিতভাবে ও সর্বসম্মতভাবে। কেউ কাউকে দেখে লজ্জা বা সংকোচবোধ করতো না। এভাবে তারা অশ্লীলতা, স্বভাব বিকৃতি, রুচীবিকৃতি ও ধৃষ্টতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের সংশোধনের আর কোনো আশা বাকী ছিল না।

হযরত লূত আ. প্রথম দিকে তাদেরকে মিষ্টভাষায় সদুপদেশ দিচ্ছিলেন এবং অশ্লীলতা পরিহার করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের অপকর্মের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অবশেষে তিনি তাদের অপকর্মের জঘন্যতা বুঝাতে থাকেন এবং সে কারণে আল্লাহর আযাব আসার ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর হতভাগা জাতির একটি মাত্র জবাব ছিল এই যে, 'তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো।'

তাদের একথার মাধ্যমে তাদের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাহলো সাবধান করার মুকাবিলায় চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধ্যতা প্রদর্শন ; নবীর ভীতি প্রদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্তকরণের সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ প্রদান এবং এমন এক বিদ্রোহ যা পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পথে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। হযরত লূত আ. অনেক বুঝালেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। অবশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে চূড়ান্ত সাহায্যের আবেদন জানালেনঃ

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ -

"হে রব! ফাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করো।"–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত লূত আ.-এর দোয়া কবুল হলো। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যের জন্য এবং দুষ্কৃতকারী কওমের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতাগণের আগমনের পরে ওদের ভীড় জমানোর আর লূত আ.-এর বিচলিত ও অস্থির হওয়ার বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত লূত আ.-কে ফেরেশতাগণ বললো, আপনি ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না। আমরা আপনাকে আর আপনার স্বজনদের রক্ষা করবো। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে নয়। কারণ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত দুটোতে সেই জনপদের ও তার সমগ্র অধিবাসীর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে হযরত লূত আ. ও তাঁর মুমিন সাথীরা রক্ষা পেয়েছিলেন। কাঁদামাটি মাখা পাথর বৃষ্টির মাধ্যমে এ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব এটা ছিল আগ্নেগিরির অগ্নুৎপাত জাতীয় ঘটনা—যা গোটা এলাকাকে ওলট-পালট করে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ ধরনের গলিত লাভা বর্ষণ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।

সেই ধ্বংসযজ্ঞের লক্ষণগুলো এখনো বিদ্যমান। চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী পরিস্ফুট রয়েছে যুগ যুগ ধরে। বস্তুত নোংরা ও বিকারগ্রস্ত বিষবৃক্ষরূপী এ ঘৃণ্য মানবগোষ্ঠীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ও বংশ বিস্তারের কোনো যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট ছিল না। শুধু ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ছিল ওদের একমাত্র অনিবার্য পরিণতি।–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী তাঁর থেকে পৃথক ছিল। ফলে সেও অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ লূত আ.-এর স্ত্রীর অভিরুচী ছিল সে দেশের দুষ্কৃতকারী লোকদের মত। সে ওদের যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, অপরাধ ও বিকৃতির সমর্থক ছিল। লূত আ.-এর কাছে কোনো মেহমান আসলে সেই মহিলাই এলাকাবাসীকে জানিয়ে দিতো এবং ওদেরকে কুকর্মের উৎসাহ যোগাতো। কারো কারো মতে তখনকার ঐ অঞ্চলে পুরুষদের সমকামিতার অনুরূপ মহিলাদের মধ্যেও সমমৈথুনের (مساحقه) রেওয়াজ জারি ছিল। এ মহিলাও তাতে জড়িত ছিল।–আল কুরআন করীম, শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী

নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনাচরণ ছিল নবীর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে তার পরিণতি নবী বিরোধীদের মতই সংঘটিত হলো।

❒

আটাইশ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে পেটে বহন করেছে। তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে দু বছর। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। আর যদি তারা আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের সে কথা কিছুতেই মেনে নেবে না। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে যাবে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪-১৫

পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করে যেতে হবে এমনকি শির্ক করতে বাধ্য করলেও

পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করা সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। এমনকি তাঁরা যদি সন্তানকে শিরকের প্রতি বিশেষ চাপ প্রয়োগও করে, তখন তো তাদের সেই কথা মেনে নেয়া যাবে না ঠিক, কিন্তু এজন্যে তাদের সাথে কোনোরূপ অসদাচারণ করা যাবে না। মাতা-পিতা যদি মুশরিক-কাফেরও হন, তবুও তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে সদাচারণ করতে হবে। তাঁরা নিজেরা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লে অথবা সন্তানকে শিরক করতে বাধ্য করলে তাঁদের একথা মেনে নেয়া ঈমানের পরিপন্থী বিধায় তা কখনো মানা যাবে না। অবশ্য সেজন্যে তাঁদের প্রতি সামান্যতম অসদাচারণও প্রদর্শন করা যাবে না। বরং তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করে চলতে হবে।

পিতার ইহসানসমূহ তো বয়প্রাপ্ত হওয়ার পরে দেখা যায়। তিনি সন্তানকে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি। আর মাতা

তো সন্তানের অচেতন অবস্থা থেকেই তার প্রতি ইহসান করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে মায়ের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা এবং সন্তানের জন্য অকাতরে সর্বশক্তি ব্যয় করে দেয়ার বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাব্বুল আলামীন মায়ের প্রতি ইহসান করার জোর তাগিদ দিচ্ছেন এই বলে ঃ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ –তার মা তাকে পেটে বহন করেছে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে। কারণ সন্তান পেটে থাকাবস্থায় সময় যত অতিবাহিত হয়েছে শিশুর দেহ ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মায়ের কষ্ট ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পরেও দীর্ঘ দু আড়াই বছর মা তাকে সাথেই রেখেছে—তার থেকে পৃথক হতে পারেনি। মা তাকে দুধ পান করিয়েছে, নিজের সাথে রেখে ঘুমাতে দিয়েছে। অতপর দুধ পান করানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর মা থেকে পৃথক হয়েছে। এত দীর্ঘ সময়েও মা বেচারীর উপর কত কষ্টই না পতিত হয়েছে—মায়ের কষ্টের কি আর সীমা আছে ? ভীষণ শীতের রাতেও এ শিশু কতবার পায়খানা পেশাব করেছে আর মা শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা স্থানে শুয়ে শিশুকে শুকনো স্থানে শোয়ায়ে দুধ পান করিয়েছে। তারপর এক মুহূর্তের জন্য শিশুর কোনো কষ্ট দেখলে অস্থির হয়ে মা তার কষ্ট বিদূরণে পেরেশান হয়ে যেতো।–তাফসীরে হাক্কানী

হাদীসে রসূল থেকে জানা যায় যে, রসূলে করীম স.-কে এক ব্যক্তি 'খিদমত ও সদ্ব্যবহারের কে অধিক হকদার' প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার মা, লোকটি বললো তারপর কে ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ স. এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। অতপর চতুর্থ বারের একই প্রশ্নের জবাবে রসূল স. জবাব দিলেন, তোমার পিতা।"

আরেক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।–তিরমিযী

অবশ্য মাতা-পিতা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো নির্দেশ দিলে তা মান্য করা যাবে না। এতে মা-বাপ যতই চাপ প্রয়োগ করুক, অথবা যতই নাখোশ হোন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিপরীত কাজে মাতা-পিতার হুকুম মানা ফরয নয় বরং এমতাবস্থায় তাঁদের হুকুম অমান্য করা কর্তব্য। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সেই অবস্থায়ও দুনিয়ার জীবনে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য। তারা মুশরিক বা কাফির হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। আল কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তাঁদের সাথে বিনম্র আচরণের সাথে দিন কাটাবে। তাঁরা কাফির-মুশরিক হলেও অবশ্যই তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা, খানা-পিনার ব্যবস্থা ইত্যাদিতে কোনো ত্রুটি করা যাবে না।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, কুরাইশদের চুক্তির মেয়াদকালে একদা আমার মা আমার কাছে এসেছিলেন। তখনও তিনি মুশরিকা ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বললাম, "আমার মা এসেছেন, তিনি তো ইসলাম বিদ্বেষী। এখন আমি কি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করবো ?" তিনি বললেন, হাঁ, তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করো।

মুফাসসিরীন এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. যখন মুসলমান হলেন, তখন তাঁর মা কসম করে বললেন, আমি রোদ থেকে উঠে যাব না আর খানা খাব না—যতক্ষণ না সাদ ইসলাম ত্যাগ না করে। তখন সাদ রা. বললেন, আমি কখনো ইসলাম ত্যাগ করবো না। এভাবে তিনটি দিন অতিবাহিত হলো। বিষয়টি নবী করীম স.-এর কর্ণগোচর করা হলে এ আয়াত وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ الاية অবতীর্ণ হয়েছে যে, মায়ের এ হুকুম পালন করা যাবে না। এ ধরনের অবস্থা অর্থাৎ ইসলাম পরিপন্থী বিষয়ে মাতা-পিতার হুকুম মানা যাবে না।–তাফসীরে হাক্কানী

❒

উনত্রিশ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ط -

"নবী মুহাম্মদ স. মুমিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়ে ঘনিষ্টতর আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৬

মুহাম্মদ স.-এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা হওয়ার তাৎপর্য

এ হচ্ছে সূরা আল আহযাবের ষষ্ঠ আয়াতের অংশ বিশেষ। সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবীয়্যীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুমিনগণের সম্পর্ক কি ধরনের এবং তিনিই বা মুমিনগণের জন্য কতটুকু কল্যাণকামী ও হিতাকাংখী—এখানে মুমিনগণের দুনিয়ার জীবনে অনুসরণীয় সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আলোচিত দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো, নবী করীম স. মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী। অর্থাৎ মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই তো দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধে নিজের স্বার্থকেই বেশী করে দেখে থাকে। মুমিনগণও স্বাভাবিকভাবেই নিজের কল্যাণকে অন্যসব কিছুর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এদিক থেকে মুমিনদের সাথে নবীর সম্পর্ক অতি আশ্চর্যজনকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ, একজন মুমিন স্বাভাবিকভাবে তার নিজের জন্য যতটুকু কল্যাণকামী, নবী করীম স. সেই মুমিনের জন্য তার চেয়ে অধিক কল্যাণকামী।

বিষয়টি বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

মুসলমানদের সাথে নবী করীম স.-এর এবং নবী করীম স.-এর সাথে মুসলমানদের যে সম্পর্ক—তা সকল প্রকার মানবীয় সম্পর্কের উর্ধে একটা ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক। নবী করীম স. এবং ঈমানদারদের মধ্যকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সাথে দুনিয়ার অপর কোনো আত্মীয়তা বা সম্পর্কের কোনো তুলনা হতে পারে না। নবী করীম স. মুসলমানদের জন্য তাদের মাতা-পিতা অপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যপূর্ণ ও দয়ার্দ্র এবং তিনি তাদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। তাদের পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে ওরা স্বার্থপরতার আচরণ করতে পারে, ওরা তাদেরকে গোমরাহ করতে পারে, ওরা তাদের দিয়ে ভুল কাজ করাতে পারে, ওরা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু

নবী করীম স. তো তাদের কেবল তাই করেন যাতে তাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। তাছাড়া তারা অজ্ঞতার কারণে নিজেদের পায়ে কুঠার চালাতে পারে, নিবুর্দ্ধিতার কারণে নিজেদের হাতেই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে অথচ নবী করীম স. তাদের জন্য কেবল সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন যাতে সত্যিই তাদের কল্যাণ হতে পারে। প্রকৃত অবস্থা যখন এমনি ধরনের, তখন মুসলমানদের উপর নবী করীম স.-এরও এ অধিকার রয়েছে যে, তারা তাঁকে নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসবে। দুনিয়ার সবকিছুর তুলনায় তাঁর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা ও দরদ অনুভব করবে। নিজের মতের চেয়ে তাঁর মতকে এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর তাঁর সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিবে, তাঁর প্রত্যেকটি নির্দেশের সামনে মাথানত করে দিবে।

নবী করীম স. একথাটি বলেছেন সেই হাদীসে যা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি হলো ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

"তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার মাতা-পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হবো।"–বুখারী

আয়াতে আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, "নবী করীম স.-এর স্ত্রীগণ মুমিনগণের মাতা।" নবী করীম স.-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, মুসলমানদের মুখ-ডাকা মা কোনো দিক দিয়েই মা নাহলেও রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ তাদের জন্য ঠিক আপন মায়ের মতই হারাম। এ বিশেষ ব্যবস্থা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র নবী করীম স.-এর ব্যাপারেই গ্রহণ করা হয়েছে, অপর কারও এ বৈশিষ্ট্য নেই।

এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরতের স্ত্রীগণের মুসলমানদের মা হওয়ার অর্থ এই যে, তাদেরকে ঠিক আপন মায়ের মত সম্মান-শ্রদ্ধা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব, তাঁদের সাথে কোনো মুসলমানের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য কোনো ব্যাপারেই তাঁরা আপন মায়ের মত নন। যেমন, তাদের আপন আত্মীয় ছাড়া অন্যসব মুসলমানই তাঁদের জন্য গায়রে মুহরিম ; তাঁদের সাথে পর্দা করা ওয়াজিব ছিল, তাঁদের কন্যা সন্তানগণ মুসলমানদের আপন বোন ছিলেন না— যাদের বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না ; তাঁদের ভাইবোন

মুসলমানদের মামা-খালার মত ছিলেন না এবং আপন মায়ের সম্পত্তি থেকে যেমন মীরাসের অংশ পাওয়া যায়, তাঁদের মীরাস থেকে তা পাওয়া যেত না।-তাফহীমুল কুরআন

উপরোক্ত আয়াতাংশের শেষে হযরত ইবনে মাসউদের কেরাতে আরও একটি বাক্যাংশ অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। তাতে আছে ঃ

وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ ـ

"তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা আর তিনি তাদের (ধর্মীয়/রূহানী) পিতা।"

মুজাহিদ বলেন, প্রত্যেক নবীই উম্মতের পিতা ; আর এজন্যেই সকল উম্মত পরস্পর ভাই ভাই। অর্থাৎ সমস্ত ঈমানদার একই রূহানী পিতার (নবীর) সন্তান।

অন্যত্র আল্লাহ যা বলেছেন ঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ ـ মুহাম্মদ স. তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন—তা পূর্বের বাক্যাংশ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ (তিনি তাদের পিতা) কথাটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ এখানে পিতা হওয়া আর নবীর স্ত্রীগণ মাতা হওয়ার অর্থ রূহানী মাতা-পিতা—বংশীয় মাতা-পিতা নয়। আর এ আয়াতে তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয় বলে বংশীয় পিতা না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর একথা তো সবারই জানা যে, পিতা বলতে সাধারণত বংশীয় পিতা বা দৈহিক পিতাকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

আয়াতে وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ (আর নবীর স্ত্রীগণ মুসলমানদের মাতা) বলার অর্থ যেভাবে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য মায়ের সম্মান ও আদব রক্ষা করা ওয়াজিব তেমনি নবীর স্ত্রীগণের প্রতি আদব-সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব এবং মায়ের সাথে বিবাহ যেমন হারাম, তেমনি নবী পত্নীদের সাথেও হারাম। কিন্তু নবী পত্নীগণের কন্যাগণ এ হুকুমের মধ্যে শামিল নন। তাদের সাথে তো মুসলমানদের বিবাহ জায়েয।-তাফসীরে হাক্কানী এ আয়াতাংশে পুণ্যবতী নবী পত্নীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ ভক্তি শ্রদ্ধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা মায়ের অন্তর্ভুক্ত, মা-ছেলের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম—যথা পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। কিন্তু মুহরিম হওয়ার প্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসের অংশীদার হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।-মাআরেফুল কুরআন

❐

ত্রিশ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য পেতে চাও, তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতের ঘর চাও, তবে জেনে রেখ ; তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"–আল আহযাব ঃ ২৮-২৯

নবী পত্নীদের দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগের অভিন্ন সিদ্ধান্ত

আলোচ্য আয়াতগুলোতে নবী করীম স.-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাদের কোনো কথা ও কাজের দ্বারা রসূলে করীম স.-এর প্রতি কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে।—এ বিষয়ে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব দেন। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তাঁরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকেন। এখানে নবী পত্নীদের তালাক গ্রহণের অধিকার গ্রহণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এমন ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় যা ছিল নবী করীম স.-এর মর্জির পরিপন্থী, যাতে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ পান। তন্মধ্য হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি ঘটনা হযরত জাবের রা.-এর রেওয়ায়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো, একদিন রসূলুল্লাহ স.-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ তাঁর খেদমতে সমবেতভাবে হাজির হয়ে তাঁদের জীবিকা ও আনুসংগিক খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবু হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে বাহরে মুহীতে প্রদান করেন। তাহলো আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর ও বনু কুরাইযার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে। এরই

পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ রা. ভাবলেন যে, মহানবী স. হয়তো এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ স. পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্যে রয়েছে অগণিত দাস-দাসী। আমাদের দারিদ্র-পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানী করে আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ স. পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজা-বাদশাদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সৎসংগ ও প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী-গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবী স. যে দুঃখিত হবেন, তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মধ্যে কিছুটা প্রাচুর্যের অভিলাস উদয় হয়েছিল।

ভাষ্যকার আবু হাইয়্যান বলেন, আহযাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী পত্নীগণের রা. এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।–মাআরেফুল কুরআন

এ আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে রা. অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবী স.-এর বর্তমান দারিদ্র পীড়িত চরম আর্থিক সংকটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর স. সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবনযাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথম অবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ তালাক গ্রহণের অবস্থায়ও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না ; বরং সুন্নাত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, যখন অধিকার প্রদান সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে তা প্রকাশ-প্রচারের সূচনা করেন। তিনি আমাকে আয়াতটি শুনানোর পূর্বে বলেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলবো—উত্তরটা কিন্তু

তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে তিনি যে আমাকে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রসূলুল্লাহ্ স. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সাথে সাথেই আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি ? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি।

আমার পরে অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। সবাই আমার মতই তাদের মত ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় দুনিয়ার প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দকে কেউ গ্রহণ করলেন না।-মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের বিষয় তাফহীমুল কুরআনে মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো, একদিন হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. নবী করীম স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন যে, হযরতের পত্নীগণ তাঁর চারপাশে বসে আছেন আর রসূলে করীম স.ও চুপচাপ বসে আছেন। তিনি হযরত ওমর রা.-কে লক্ষ করে বললেন ঃ هن كما ترى يسألنني النفقة "তোমরা এদেরকে যেমন দেখছ, আমার কাছে খরচ-পাতির জন্য অর্থ দাবী করছে।" একথা শুনে হযরত আবু বকর রা. নিজ কন্যা হযরত আয়েশা রা.-কে এবং হযরত ওমর রা. তাঁর কন্যা হযরত হাফসা রা.-কে খুব শাসিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দিচ্ছ! আর এমন কিছু চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই!

বস্তুত নবী করীম স. সে সময় কতদূর আর্থিক অনটনে ছিলেন তা এ ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরের এ কঠিন দ্বন্দ্বের সময় নবী পত্নীগণের খরচ-পাতির অর্থের জন্য চাপ দেয়ার ফলে নবী করীম স.-এর উপর তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নবী পত্নীগণ এ দাবী করার পর আল্লাহর নির্দেশে আলোচ্য আয়াত দুটোর আলোকে তিনি তাঁদের এখতিয়ার বা অধিকার দিলেন যে, তাঁরা চাইলে নবী করীম স.-এর দাম্পত্য ঠিক রেখে চলবেন অথবা তাঁর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে যাবেন। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলে تخيير (তাখ্য়ীর)

এখ্তিয়ার দান। এখতিয়ার পাওয়ার পর নবী পত্নীগণ একে একে সকলেই প্রথমটি অর্থাৎ নবী করীম স.-এর সাথে দাম্পত্যে আবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাঁর স্ত্রীগণের কেউ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তবে তিনি আপনা আপনিই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারতেন না। বরং রসূল তাঁকে আলাদা করে দিলেই তিনি বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচিত হতেন। যেমন মূল আয়াতে বলা হয়েছে "আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই—সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই।" অবশ্য এমতাবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়াই নবী করীম স.-এর কর্তব্য হয়ে পড়তো। কেননা নবী হিসেবে তাঁর নিজের কৃত ওয়াদা পূরণ না করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই শোভা পায় না। এভাবে কোনো স্ত্রী যদি নবী করীম স. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন, তবে তিনি আর 'উম্মুল মুমিনীন'—মুমিনদের মাতা রূপে বিবেচিত হতেন না এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর বিবাহও হারাম হতো না। কেননা তিনি তো দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের জন্যই রসূল স.-এর নিকট থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলেন, আর তাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল।

অপরদিকে আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে। তাহলো রসূলের যে স্ত্রীগণ আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাদেরকে তালাক দেয়ার রসূলের আর কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকলো না। কেননা এখতিয়ার বা বাছাই করার দুটো দিকই মাত্র ছিল। একটি হলো দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী ও স্বাচ্ছন্দ গ্রহণ করলে তাকে আলাদা করে দেয়া হবে। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত চাইলে আলাদা করা হবে না—রসূলের স্ত্রী হিসেবে থাকতে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় যে কেউ এ দুটির একটি গ্রহণ করবে অপরটি তার জন্য আপনা-আপনিই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।–তাফহীমুল কুরআন

নবী পত্নীগণের মানবীয় চাহিদাসমূহ ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। নবী পত্নী হলেও তো তাঁরা ছিলেন মানুষ। নবীর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও তাদের এসব মানবীয় চাহিদা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁরা নবুওয়াতের ঝর্ণাধারা থেকে সিঞ্চিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তাঁদের প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো খতম হয়ে যায়নি। তাই যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও মুমিনগণকে স্বচ্ছলতা ও প্রশস্ততা দান করলেন, তখন নবী পত্নীগণ তাদের খরচ-পাতির দরবার শুরু করে দিলেন। কিন্তু নবী করীম স. তাঁদের এ দাবী-চাহিদা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং মনের অসন্তোষ নিয়েই তাদের এসব দাবীতে সাড়া দিয়েছেন। কারণ

আল্লাহর নবী স. অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতে অভ্যস্থ ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে যখন যে হালে রেখেছেন সেই অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রীগণ যখন সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন দাবী পেশ করলেন, তখন জীবনটা তাঁর কাছে বড়ই কঠিন মনে হলো। অবশ্য তাঁরা কোনো হারাম জিনিসের জন্য দাবী তুলেননি বরং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের মত একটু ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও কিছু সচ্ছল জীবন যাপন করার জন্য যা প্রয়োজন কেবল তাই দাবী করেছিলেন মাত্র—যা দাবী করার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ ছিল না। হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. নিজ নিজ কন্যাকে এই বলে শাসিয়ে দিলেন যে, তোমরা আল্লাহর নবীর কাছে এমন কিছুর দাবী করছো যা তার কাছে নেই এবং দুজনই নিজ নিজ কন্যাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ তাদেরকে থামালেন। তখন তাঁর স্ত্রীগণ কসম করে বললেন, আমরা আর কখনো রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এমন কিছু দাবী করবো না, যা তাঁর কাছে নেই। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, এর পরই আল্লাহ্ তাআলা (আলোচ্য) আয়াত নাযিল করলেন। এতে নবী স.-এর স্ত্রীগণকে এ এখতিয়ার দেয়া হলো যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে কৃচ্ছ্রতা সাধনের জীবন নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে থাকতে পারেন অথবা ভালভাবে মান-সম্মানের সাথে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন। নবী পত্নীগণ সকলেই প্রথম পথ অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ তাঁরা রসূলের দাম্পত্য জীবন ছাড়তে রাজী হলেন না—সকলেই এ অভিন্ন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।–ফী যিলালিল কুরআন

মুফাস্‌সিরীনে কিরাম আলোচ্য আয়াত .... يايها النبى قل لازواجك -এর পটভূমিকা তুলে ধরেছেন এভাবে যে, খায়বার যুদ্ধের পর মুসলমানদের সার্বিক সচ্ছলতা হাসিল হলো, তখন রসূলুল্লাহ্ স.-এর স্ত্রীগণও জীবনের আরাম-আয়েশ সামগ্রীর দাবী পেশ করেন। তাঁদের এ দাবী পেশের প্রেক্ষিতে ধমক স্বরূপ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী রহ. নিম্নোক্ত কারণে উল্লিখিত পটভূমিকাকে দুর্বল বলে তাঁর তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কারণ-গুলো নিম্নরূপ ঃ

১. যদি নবী পত্নীদের দাবী কেবল জীবন-জীবিকার স্বাচ্ছন্দের উদ্দেশ্যেই হতো, তাহলে তা তো এমন কোনো কথা ছিল না, যে কারণে তাঁদেরকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেয়ার নোটিশ দেয়া দরকার ছিল। এ ধরনের কথার জন্য তো কোনো প্রকার সাবধান করার প্রয়োজনই ছিল না। আর প্রয়োজন

থাকলেও তাঁদের কেবল এতটুকু উপদেশ দেয়া যেত যে, নবী স.-এর সান্নিধ্যে থাকতে হলে সবর ও অল্পে তুষ্টির জীবন ধারণ করতে হবে।

২. উম্মাহাতুল মুমিনীন এর ব্যাপারে এমন বদ ধারণা করা যায় না যে, তাঁদের উপর দুনিয়ার আরাম-আয়েশের আগ্রহ এতই জেঁকে বসেছে, যে জন্যে তাঁরা সেই দাবী নিয়ে উঠেপড়ে লেগে যাবেন। আর বিষয়টি এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, এতে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনকে হস্তক্ষেপ করতে হলো। এবং পরিস্থিতি এতদূর গড়ালো যে, উক্ত আয়াতের বর্ণিত নোটিশ পর্যন্ত তাঁদের দিতে হলো !

৩. এখানে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা ছিল হিজরী চতুর্থ বা পঞ্চম সালের সাথে সম্পৃক্ত। এবং খন্দক ও বনু কুরাইযার যুদ্ধের বিষয়াদি আলোচনায় এসেছে। অতপর হযরত যায়েদ রা.-ও হযরত যয়নব রা.-এর ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়। এসব ঘটনাবলীর সম্পর্ক হিজরী পঞ্চম সালের সাথে সম্পৃক্ত। খায়বার তখনো জয় হয়নি। উপরে বর্ণিত আয়াত وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا এর অধীন স্বয়ং মুফাস্‌সিরীনই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এটা ছিল খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ মাত্র।

আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী বলেন, প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াতের নির্ভুল পটভূমিকা হলো—সে যুগে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলাম ও নবী স. সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ব্যাপারে চরম আকার ধারণ করেছিল। তেমনিভাবে মুনাফিক মহিলাদের মাধ্যমে তারা নবী করীম স.-এর পারিবারিক জীবনের শান্তি বিপন্ন করার জন্য এক মারাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তখন মুনাফিক মহিলারা উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মুমিন মাতাদের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় তাদের বলতো, আপনারা তো অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত ঘরের মেয়ে। কিন্তু আপনাদের জীবনটা সব রকমের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত, সম্পূর্ণরূপে কয়েদীদের মতই কাটছে। আপনারা যদি অন্য কোনো পরিবারে থাকতেন তাহলে আপনাদের জীবন সম্রাজ্ঞীদের মত অত্যন্ত আরাম-আয়েশে কাটতো। এছাড়া ওরা আরও ওয়াস্‌ওয়াসা দিতো এই বলে যে, যদি এ লোক (মুহাম্মদ স.) আপনাদের তালাক দিয়ে দেয় তাহলে বড় বড় নেতারা আপনাদের বিয়ে করবে, ফলে আপনাদের জীবন ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও দেখা যাবে যে, মুনাফিকগণ যখনি নবী করীম স.-এর ঘরে যাওয়ার এবং নবী পত্নীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেত, তখনি তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁদের মাঝে

কিছু কিছু হলেও ওয়াস্‌ওয়াসা দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতো। তাদের এ রকম চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল নবী পরিবারে এমন কিছু ফিতনার সৃষ্টি করা যেমন করে তারা হযরত আয়েশা রা.-এর সম্পর্কে অপবাদ দাঁড় করিয়েছিল। সূরা আন নূরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে নবী পত্নীদের মাঝে অন্তত কিছুটা হলেও অস্থিরতা সৃষ্টি করা যাবে। এমনও হতে পারে যে, তারা নবী পত্নীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কুমতলব চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্য পোষণ করতো।

–তাদাব্বুরে কুরআন

মুনাফিকদের এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যদিও নবী পত্নীগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না—এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও ছিল ; কিন্তু ভদ্র, সহৃদয় ব্যক্তি ও বিনম্র স্বভাবের লোকদের অবস্থা এমন যে, যখনি কোনো লোক যদি দয়ার্দ্র হয়ে কল্যাণ কামনার ভাষায় কথা বলে, তখন তিনি ওর ত্রুটির বিষয় জেনেবুঝেও ওর সাথে নম্র আচরণই করে থাকে। উম্মাহাতুল মুমিনীন (মুমিন মাতাগণ)ও নিজের দয়াদ্রতা ও সহৃয়তার কারণে ওদের জবাবে নম্র আচরণই করে যেতেন। এতে ওসব ধূর্ত লোক নিজেদের ষড়যন্ত্র ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে করতো এবং ওরা শীঘ্রই নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়ার আশা করতো। মূলত এমনি এক পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের শোনানোর উদ্দেশ্যেই এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল। কিন্তু ওরা তো ছিল পর্দার আড়ালে, এজন্যে কুরআন ওদের পরিবর্তে নবী ও নবী পত্নীদের উদ্দেশ্য করে যা বলার তা বলে দিয়েছেন। এখানে বালাগাতের সেই নিয়ম স্মরণ করা যেতে পারে যে, অনেক সময় শব্দ দিয়ে হয়ত কাউকে সম্বোধন করা হয় অথচ তাতে এমন ধিক্কার নিহিত থাকে, যার লক্ষ্য থাকে অন্য কারো প্রতি।

উপরোক্ত পটভূমিকা সামনে রেখে আলোচ্য আয়াত দুটোর প্রতি গবেষণা করা যেতে পারে। আয়াতদ্বয়ে নবী করীম স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে নবী ! তুমি স্বীয় পত্নীদের বলে দাও, তোমরা যদি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও তার চাকচিক্য হাসিল করতে চাও, তাহলে এসো ! আমি তোমাদের ভালভাবে বিদায় করে দিচ্ছি। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তার রসূল এবং আখিরাতের সফলতা কামনা করে থাক—তাহলে তোমরা মনে রেখ তোমাদের যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের হক পুরোপুরি আদায়কারী হয় আর আখিরাতের দায়িত্বসমূহ যথাযথ বুঝে নেয় ; আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পারিতোষিক তৈরি করে রেখেছেন।

হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায়, রসূলুল্লাহ্ স. এই এখতিয়ারনামা পবিত্র পত্নীবৃন্দের সামনে রাখলেন। আর সর্বপ্রথম তা রাখলেন তাঁর প্রিয়তমা হযরত আয়েশা রা.-এর সামনে। তিনি তাঁকে এটা বলে দিলেন যে, জবাবদানে যেন তাড়াহুড়া না করেন, বরং এ বিষয়ে যেন তার পিতা-মাতার সাথে আলাপ করে নেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রা. তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে কারো সাথে পরামর্শ করার কি দরকার ? আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করছি। মুনাফিকীন তো সবচেয়ে বেশী যাদু চালিয়েছিল তাঁরই উপর। যখন তাঁর জবাব ওদের সকল আশায় গুড়ে বালি হয়ে গেল তখন আর বাকীদের কি কথা !

এভাবে কুরআনুল কারীম একদিকে পুণ্যবতী নবী পত্নীদের ব্যাপারে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রকে চিরদিনের জন্য ঠাণ্ডা করে দিল। অন্যদিকে এ পরীক্ষার মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ সকলেই আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতের অন্বেষী ছিলেন। এ জিনিসটিই তাঁদেরকে আল্লাহর রসূলের সাথে সংযুক্ত রেখেছিল আর তাঁদের এ সংযুক্তি ছিল অত্যন্ত মজবুত-সুদৃঢ়, যা কোনো লোভ-লালসা ছিন্ন করতে পারছিল না।

উপরোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আলোচ্য আয়াত-গুলোতে পুণ্যবতী নবী পত্নীগণকে এজন্য তিরস্কার করা হয়নি যে, তাঁরা দুনিয়া লোভী ছিলেন—যা লোকেরা মনে করেছিল। বরং তাঁদের এ তাখ্য়ীর বা স্বাধীনতা (ইখতিয়ার) দেয়ার ফলে তাঁদের উচ্চ কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটলো। এতে করে মুনাফিকদের সাহস চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে গেল যে, নবী পত্নীদের কোনো লোভের ফাঁদে ফেলে নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনা কখনো সম্ভব হবে না। অধিকন্তু এ তাখ্য়ীর বা ইখতিয়ারের ঘোষণা দিয়ে যেন সকলের মনোবলের পরীক্ষা করার সুযোগ করে দেয়া হলো। কিন্তু সকলের বেলায় একথাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, নবী স.-এর আহলে বায়ত এর নির্বাচন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং এই ব্যূহে কারো অনাধিকার চর্চা করার কোনো অবকাশই নেই।–তাদাব্বুরে কুরআন

❒

একত্রিশ

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে। তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেরুবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে—তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও হিকমত থেকে যাকিছু তোমাদের ঘরে পঠিত হয় তা স্মরণ রাখবে ; আল্লাহ তো অতি সুক্ষদর্শী সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩২-৩৪

পর্দা ও নারী মর্যাদা সংরক্ষণে নবী পত্নীদের থেকে সূচনায় আল্লাহর কতিপয় নির্দেশ

আলোচ্য আয়াত কটিতে ইসলামী সমাজে পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও নারী মর্যাদা সংরক্ষণের আদেশের সূচনা হয়। এসব আয়াতে বাহ্যত নবী পত্নীদের সম্বোধন করা হলেও এতে করে সমগ্র মুসলিম সমাজে পরিবারের মান-সম্ভ্রম রক্ষা এবং এ বিষয়ে সংশোধন-সংস্কার কার্যকর করাই মূল উদ্দেশ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীদেরকে এসব আয়াতে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, স্বয়ং নবীর ঘর

থেকেই যখন পবিত্র ও সম্ভ্রম জীবন পদ্ধতির সূচনা হবে, তখন সমগ্র মুসলিম পরিবারের স্ত্রীলোকেরা সেই ব্যবস্থার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে শুরু করবে। কেননা এ ঘর ও পরিবারই ছিল তাদের সকলের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়। কিন্তু আয়াতে নবী পত্নীদের সম্বোধন করা হয়েছে বিধায় কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাদি কেবল তাঁদের জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কোনো নারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত সমস্ত নির্দেশ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যা কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণই পালন করতে বাধ্য। অন্যান্য মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে তা পালন করা কর্তব্য বা বাঞ্ছনীয় নয়। তখন তো আয়াতের অর্থ হতো এই যে, কেবল নবীর স্ত্রীগণই অপর পুরুষের সাথে কথা বলতে কোমলতা পরিহার করবে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে—অন্য কোনো মহিলার জন্যে তা কর্তব্য নয়। এমন হুকুম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিতে পারেন কিভাবে ? তা যদি না হতে পারে, তবে নিজেদের ঘরে আসন গেড়ে বসা, জাহেলী যুগের নগ্নতা, অশ্লীলতা পরিহার করা এবং ভিন পুরুষের সাথে কোমল কথা না বলার হুকুম কেবল তাঁদেরই জন্য কি করে খাস হতে পারে ? আর অন্যান্য মুসলিম নারী এ হুকুম থেকে কি করে মুক্ত থাকতে পারে ? একই ধারাবাহিকতায় বলা কথা সমষ্টির মধ্যে কোনো কোনো কথা বিশেষ লোকদের জন্য এবং কোনো কোনো কথা সাধারণ লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করার পেছনে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে ?–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে আল্লাহর বাণী لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ 'তোমরা অন্য নারীদের মত নও'—এ বাক্যাংশের অর্থ কখনও এরূপ হতে পারে না যে, সাধারণ নারীরা তো বিভিন্ন রঙীন সাজে সজ্জিত হয়ে ভিন পুরুষের সাথে খুব মন গলানো কথাবার্তা বলে বেড়াবে ; কিন্তু তোমরা এমনটি করবে না। বরং আল্লাহর একথার অর্থ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন একজন ভদ্রলোক নিজের ছেলে-সন্তানদের লক্ষ করে বললো, "তোমরা তো হাট-বাজারের ছেলেমেয়ের মত নও, গালি-গালাজ করা তোমাদের জন্য শোভা পায় না।" এরূপ কথা থেকে কোনো বুদ্ধিমান লোকই এ অর্থ গ্রহণ করে না যে সেই ভদ্রলোক কেবল নিজের ছেলে-সন্তানদের জন্যই গালি-গালাজ করা অন্যায় বলে মনে করে, অন্য ছেলেদের বেলায় গালমন্দ বলা তার কাছে কোনো আপত্তিকর বিষয় নয়। সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতাংশের

নির্দেশটিও কেবল নবীর স্ত্রীদের জন্যই খাস নয়, বরং এ হুকুম সমগ্র মুসলিম নারীকুলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য।-তাফহীমুল কুরআন

মুফতী শফী রহ. তাঁর তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলেন, আলোচ্য আয়াতগুলোতে নবী পত্নীদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং তাঁদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়াত দান করা হয়েছে। এসব হেদায়াত যদিও রসূলের পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মুসলিম নারীগণের প্রতিই নির্দেশিত। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তাঁদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আ'মাল ও আহকাম সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই এগুলোর প্রতি নবী পত্নীদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

আয়াতে لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ 'তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও' বলে নবী পত্নীদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করার পর বলা হয়েছে اِنِ اتَّقَيْتُنَّ। অর্থাৎ "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" এ শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যেন তারা নবীজীর স্ত্রী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাঁদের তাক্ওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়্যার অনুসরণ অনুকরণ।-কুরতুবী ও মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিম নারীকুলের সম্ভ্রম সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নবী পত্নীদের সম্বোধন করে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। এক. নারীদের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত রাখা। অর্থাৎ যদি পর্দার মধ্যে থেকে কোনো পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তবে বাক্যালাপের সময় নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। এর মানে নারী কণ্ঠের কোমলতা ও মুধরতার আকর্ষণীয় আওয়ায যা পুরুষ শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত লোভ-লালসা বা কামভাবের সঞ্চার করে তোলে। অন্তরে ব্যাধি থাকা লোকেরা তো এমনিতেই কুবাসনায় মেতে উঠে। এমনকি দুর্বল ঈমানের লোকেরাও এতে আকৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ হেদায়াতের মর্মার্থ হলো, নারীরা যেন পর পুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করে যাতে কোনো দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে নারীর মধুর আওয়াযে কোনো কামনা ও লালসার উদ্রেক না করে বরং তার নিকটেও না পৌছে। উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মুমিন-মাতাদের উপরোক্ত হেদায়াত দেয়ার পর তাঁদের কেউ

যদি পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তবে তাঁরা মুখে হাত দিয়ে কথা বলতেন—যাতে করে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যেত। হযরত আমর ইবনুল আস রা. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

দুই. নারীদের স্বাভাবিক অবস্থান হবে তাদের গৃহে। আয়াতে বলা হয়েছে وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং প্রাচীন জাহেলীয়াতের নারীদের মত সাজগোজ করে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না।

এ আয়াতে মূলত নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিগত পার্থক্য সার্বিক সামর্থ ও জন্মগত কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব ক্ষেত্র বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নারীগণ তাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন ব্যাপদেশে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। এর অর্থ এ নয় যে, কোনো অবস্থাতেই তারা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। সংগত কারণে শরয়ী প্রয়োজনে তারা বাইরেও বের হতে পারবে। তবে বের হওয়াটা অবশ্যই শালীনতা ও শরয়ী পর্দা সহকারে হতে হবে। যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগের মহিলাদের ন্যায় শরীরটাকে সাজগোজ করে আকর্ষণীয়রূপে বের না হয়। আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—বলা হয়েছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে পরিপাটি হয়ে বেরুবে না। পরপুরুষদের সামনে রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। একথারই সামনে আরেকটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ "সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" নারীগণ প্রয়োজনের তাগিদে বাড়ী থেকে বেরুবে, তবে যেন দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বের হয়। যেন বোরকা বা সমস্ত শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে এ সূরার ৬০ আয়াতে। يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বোরকা পরিধান করা এবং চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপরে টেনে দেয়ার নির্দেশনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে চেহারার উপরে নেকাব পরার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নেকাব ছাড়া শুধু বোরকা ও বড় চাদর ব্যবহার যথার্থ হতে পারে কিভাবে ? বস্তুত নারী দেহের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ তো তাদের চেহারাতে ফুটে উঠে। পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো সামাজিক শান্তি

ও নিরাপত্তা বিধানের কার্যকর ব্যবস্থা করা। যাবতীয় অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও যৌন অনাচার থেকে নারী সমাজের হেফাযত করা। আর এসবের সূচনা হয়ে থাকে সাধারণত নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে। আর এ আকর্ষণ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান নারী অংগ হলো তাদের চেহারা। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রেখে বোরকা বা বড় চাদর পরিধান করা পর্দার উদ্দেশ্য সাধনের কতটুকু সহায়ক হতে পারে ?

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত নারী সমাজের জন্য তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়াত হলো সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা।

উপরোক্ত পাঁচটি হেদায়াত সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এগুলোর মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আওতা বহির্ভূত নয়। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত বাকী দুটো হেদায়াত সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়—বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য আল্লাহর হুকুম ; যদিও আয়াতের শুরুতে নবী পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।–মাআরেফুল কুরআন

আয়াতে কুরআনীতে নারীদের সেজেগুজে আকর্ষণীয় রূপ পরিগ্রহ করে ঘরের বাইরে গিয়ে প্রদর্শনী করাকে আল্লাহর ভাষায় جَاهِلِيَّت اُوْلٰى প্রাচীন জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসের ভাষায় এসব নারীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, ওদের অবস্থা হলো كَاسِيَات عَارِيَات مميلات مائلات অর্থাৎ পোশাক পরিধান করেও উলংগ থাকবে ; রূপ-সৌন্দর্য ও সাজগোজ করে ওরা পর-পুরুষকে নিজের দিক আকর্ষিত করবে, আর ওরা নিজেরাও পর-পুরুষের প্রতি থাকবে আকর্ষিতা হয়ে। আল কুরআন একে 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' বলায় যা বুঝা যায় তাহলো ঃ

এক. আখেরী নবীর নবুওয়াতপূর্ব সময়ে তা ছিল নারী সমাজের বেহায়াপনার চিত্র ও পশুত্বের বহিঃপ্রকাশ। যা ইসলামী শিক্ষার ফলে ইসলামী সমাজ থেকে বিদূরীত হয়ে যায়। তাই আল কুরআনের আহ্বান হলো মুসলিম নারী সমাজ যেন অনাগত কালেও ইসলামের এ তাহযীব-তমদ্দুন সমাজে জারি রাখে, আর পূর্বের সেই জাহেলী সংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন রোধে সোচ্চার থাকে।

দুই. আল কুরআনের প্রাচীন জাহেলিয়াত অথবা প্রাথমিক জাহেলিয়াত বলার মধ্যে এমন ইংগিত রয়েছে যে, সেই যুগের জাহেলিয়াত পরবর্তী কোনো এক যুগে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আজকের সমাজে নারী-প্রগতি ও নারী ক্ষমতায়নের নামে যে রকমের জাহেলিয়াত বিরাজ করছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করলে আল কুরআনের সেই শাশ্বত বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

তিন. আজকের সমাজে মানবতা বর্জিত বল্গাহারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে 'প্রগতি' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর ইসলামের শাশ্বত বিধান ও চিরসুন্দর ব্যবস্থাকে চিত্রায়িত করা হচ্ছে সেকেলে, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ইত্যাদি বিশেষণে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলামী সংস্কৃতিই যে মানবজাতির জন্য উন্নতি, প্রগতি ও চিরকল্যাণের গ্যারান্টি—যা সর্বকালের সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করার একমাত্র ব্যবস্থা, যা বিশ্বস্রষ্টা তথা মানব স্রষ্টার অমোঘ বিধান। যার বিপরীতে মানবরচিত ও মানব প্রচলিত যে কোনো রীতি প্রথাই উন্নতি ও প্রগতি পরিপন্থী ; এটা নতুন আংগিকে নতুন খোলসে নতুন নামে নতুন সমাজে যতবার যতভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থে আখেরী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী জীবন বিধান ইসলামী রীতিনীতি ছাড়া বাকী সকল ব্যবস্থাই প্রগতি পরিপন্থী।

চার. جَـــاهـلـيـت اولى বা 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' বলে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার জাহেলিয়াত খতম হয়ে যাওয়ার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। কারণ ইসলামপূর্ব সকল ব্যবস্থাই স্থায়ী হওয়ার অযোগ্য বলে প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়েছে। যদিও যুগে যুগে মুনাফিকরা আর ইসলাম বিদ্বেষীরা তাকে বুকে ধরে রেখে সেই জাহেলিয়াত প্রতিষ্ঠার মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর আর তার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"সত্য সমাগত অসত্য বিতাড়িত, আর অসত্য তো স্থায়ী হবার অযোগ্যই বটে।"–তাদাব্বুরে কুরআন এর আলোকে

পাঁচ. মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ অবিস্মরণীয় আয়াত প্রাচীন জাহেলী বা আদিম মূর্খ যামানার কদর্য ও ঘৃণিত রীতিনীতির দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলছে, বাইরে বের হওয়ার সময় সাজগোজ করার অভ্যাসটি জাহেলিয়াতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এটা অনুসরণে আধুনিক জাহেলিয়াতের উপর আরও

এক কদম এগিয়ে গেছে এবং তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি সব প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকেই গৃহীত।

ছয়. বস্তুত জাহেলিয়াত (মূর্খতা-অজ্ঞতা) কোনো একটি নির্দিষ্ট যামানার বৈশিষ্ট্য নয় যে তা একটি নির্দিষ্ট কালে বা কোনো এক নির্দিষ্ট দেশে থাকবে। আসলে এ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা, এর পেছনে জীবনের এক নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা সক্রিয় রয়েছে। হতে পারে এ অবস্থা আবারও আসবে, এ চিন্তা আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে। পূর্বের জাহেলিয়াত তখন নব্য জাহেলিয়াতের জন্য দিশারী হিসেবে কাজ করবে—তা যখন যেভাবে এবং যেখানেই হোক না কেন।

সাত. আধুনিক বিশ্বের প্রতি তাকালে দেখা যায় মানুষ এখন এক অন্ধ জাহেলিয়াতের দিকে এগিয়ে চলছে। যা ভালমন্দ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, যা স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্থূল অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলছে। যার চিন্তাধারার মধ্যে পাশববৃত্তিই অধিক ক্রিয়াশীল। এটি মানব জাতিকে মানবতাবোধ থেকে সরিয়ে নিয়ে হীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য বদ্ধপরিকর।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

বত্রিশ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

"মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, সবরকারী পুরুষ ও সবরকারী নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌন অংগ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—এদের সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখে দিয়েছেন।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫

নির্দিষ্ট গুণবৈশিষ্ট্যের সকল পুরুষ-নারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিন্ন ক্ষমা ও পুরস্কার

আদম সন্তান পুরুষ ও নারী—দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত। মানব বংশ সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য এতদোভয়ের সৃষ্টি, উভয়ের দৈহিক মানসিক গঠন পার্থক্য এবং তদানুযায়ী উভয়ের মধ্যে কর্মবন্টন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি রহস্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকবিশেষ। আল্লাহ তাআলার এ বিধানের পরিবর্তন-পদক্ষেপ তাঁর সৃষ্টি রহস্যের স্বাভাবিক নীতি বা প্রাকৃতিক বিধান ধ্বংস করারই নামান্তর। এ জাতীয় পদক্ষেপ মানব জাতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বা পরিণামের দিক থেকে কখনো কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি—আর তা সম্ভবও নয়। কিন্তু তবুও বিভ্রান্ত মানব বংশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এমনি কর্মকাণ্ডের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সদাতৎপর। অথচ ইতিহাস থেকে সবক গ্রহণের কোনো মনোভাবই তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে দেখা যায় না।

ফলে এরা গোটা মানব জাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে চলছে অহরহ। নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ণ ও ফলপ্রসূ পর্যালোচনা করে প্রকৃত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো মনোভাবের উদ্রেক হচ্ছে না তাদের। ফলে তারা ধাবিত হচ্ছে মানব জীবনের সার্বিক বিপর্যয়ের পথে ; আর রুদ্ধ করে দিচ্ছে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণের রাজতোরণ।

ইসলাম মানব সমাজের সার্বিক দায়িত্ব পালনে পুরুষ নারীর দায়িত্বের নির্ভুল ও সুষ্ঠু কর্মবিভাজন করে দিয়েছে। উভয়ের দুনিয়ার জীবনে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আবশ্যকীয় দৈহিক-মানসিক শক্তি-সামর্থসহ তাদের উভয়কে পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার আকর্ষণ দিয়ে রাব্বুল আলামীন মানব বংশ সংরক্ষণ সম্প্রসারনের এক স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মর্যাদা, অধিকার ও কর্মফল প্রাপ্তির দিক থেকে তাদের মধ্যে ইসলাম কোনোই পার্থক্য করে না। পার্থক্য করেছে কেবল কর্মবন্টন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। ভরণ-পোষণ, আয়-রোজগার ও তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে কোমলমতি প্রেমাধার নারী জাতিকে। ইসলাম সেই গুরুদায়িত্বের ভার অর্পণ করেছে দৃঢ়চেতা কঠোরমনা পুরুষের উপর। এ কর্মবন্টন ও দায়িত্ব বিভাজন তো সেই সত্তারই সুবিজ্ঞ ও কৌশলময় নির্দেশনা যিনি সামর্থ ও যোগ্যতার বিভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীকে। কিন্তু মর্যাদা ও পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি যে এতদোভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত করেননি, আলোচ্য আয়াতে সবিস্তারে সে কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কুরআন নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই সমানভাবে জীবন পথের নির্দেশিকা। তবে কুরআনুল কারীমের নির্দেশাবলীর সাধারণ নীতি হলো এতে মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষ বাচক শব্দ দিয়ে আর নারীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পরোক্ষভাবে। উদাহরণ স্বরূপ আল কুরআনের সর্বত্রই ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুরুষবাচক শব্দ সমষ্টি দিয়ে। আর নারীদেরকেও আনুসংগিকভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ইংগিত রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয় থাকবে—এরি মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত। তাছাড়া পুরো কুরআনে কেবল মারইয়াম বিনতে ইমরান ছাড়া আর কোনো নারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কোনো বিশেষ মহিলার প্রসংগ উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে তা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পুরুষের সম্পর্ক সূচক শব্দ দিয়ে। যেমন اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ফিরাউন পত্নী اِمْرَاَةُ نُوْحٍ নূহ পত্নী ইত্যাদি। হযরত মারইয়ামের নাম উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, হযরত ঈসা আ.-এর

পিতা না থাকায় বাধ্য হয়েই তাঁকে মায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কুরআনুল কারীমের এ প্রকাশভংগি এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু এতে নারীদের হীনমন্যতার উদ্রেক হওয়াই ছিল একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বিভিন্ন হাদীসে এমন বহু রেওয়ায়াত রয়েছে, যাতে নারীগণ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ মর্মে আরজ করেছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন, তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মধ্যে কোনো পুণ্য ও কল্যাণ নেই। তাই আমাদের কোনো ইবাদাতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আম্মারা থেকে আবার কোনো কোনো রেওয়ায়াতে হযরত আসমা বিনতে উমাইস থেকে এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়ায়াতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ (শানেনুযূল) বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে নারীদের সান্ত্বনা ও স্বস্তি প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎকার্যাবলী, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া বা নারী হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

–মাআরেফুল কুরআন

এসব আয়াতে নারীদের স্মরণ করানো হয়েছে যে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং ইসলামের নির্দেশসমূহ পালন করার মাধ্যমে নারীদেরকে পুরুষদের সাথে সমভাবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর সকল অধিকার ও সুযোগ রয়েছে।

মহিলাদের উপরোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। মুসলিম জাতি সত্তার বিশাল প্রাসাদটি গড়ে উঠার মত ভিত্তির জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন, এ আয়াতে ওসব গুণাবলীর বহু মূল্যবান নির্দেশিকা বর্ণিত হয়েছে। আর সেসব গুণাবলী হলো, ইসলাম, ঈমান, আনুগত্য, সত্যবাদীতা, সবর, বিনয়-নম্রতা, দানশীলতা, সিয়াম সাধনা, চরিত্রের হেফাযত এবং আল্লাহ তাআলার বেশী বেশী স্মরণ।

এসব কটি গুণই আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম জাতি সত্তার বিশাল প্রাসাদের এক একটি মূল্যবান ইট। পুরুষ নারী নির্বিশেষে উক্ত গুণাবলীর অধিকারী সকল মুসলিমের জন্যই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে এসব গুণাবলীতে সুসজ্জিত সকল পুরুষ-নারীর স্ব স্ব ভূমিকা পালন উন্নতির সোপানরূপে কার্যকরী হতে পারে।–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে উল্লিখিত গুণাবলী সম্পর্কিত প্রতিটি পরিভাষাই আজকের মুসলিম সমাজে অহরহ ব্যবহৃত হতে দেখা গেলেও এসবের যথার্থরূপ ও এসবের প্রকৃত ধারণা না থাকায় মুসলিম নর-নারীর মাঝে এসবের প্রভাব পড়তে দেখা যায় না—ফলে ইপ্সিত ফলাফল লাভও সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং আজকের মুসলিম উম্মার জন্য বর্ণিত গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচিতিমূলক আলোচনা দরকার বলে মনে করি।

আলোচ্য প্রথম বিষয়টি হচ্ছে 'ইসলাম'। ইসলামী যিন্দিগীর অনুসারী নারী-পুরুষরাই 'মুসলিম'। অর্থাৎ যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে কবুল করে নিয়েছে। অতপর ইসলামের অনুসরণ করেই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—যাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা হয়েছে, তাঁরই নির্দেশ মেনে চলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাওহীদ ভিত্তিক অবিভক্ত চেতনা-বিশ্বাসই হচ্ছে মুসলিমের দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি ধাপের মূল চালিকাশক্তি ও নিয়ন্ত্রক চাবিকাঠি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'ঈমান'। সুদৃঢ় বিশ্বাস। এ গুণের অধিকারী নারী-পুরুষই হচ্ছে মুমিন বা মযবুত আস্থা স্থাপনকারী। অর্থাৎ যারা কেবল বাহ্যিকভাবেই দীন ইসলাম মেনে চলে না বরং যারা আন্তরিকভাবেই ইসলামের পথনির্দেশকে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল বলে স্বীকার করে, তারা বিশ্বাস করে যে, চিন্তা ও কাজের যে পথ কুরআন ও সুন্নাহ দেখিয়েছে, তা-ই সরল-সোজা ও সম্পূর্ণ সঠিক পথ, যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভুল বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের নিজেদের মতেও তা সন্দেহাতীতভাবে ভুল। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা সঠিক ও হক বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের মন-মগজ তাকেই সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে। কুরআন-সুন্নাহর কোনো হুকুমকে তারা অবজ্ঞা করে প্রচলিত রীতিনীতি বা স্বীয় মতামতের অনুসারী হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا -ঈমানের স্বাদ সেই গ্রহণ করতে পেরেছে

যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন—জীবন বিধান এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে। এর আরেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মন-মানসিকতা আমার উপস্থাপিত বিধানের অধীনতা স্বীকার করে না নিবে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'আনুগত্য'। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকারী قَانِتٌ হবে একজন মুসলিম। সুতরাং অনুগত নারী-পুরুষ বলতে বুঝায় সেসব মুসলিমকে যারা ইসলামের বিধান কেবল মৌখিকভাবে মেনে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং বাস্তবে তার যথাযথ অনুসরণও করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে তারা নিজেদের ঈমানের দাবী মোতাবেকই বাস্তব জীবন আন্তরিকভাবেই অতিবাহিত করে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো 'সত্যবাদিতা'। সত্যবাদিতা বা সত্য পন্থাবলম্বন হলো একজন মুসলিমের ঈমানের একান্ত দাবী। একজন মুসলিম নিজের কথায় যেমন সত্যবাদী তাকে কাজকর্ম, লেনদেন ইত্যাদিতেও সত্যানুসারী হতে হবে। মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা, অসদুদ্দেশ্য ও ধূর্তামি প্রভৃতি দোষ তাদের জীবনে পাওয়া যাবে না। তাদের মুখে সে কথাই ধ্বনিত হবে যাকে তাদের মন নিসন্দেহে সত্য বলে জানে। তারা এমন কাজই করে যাকে তারা সত্য বলে জানে। আর যার সাথেই তারা কোনোরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, লেনদেন করে, তাতে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও সততা পুরোপুরি রক্ষা করে থাকে। তাদের কথা, বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে কোনোরূপ ব্যতিক্রম নেই।

পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে 'সবর-ধৈর্য'। ধৈর্যশীলতা একজন মুসলিমের অপরিহার্য নৈতিক গুণ-বৈশিষ্ট্য। ধৈর্যশীলতা গুণের তাৎপর্য হলো আল্লাহ ও রসূলের প্রদর্শিত সরল-সঠিক পথে আল্লাহর দীন কায়েমের ব্যাপারে যত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়—যেসব কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করার প্রয়োজন হয়, আর যেসব ক্ষতি-লোকসান স্বীকার করতে হয় ; তা সবই তারা পূর্ণ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা সহকারে এবং অকাতরে বরদাশত করে নেয়। কোনো ভয়ভীতি, লোভ-লালসার কোনো দাবী বা উত্তেজনা তাদেরকে সরল-সোজা পথ থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারে না।

এখানে ষষ্ঠ বিষয় হলো 'বিনয়-নম্রতা'। একজন মুসলিম সদা-সর্বদা আল্লাহর সম্মুখে থাকবে خَاشِعٌ বা অবনত হয়ে। অর্থাৎ গৌরব, অহংকার,

দাম্ভিকতা হতে তাদের অন্তর হবে মুক্ত। তারা পূর্ণ চেতনা ও অনুভূতি সহকারে মনে করে যে, তারা আল্লাহর বান্দা ছাড়া আর কিছুই নয়, বান্দাহর উর্ধে তাদের কোনোই স্থান বা পজিশন নেই। এ কারণে তাদের দেহ ও মন উভয়ই সদা অবনত থাকে আল্লাহর সামনে। তাদের উপর সদা সর্বদাই আল্লাহর ভয় থাকে বিজয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে। দাম্ভিক, অহংকারীও আল্লাহ থেকে গাফেল লোকদের মত কোনো আচরণ কখনো তাদের দ্বারা সংগঠিত হয় না।

আয়াতের সপ্তম বিষয়টি হলো 'দানশীলতা'। সদকা দানকারীর পরিভাষা 'মুতাসাদ্দেকীন'। কেবল ফরয যাকাত আদায় করা এর অর্থ নয়। সাধারণ দান-খয়রাতও এর মধ্যে শামিল। তারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, উন্মুক্ত হস্তে খরচ করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সাধ্য ও সামর্থ মোতাবেক সাহায্য করতে কোনো ত্রুটি করে না। কোনো ইয়াতীম, রুগ্ন, বিপদগ্রস্ত, দুর্বল, অক্ষম, অভাবী ও দরিদ্র ব্যক্তি তাদের এলাকায় সাহায্যবঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। উপরন্তু আল্লাহর দীন কায়েম ও বিজয়ী করে তোলার জন্য প্রয়োজন হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নিজেদের ধনমাল লুটিয়ে দিতে কখনো কার্পণ্য করে না। এ গুণটি দিয়ে অন্তরের সংকীর্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শনের চেতনা জাগ্রত হয়। বান্দার হক আদায় করার, মানুষকে ভালবাসার প্রেরণা জাগে এবং উপকারীর উপকার স্বীকার করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব জাগ্রত হয়।

বর্ণিত অষ্টম গুণটি হলো 'সওম বা রোযা'। রোযাদার বা সিয়াম সাধনাকারী নারী-পুরুষকে তার সিয়াম পালন আত্ম নিয়ন্ত্রণের শক্তি পয়দা করে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে এনে দেয়। সে বা তারা সিয়ামের মাধ্যমে বৈধ ভোগবস্তু পরিত্যাগ করার সেই কষ্টসাধ্য কাজটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। এ মহান গুণটির প্রধানতম তাৎপর্য হচ্ছে মানব দেহের চাহিদার উপর মনের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ লাভ, জীবনের প্রধান প্রধান চাহিদাকে নিজের আয়ত্বে আনার শক্তি অর্জন, ইচ্ছা শক্তিকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবতাকে পাশববৃত্তির উপর বিজয়ী করা। মানুষের দেহ ও রূহের সমন্বিত শক্তি সিয়াম পালনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সিয়াম পালন আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ফলে মানুষের প্রধান অংশ/উপাদান 'রূহ' বিশুদ্ধতা লাভে ধন্য হতে পারে। এ ব্যাপারেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো তারতম্য নেই।

মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নবম বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাস্থানের হেফাযত। 'লজ্জাস্থানের হেফাযত' মানে মানুষের জৈবিক চাহিদা প্রশমিত করা নয় বরং তা যেন নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত হয়। এ গুণ মানুষকে আল্লাহর বিধানের অনুগামী বানায় এবং পৃথিবীকে আরও সুন্দর স্বচ্ছ করে গড়ে তোলার ও জীবনকে সমৃদ্ধ করার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়। 'লজ্জাস্থানের হেফাযত'-এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক. তারা যেনা-ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকে, দুই. তারা নগ্নতা ও উলংগতা পরিহার করে। এখানে উল্লেখ্য, কেবল বিবস্ত্র হওয়াকেই নগ্নতা বলা হয় না, বরং পাতলা কাপড় পরিধান ও আঁট-সাঁট পোশাক পরিধান করাও নগ্নতার মধ্যে গণ্য হবে।

আয়াতে বর্ণিত দশম ও সর্বশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো, 'আল্লাহ তাআলাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করা।' আল্লাহকে খুব বেশী বেশী করে স্মরণ করার অর্থ হলো মুখে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে। কোনো লোকের মধ্যে এ গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে তখন, যখন তার অন্তরে আল্লাহর চিন্তা-খেয়াল সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। চেতনার স্তর থেকে অবচেতন ও অনবচেতন পর্যন্ত আল্লাহর চিন্তা গভীর হয়ে গেলেই একজন লোকের এ অবস্থা হতে পারে যে, সে যে কাজই করবে আর যে কথাই বলবে তাতেই আল্লাহর নামের স্মরণ ও উচ্চারণ থাকবে। খাওয়ার শুরুতে 'বিস্মিল্লাহ'। চর্বন করতে 'সুবহানাল্লাহ', গিলতে 'আলহামদুলিল্লাহ বলবে। সর্বোপরি এ খাদ্যদ্রব্য হালাল পথে এসেছে কিনা তৎপ্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুত এ লক্ষ্য রাখাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ বা ذكـر الله। সাধারণ কথাবার্তায় তার মুখে সর্বাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় উচ্চারিত হবে—'বিসমিল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'ইনশাআল্লাহ', 'মাশাআল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' 'জাযাকাল্লাহ', ইত্যাদি আল্লাহর স্মরণমূলক বাক্যসমূহ। নিজের প্রতিটি বিষয়ে সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে। যে কোনো নিয়ামত পেলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। বিপদ আসলে আল্লাহর রহমত চাইবে, প্রত্যেক সমস্যা ও জটিলতায় কেবল আল্লাহর দিকেই মুখ ফিরাবে। যে কোনো অন্যায় বা পাপ কাজের অসওয়াসা আসবে তখনই কেবল আল্লাহর ভয়েই তা থেকে বিরত থাকবে। কখনো কোনো অপরাধ হয়ে গেলে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। মোটকথা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, দুনিয়ার সকল কাজে আল্লাহর স্মরণ করাই হবে তার স্থায়ী নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে— ইসলামী জিন্দেগীর প্রাণশক্তি। এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলাম নির্ধারিত সব

ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা আছে, ঐ সময় তা আদায় করা হলে মানুষের জিম্মা খালাস হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বা 'যিক্‌রুল্লাহ' এমন এক ইবাদাত যা প্রতিটি মুহূর্তেই জারী থাকে। মানবজীবনের এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর বান্দা হওয়ার সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে রাখে। যাবতীয় ইবাদাত ও দীনি কাজ এরই সাহায্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। এরি ফলে বিশেষ বিশেষ আমল বা ইবাদাতের সময় আল্লাহর দিকে মন উন্মুখ হয়ে থাকে—মুখ সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে। কারো এরূপ অবস্থা হলেই বুঝা যাবে যে, তার জীবনের সকল ইবাদাত ও দীনি কাজ উৎকর্ষ লাভ করেছে। যেমন একটি চারাগাছ সঠিক প্রকৃতি এবং অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে বপন করলে তার উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে জীবন এরূপ আল্লাহর স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক স্মরণশূন্য, তাতে নির্দিষ্ট সময়েও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদায় করা ইবাদাত ও দীনি কাজ এমন একটি চারাগাছের মত, যা স্বীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়া ও পরিবেশে লাগানো হয়েছে এবং কেবলমাত্র মাটির বিশেষ পরিচর্চার কারণে লালিত হচ্ছে। এ বিষয়টিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাদীসটি এই ঃ

عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رُجُلاً سَائَلَهُ اَىُّ الْمُجَاهِدِيْنَ اَعْظَمُ اَجْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرًا - قَالَ اَىُّ الصَّائِمِيْنَ اَكْثَرُ اَجْرًا ؟ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرًا - ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ وَالزَّكٰوةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا - مسند احمد

"মুআয ইবনে আনাস আল জুহানী বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুজাহিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পুণ্য ও পুরস্কার লাভ করবে কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করবে। সে জিজ্ঞেস করলো, রোযাদার লোকদের মধ্যে কে বেশী পুরস্কার পাবে। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করবে। অতপর সে ব্যক্তি নামায, যাকাত, হজ্জ ও সদকা দানকারীদের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটির জবাবে বললেন, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করবে।"–মুসনাদে আহমাদ

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দশটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, এসব গুণাবলী যেসব নারী-পুরুষের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। বস্তুত ইসলামের মৌলিক মূল্যমান (Basic Values) সমূহ এ একটি আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। এ মূল্যমান সমূহের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কার্যত উভয়ের কর্মক্ষেত্র অবশ্যই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পুরুষদের কাজকর্ম করতে হয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিভাগে আর স্ত্রীলোকদের করতে হয় অপর ক্ষেত্র ও বিভাগে। কিন্তু উল্লিখিত মূল্যমান উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান থাকলে আল্লাহর কাছে উভয়ের মর্যাদা ও পুরস্কার এক ও অভিন্ন, উভয়ের পুণ্য ও কর্মফল সম্পূর্ণ সমান মানের। এদের এক শ্রেণীর লোক মহিলা—যারা ঘরের দায়িত্ব পালন করেছে, সন্তান লালন-পালন করেছে ; অপর শ্রেণীর লোক—যাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে খেলাফত ও রাষ্ট্র পরিকল্পনা করা। একজন সন্তান লালন-পালন করেছে অপরজন জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য লড়াই করেছে। এ কারণে তাদের উভয়ের কর্মফল ও পুরস্কারে কোনো পার্থক্য নেই।–তাফহীমুল কুরআন

মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ তার তাফসীরে 'আল কুরআনুল করীম'-এ বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালমা রা. এবং অন্যান্য কজন মহিলা সাহাবী বললেন, এ কেমন কথা! আল্লাহ তাঁর কালামের সর্বত্র কেবল পুরুষদের সম্বোধন করেছেন—মহিলাদের নয় ? তাঁর এ কথার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।- মুসনাদে আহমদ ৩০১/২ পৃষ্ঠা তিরমিযী হাদীস নং ৩২১১। এ আয়াতে নারীদের শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে মাত্র ; কেননা সমগ্র হুকুমেই নারীরা পুরুষদের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য যেসব আয়াত শুধু মহিলাদের জন্য নাযিল হয়েছে সেকথা স্বতন্ত্র। এ আয়াত এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবাদাত ও আল্লাহর আনুগত্যে আখিরাতের মর্যাদা ও ফযিলত ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্যই সমানভাবে এর দরজা খোলা আছে এবং উভয়ে অধিক থেকে অধিকতর পুণ্য ও সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম। এতে তো লিংগের পার্থক্যের ভিত্তিতে কমবেশী করা হয় না।–আল কুরআনুল করীম

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. আল কুরআনুল কারীম-এর হাসিয়ায় লেখেন, কোনো কোনো নবী পত্নী বলেছিলেন যে, কুরআনের অধিক সংখ্যক স্থানেই তো কেবল পুরুষদের সম্পর্কে বলা

হয়েছে—নারীদের সম্পর্কে নয়। তাছাড়া এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শুধু নবী পত্নীদের কথা বলা হয়েছে, সাধারণ নারী সমাজের কথা কিছুই বলা হয়নি। মহিলাদের এসব কথার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে নারীদের শান্ত্বনা দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক—কারো পরিশ্রম ও উপার্জন আল্লাহর দরবারে বিনষ্ট হতে দেয়া হয় না। তাছাড়া যেভাবে পুরুষদের চারিত্রিক উন্নতি করার উপকরণ মওজুদ আছে, মহিলাদের জন্যও সেই ময়দান প্রশস্ত আছে। এখানে নারীগণের মনতুষ্টির জন্য এভাবে নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা নাহলে আল কুরআনের যে হুকুম পুরুষদের জন্য নাযিল হয়েছে সেই হুকুম সাধারণত মহিলাদের প্রতিও আরোপিত হয়ে থাকে। পৃথক পৃথক নাম নিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হুকুম হলে তা পৃথকভাবেই বলে দেয়া হয়েছে।-আল কুরআনুল করীম, তাফসীরে উসমানী।

❏

তেত্রিশ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, মেয়েরা এবং মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখাবয়বের উপর টেনে দেয়, এতে করে তাদের চিনতে পারা অনেকটা আসান হবে ; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান।"

–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৫৯

মুসলিম নারীগণ প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাবে কিভাবে ?

নারী-পুরুষের মাঝে, কর্মবন্টন অনুযায়ী নারীগণের প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার। পারিবারিক কার্যাবলী সম্পাদন বাড়ীর অভ্যন্তরে হলেও কখনও প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরেও তাদের যাতায়াত আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। মুসলিম নারীগণ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কার্যক্রমে বাড়ীর বাইরে যেতে কুরআন ও হাদীস নিষেধ করে দেয়নি। তবে তারা বের হবে পর্দা করে শালীনতা সহকারে। এ বিষয়ে সূরা আল আহ্যাবের ৩৩ আয়াতে এ বইয়ের বিষয় নং একত্রিশে আলোচনার সূচনা করা হয়েছে। যেখানে মহিলাদের জন্য সাধারণত ঘরে পারিবারিক বিষয়াদিকেই প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে ঘরের বাইরে তাদের বিচরণ কিরূপ হবে সে বিষয়েরও সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর স্ত্রী-কন্যা ও মুসলিম মহিলাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে যাওয়ার সময় সমস্ত শরীর, মাথা ও বুকের খোলা অংশ আচ্ছাদিত করার আদেশ দেন। সর্বাংগ আচ্ছাদনকারী একটা জিল্‌বাব বা বড় চাদর দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে নিতে হবে। এ পোশাক তাদেরকে অন্যান্য নারীদের মধ্য থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিবে আর দুষ্কৃতকারী ও বখাটে লোকদের উত্যক্তি থেকে রক্ষা করবে। কেননা মহিলাদেরকে উত্যক্তকারী বখাটেরা আপাদমস্তক আবৃত মহিলাদেরকে দেখলে তাদেরকে দীনদার পরহেজগার নারী হিসেবে চিনতে পেরে লজ্জা ও সংকোচবোধ করে এবং সংযত আচরণ করে। সূরা আল

আহ্যাবের আলোচ্য ৫৯নং আয়াতটিতে 'জিলবাব' পরিধানের নির্দেশ লক্ষ্যণীয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, মদীনার কিছু পাপাচারী বখাটে লোক রাতের আঁধার নেমে এলেই মদীনার অলিগলিতে বেরিয়ে পড়তো এবং মেয়েদের খোঁজ করতো। মদীনা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। তাই রাত হলে মহিলারা প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে বাইরে বেরিয়ে যেতো, আর পাপাচারী বখাটেরা এ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। তবে কোনো মহিলাকে চাদর দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত দেখলে তারা বলতো এতো 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা'। কাজেই তার ব্যাপারে তারা সংযত থাকতো। আর যখন তারা দেখতো যে, কেউ বড় চাদর দিয়ে শরীর না ঢেকেই বেরিয়েছে, তখন তারা বলতো, এতো দাসী-বাঁদী বা নিম্নস্তরের মহিলা। এই বলেই তারা মহিলার উপর আক্রমণ চালাতো।

মুজাহিদ বলেছেন, 'জিলবাব' বা বড় চাদর পরিধানের আদেশ দেয়া হয়েছে এজন্যে, যেন বুঝা যায় তারা স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। ফলে কোনো অপরাধপ্রবণ লোক তাদের কোনোভাবে উত্যক্ত করতে চেষ্টা করবে না। আর 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু'—একথার অর্থ হলো অজ্ঞতাবশত জাহেলী যুগে যেসব অন্যায় হয়ে গেছে, তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আরবের সামাজিক পরিবেশকে পবিত্র করার জন্য যে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ফেতনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধ জারি করা হচ্ছিল এবং যাবতীয় বিশৃংখলা ও দুর্নীতিকে সংকীর্ণতম গণ্ডীতে সীমিত করার জন্য যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছিল—এসব কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গোটা মুসলিম সমাজের উপর ইসলামী নিয়ম-বিধি ও ঐতিহ্যের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা।–ফী যিলালিল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় বড় চাদর বা বোরকা পরিধান করে শালীন পোশাকে পর্দা সহকারে বের হতে হবে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ স. এক হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো বাধা-নিষেধ নেই। রসূলের পবিত্র সহধর্মীনীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা পর্দা সহ বাইরে যেতে পারবে। তদুপরি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও রসূলুল্লাহ স.-এর আমল এ সাক্ষ প্রদান করে যে, প্রয়োজনে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ্জ

ও ওমরার সময় রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তেমনিভাবে তাঁর স. সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে যাওয়ারও প্রমাণ রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়াতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহরিম আত্মীয়গণের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ী থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়স্বজনের রোগ-ব্যাধির খবর নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া রসূলে করীম স.-এর জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীগণের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

কেবল রসূলে করীম স.-এর সাথেও তাঁর সময়কালেই যে এমনটি ঘটেছিল তা নয় ; বরং তাঁর ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা রা. ও যয়নাব বিনতে জাহাশ রা. ছাড়া অন্যান্য পত্নীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে বাইরে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামও কোনো আপত্তি উত্থাপন করেননি।

সারকথা এই যে, কুরআন পাকের ইংগিত, নবী করীম স.-এর আমল ও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অনুসারে প্রয়োজনের সময় মুসলিম নারীগণের ঘরের বাইরে যাওয়ার বিষয়টি আল্লাহর বাণী وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ "তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো" এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা ও মুহরিম আত্মীয়গণের সাথে সাক্ষাত, এদের অসুস্থতায় সেবা-শুশ্রূষা করা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের সামান বা বিকল্প কিছু না থাকে তবে চাকুরী করার জন্য বা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বাহির হওয়াও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ এসব উদ্দেশ্যে মহিলাদের বের হওয়ার পথে ইসলাম বাধা দেয় না। অবশ্য বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো অংগ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া—বরং বোরকা বা বড় চাদর দিয়ে পর্দার সাথে বের হওয়া।–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে কুরআনের ভাষা হলো, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ- "তারা যেন তাদের উপর তাদের জিলবাব ঝুলিয়ে রাখে।" আরবী ভাষায় 'জিলবাব' বলা হয় বড় চাদরকে। এখানে مِنْ শব্দ দ্বারা বুঝায় বড় চাদরের অংশবিশেষ। এবং পুরো আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'মহিলারা যেন নিজেদের গায়ে বড় চাদরটি ভালভাবে পরিধান করে সেটার একটা অংশ কিংবা তার গুণ্ঠন নিজের উপর হতে ঝুলিয়ে নেয়। আর আমাদের ভাষায় এটাই হচ্ছে 'ঘোমটা দেয়া'।

নবী করীম স.-এর নিকটবর্তী সময়ে বড় বড় মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের এরূপ অর্থই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে শিরীন র. হযরত উবাদাতুস সালমানীর কাছে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি জবাবে মুখে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের গায়ের চাদর উঠিয়ে তা এমনভাবে পরলেন যে সমস্ত মাথা, কপাল ও মুখাবয়ব ঢেকে গেল, আর কেবল একটি চোখ খোলা রাখা হলো। হযরত ইবনে আব্বাসও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই করেছেন। ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া তাঁর যেসব কথা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ নারীদের হুকুম দিয়েছেন যে, তারা কোনো কাজে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন নিজেদের চাদরের আঁচল উপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের মুখাবয়ব ঢেকে নিবে এবং কেবল চক্ষু খোলা রাখবে।" কাতাদাহ এবং সুদ্দীও আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন।

সাহাবা ও তাবেঈনের পর ইসলামের ইতিহাসে যে কজন বড় বড় মুফাস্সির হয়েছেন, তাঁরা সকলে একমত হয়ে আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন ঃ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ–অর্থাৎ ভদ্র স্ত্রীলোকেরা নিজেদের পোশাক-আশাকে দাসীদের মত পরিধান করে যেন ঘর থেকে বের না হয়, আর তাদের চেহারা ও মাথার চুল যেন খোলা না থাকে। বরং তারা যেন তাদের গায়ের চাদরের এক অংশ ঝুলিয়ে রাখে, যাতে কোনো ফাসেক লোক তাদের মুখ ও চেহারা দেখার সাহস না পায়। (জামেউল বায়ান, খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা-৩৩ থেকে তাফহীমুল কুরআন।) আল্লামা আবু বকর জাস্সাস বলেন, "এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যুবতী মহিলাদেরকে তাদের মুখাবয়ব ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পূর্ণ আবরণ ও পবিত্র চরিত্রবতী হওয়ার প্রমাণ প্রকাশমান থাকতে হবে, যেন সন্দেহপ্রবণ চরিত্রের লোকেরা তাদের দেখে কোনোরূপ লালসার বশবর্তী না হয়। (আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা থেকে তাফহীমুল কুরআন।) আল্লামা জামাখশারী তাঁর তাফসীর আল কাশ্শাফ ২য় খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠায় বলেন, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থ তারা তাদের চাদরের একাংশ উপর থেকে ঝুলিয়ে নিবে এবং তা দিয়ে তাদের চেহারা ও চারিপাশকে ভালভাবে আবৃত করে রাখবে। আল্লামা নিজামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থ নিজের উপর দিয়ে চাদরের একটা অংশ ঝুলিয়ে নিবে। এভাবে মেয়েদের চেহারা ও মাথা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে।–গারায়েবুল কুরআন খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা-৩২ তাফহীমুল কুরআন।

ইমাম রাজী বলেন, এরূপ হুকুম দিয়ে লোকদের একথা জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, এরা চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক নয়। কেননা চেহারা বা মুখমণ্ডল 'সতর' এর মধ্যে শামিল না হলেও যে স্ত্রীলোক তার চেহারা ঢেকে রাখবে, সে অপর কোনো ব্যক্তির সামনে তার চেহারা খুলতে রাজী হওয়ার বিষয়ে কোনো ব্যক্তিই সাহস করতে পারে না। বরং সবাই বুঝতে পারবে যে, এ তো পর্দানশীন স্ত্রীলোক। এদের সাথে কোনোরূপ দুষ্কৃতির আশা করা যায় না।-তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯১ থেকে তাফহীমুল কুরআন।

একটি সন্দেহের অপনোদন

বিভিন্ন তাফসীর আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। তা এই যে, তারা মাথার উপর দিক থেকে তাদের চাদর লটকিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেলবে, যাতে বাঁদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র ফুটে উঠে এবং তারা দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদের ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এরূপ পার্থক্য লম্পটরা ও দুষ্ট লোকেরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের প্রতি হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করতো না। কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্যক্ত করতে কসুর করতো না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু সে জন্যে আইনগত কঠোরতা অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে সেই আইনও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এ কুকর্ম থেকে বিরত হবে না তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে ও শাস্তি দেয়া হবে। এ আইন বাঁদীদের সতীত্ব ও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে। আলোচ্য ৫৯ আয়াতের পরে ৬০ ও ৬১ আয়াতে বলা হয়েছে।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَيُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْآ اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً ۝

অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং মদীনায় গুযব রটনাকারীরা যদি এ থেকে বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করে দেব। তারপর এ শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। তাদের উপর চারদিক থেকে লানত বর্ষিত হবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানে ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচনার শেষ পর্যায়ে সূরা আল আহযাবের ৬০ ও ৬১ আয়াতে মুনাফিক, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকৃত রুচীসম্পন্ন সেইসব লোকের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা ধরনের গুযব রটাতো। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা যদি তাদের যাবতীয় অপতৎপরতা থেকে এবং মুসলিম নরনারী ও সমগ্র মুসলিম সমাজকে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করা থেকে বিরত না হয়, তাহলে ইহুদীদের মত তাদেরকেও মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হবে এবং তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। কেননা ইতিপূর্বে রসূল স.-এর হাতে ইহুদী, সকল প্রকার অপরাধী ও দুষ্কৃতকারীদের সমাজ থেকে উৎখাত করা আল্লাহর স্থায়ী রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।–ফী যিলালিল কুরআন

❑

চৌত্রিশ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا۝

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৮

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি

আলোচ্য আয়াতে কোনো মুমিন পুরুষ অথবা মুমিন নারীকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ দেয়ার চরম পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। মদীনায় এক শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম নর-নারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। মুসলিম নারী-পুরুষ সম্পর্কে তারা এমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতো যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নর-নারীগণ করতেন না। ওরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও অপবাদ রটাতো এবং নানা রকম ফন্দি আঁটতো। এমনি ঘটনা আজকাল সর্বত্রই ঘটতে দেখা যায়। বিকৃত ও গর্হিত রুচীর মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের এমন ধরনের দুরভিসন্ধির কবলে পড়ে মুসলিম নারী-পুরুষ সর্বত্রই হেস্তনেস্ত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জবাব দেন এবং ওদের অপবাদ খণ্ডন করেন।–ফী যিলালিল কুরআন

মুনাফিকদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের এ হচ্ছে এক জঘন্যতম আচরণ। মদীনার ঐসব মুনাফিকদের অন্তরে সার্বক্ষণিক জ্বালা এই ছিল যে, মুসলিম নারী-পুরুষের নৈতিক মান অন্য সকল জাতির তুলনায় ছিল মহান ও সুউচ্চে। আর এতে করে ইসলামের দাওয়াতের প্রভাব ছিল প্রচুর এবং এর ফলাফল প্রমাণিত হচ্ছিলো ব্যাপকতরভাবে। ওরা হিংসার বশবর্তী হয়ে মুসলিম নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাতে আরম্ভ করলো। এভাবে মুসলিম জাহানের নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত ভেংগে দিতে পারলেই ওদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো। হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে প্রচারিত ইফ্‌কের ঘটনাটিও এ উদ্দেশ্যেই সাজানো হয়েছিল। এখানে ওদের এহেন মিথ্যা

ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি ও করুণ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ওদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এখনো যদি ওরা এহেন অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তাহলে এর পরিণতি তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

—তাদাব্বুরে কুরআন

'বুহ্তান' (মিথ্যা অপবাদ) কাকে বলে তা এ আয়াত থেকে জানা যায়। কারো মধ্যে যে দোষ প্রকৃতই নেই বা যে লোক যে অপরাধ আদৌ করেনি, তা সেই ব্যক্তি করেছে বলে প্রচার করাই হলো 'বুহ্তান'। নবী করীম স.ও বুহ্তান (بهتان)-এর এ অর্থই বুঝিয়েছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো (غيبت) 'গীবত' কাকে বলে ? তিনি বললেন, ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - তোমার ভাইয়ের কথা এমনভাবে বলা, যা তার পক্ষে অসহ্য-অপসন্দনীয়। বলা হলো, "আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি সে দোষত্রুটি বর্তমান থাকে তবুও ?" নবী করীম স. বললেন ঃ

اِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ -

"তার মধ্যে সে দোষ বর্তমান থাকলে তো তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে ঐ স্বভাব না থাকে তবে, তুমি বুহ্তান অর্থাৎ মিথ্যা দোষারোপ করলে।"

বস্তুত এটি একটি নৈতিক দোষই নয়—কেবল পরকালেই যে এর শাস্তি হবে, তাই নয়। এ আয়াতের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনে মিথ্যা দোষারোপ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে অবশ্যই গণ্য হবে।

—তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কষ্টদানের সম্পর্কে অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "সে লোকই প্রকৃত মুসলিম যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে আর কেউ কষ্ট না পায়। আর মুমিন সে ব্যক্তি যার কাছ থেকে মানুষ জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে।"

—মাআরেফুল কুরআন, তাফসীরে মাযহারী থেকে।

মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সকল মুসলমান ও রসূলুল্লাহ স. দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। তাদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করতো এবং কখনো কখনো দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করতো। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ স. কষ্ট পেতেন।

তাদের দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল, তারা সর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করতো। যেমন তারা বলে বেড়াতো এক্ষণে অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। প্রথম প্রকারের নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফিকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের মধ্যে প্রয়োজন বশত একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মুহরিম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য ঘরের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ, প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এজন্যে তাকে প্রয়োজনে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখাবয়ব ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও তা বার বার হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা, তাদের জন্য কঠিন নয়। তাই স্বাধীন নারীদের জন্য নির্দেশ রয়েছে তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখাবয়বের সামনে ঝুলিয়ে নেয়। যাতে পর-পুরুষের দৃষ্টিতে মুখাবয়ব না পড়ে। বলা হয়েছে يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ-তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।–মাআরেফুল কুরআন

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়া ও নিপীড়ন করা সম্পর্কে সূরা বুরূজে নিপীড়নকারীদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের সেই ঘোষণা হলো ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ○

"যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে নিপীড়ন করেছে। অতপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, তাদের জন্য আরও রয়েছে ভস্মকারী শাস্তি।"–সূরা বুরূজ ঃ ১০

আয়াতটির তরজমা মাআরেফুল কুরআনে করা হয়েছে এভাবে—যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে। অতপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।

পঁয়ত্রিশ

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"যাতে আল্লাহ্ শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে। আর আল্লাহ্ তাওবা কবুল করেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণের। আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৭৩

আল্লাহ্র শাস্তি অথবা সন্তুষ্টি লাভ মানুষের পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে নয়

আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতে 'আল্লাহ্র আমানত' মানবজাতি কিভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিল, সে বিষয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "আমি এ আমানত আকাশজগত, যমীন ও পাহাড়ের সামনে পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো, তারা ভয় পেয়ে গেল ' কিন্তু মানুষ তা নিজের কাঁধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালেম ও মূর্খ-জাহেল তাতে সন্দেহ নেই।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৭২। অতপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম এই যে, আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের শাস্তি দিবেন ; আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের (ক্ষমা) তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এখানে (امانت) 'আমানত' বলতে (خلافت) 'খিলাফত' বুঝানো হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা মতে এই যমীনে মানুষকে এ খিলাফতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও নাফরমানী করার যে আযাদী দান করেছেন এবং এ আযাদী ভোগ ও ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ করার ও কর্তৃত্ব চালাবার যে এখতিয়ার দিয়েছেন, তার অনিবার্য ফল এই যে, মানুষ তার নিজের ইচ্ছাধীন কাজ কর্মের জন্য নিজেই দায়ী হবে। ভাল নীতি অনুসরণ করলে তার পুরস্কার লাভ করার এবং মন্দ নীতি অনুযায়ী কাজ করলে তার শাস্তি ভোগ করার

সে-ই হবে উপযুক্ত জিম্মাদার। এ এখতিয়ার যেহেতু মানুষ নিজে লাভ করেনি, বরং আল্লাহ তাআলাই তাকে এটা দান করেছেন এবং এগুলোর সঠিক ও ভুল ব্যবহারের জন্য মানুষ আল্লাহর কাছে দায়ী। এজন্য আল কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ 'এখতিয়ার'কেই বলা হয়েছে 'খিলাফত'। আর এখানে একেই বলা হয়েছে 'আমানত'।

এ 'আমানত' কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ও সাংঘাতিক, সে বিষয়ে ধারণা দেয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন। আসমান ও যমীন বিপুল বিরাটত্ব সত্বেও এবং পাহাড়-পর্বত আয়তনে বিরাট-বিশাল ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এ 'আমানত' মাথায় তুলে নেয়ার সাহস ও শক্তি পায়নি। অথচ দুর্বল গঠন প্রকৃতির এ মানুষ নিজেদের সামান্য প্রাণের উপর সেই বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলো।

যমীন ও আসমানের সামনে আমানতের এই বোঝা পেশ করা এবং ওদের তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা ও সে জন্য ভয় পাওয়া বাস্তব আভিধানিক অর্থে যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে ইংগিতের ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর সৃষ্টিকুলের যে সম্পর্ক তা আমরা জানতে বুঝতে পারি না। যমীন, সূর্য, চন্দ্র ও পাহাড়-পর্বত আমাদের সামনে বোবা, বধির ও নিষ্প্রাণ। কিন্তু আল্লাহর কাছেও যে তারা এমন হবে, তা কোনো কথা নয়। আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং তারা তাঁর কথার জবাবও দিতে পারে। এর প্রকৃত অবস্থা ও তত্ত্ব যে কি, তা বুঝতে পারা আমাদের সাধ্যাতীত। কবির ভাষায় ঃ

خاک وباد واب اتش بنده اند ـ بامن وتو مرده باحق زنده اند

"মাটি-বাতাস, আগুন-পানি আল্লাহর বান্দা। তোমার আমার কাছে জড় হলেও স্রষ্টার কাছে জীব।"

কাজেই আল্লাহ তাদের সামনে এ কঠিন দায়িত্বের আমানত পেশ করছেন আর তারা তা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠেছে এবং তাদের নিজেদের মালিক ও স্রষ্টার কাছে বলেছে ঃ আমরা তো মালিকের এখতিয়ারাধীন খাদেম হয়েই থাকতে চাই—এতেই আমাদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করি। নাফরমানী করার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার লাভ করে তার হক আদায় করা এবং হক আদায় করতে না পারা অবস্থায় মালিকের শাস্তি ভোগ করা আমাদের সহ্যের অতীত ব্যাপার।—এমনটি বলা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়। ঠিক তেমনি এটাও সম্ভব যে, আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব গড়ে উঠার পূর্বে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে অন্য কোনো ধরনের অস্তিত্ব দান করে নিজের

সামনে হাজির করেছেন এবং সেখানে এ এখতিয়ার লাভ করার জন্য তিনি নিজেই হয়তো ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করার কোনো দলিল-প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। এটাকে একটি অসম্ভব ব্যাপার মনে করা তো সেই ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে, যে নিজের মন ও চিন্তাশক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল অনুমান করে বসে আছে। [আরও বিস্তারিত বুঝার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আলোচ্য আয়াতের ফুট নোট]

আলোচ্য আয়াতের শুরু করা হয়েছে এই বলে ঃ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ এখানে ل অব্যয়টি বক্তব্যের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি ; বরং আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় এ ل কে لام عاقبة বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দিবেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আরবী সাহিত্যেও এই لام عاقبة এর ব্যবহার আছে। যেমন, ولدواللموت وبنوا للخراب –অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করো পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ করো পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। কথাটির ভাবার্থ হলো, প্রত্যেক জন্মগ্রহণ-কারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

–মাআরেফুল কুরআন

وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ-এর সাথে আলোচ্য বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু দলে বিভক্ত হয়ে যাবে ঃ এক. কাফের ও মুনাফিক ইত্যাদি যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। দুই. মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظلوم ও جهول শব্দদ্বয়ের এক তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমস্ত মানবজাতির জন্য নয়, বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তাফসীরের সমর্থন রয়েছে।"–মাআরেফুল কুরআন

এভাবে রাব্বুল আলামীনের দেয়া এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার অনুযায়ী আদম সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অথবা বিরাগের ভাগী হবে। কে পুরুষ আর কে নারী, এখানে সে তারতম্য মোটেই বিবেচনাযোগ্য নয়। অনেক সময় পুরুষ নারীর তুলনায় অধিক পরিমাণ কাজ আনজামদানে সক্ষম হলেও আল্লাহর কাছে তো অবশ্যই Quantity-র চেয়ে Quality-র গুরুত্ব অধিক।

আর এখানে خـــلافت বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বই মানবজাতির পক্ষ থেকে কাম্য ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে অধিকতর বিবেচ্য। সুতরাং বাহ্যিকভাবে কাজের সংখ্যা বা পরিমাণই আল্লাহর উদ্দেশ্য বা বিবেচ্য নয় বরং কাজটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য। বস্তুত কারো আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না, পারবে শুধু তার কৃতকর্ম তাকে জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী করতে। হোক সে পুরুষ অথবা হোক নারী। অবশ্য এ অধিকার কার্যকর করার বা না করার পূর্ণ এখতিয়ার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই রয়েছে। কারণ, সবকিছুর উপর নিরংকুশ আধিপত্য একমাত্র তারই।

আলোচ্য আয়াতের মূল ঘোষণা হলো শির্‌ক ও নিফাক মানুষকে আল্লাহর আযাবের যোগ্য করে, আর ঈমান যোগ্য করে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের। মানুষটি নারী কি পুরুষ—তা মোটেই বিবেচ্য নয়।

❑

ছত্রিশ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা তিনি তাদেরকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন। আর যাকে তিনি চান বন্ধ্যা করে রাখেন। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ৪৯-৫০

আল্লাহ্ কাউকে দেন মেয়ে, কাউকে দেন ছেলে, আবার কাউকে দেন দুটোই, আর কাউকে রাখেন নিঃসন্তান

আলোচ্য আয়াত দুটোতে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র। সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার মালিক আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। কাজেই মানুষের কর্তব্য একমাত্র তারই আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করে নেয়া। এখানে يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ বলে আল্লাহ্‌র কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই প্রত্যেক ছোটবড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি প্রসংগ তুলে বলা হয়েছে মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি জ্ঞানেরও কোনো দখল নেই। পিতা-মাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার কোনো দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই কাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন, আর কাউকে রাখেন সম্পূর্ণ বন্ধা করে—তার কোনো সন্তানই হয় না।

এখানে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ তাআলা প্রথমে উল্লেখ করেছেন কন্যা সন্তানের কথা তারপর বলেছেন পুত্র সন্তানের কথা। এ

ইংগিত দৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে পুণ্যময়ী।-মাআরেফুল কুরআন

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আকাশজগত ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই।" কথাটা সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফহীমুল কুরআনে লিখেন, অর্থাৎ যেসব লোক কুফর ও শিরকের নির্বুদ্ধিতায় পড়েছে, তাদেরকে বুঝালেও যদি তারা না শুনে ও না মানে তাহলে কিছুই করার নেই। সত্য তো সত্যই থেকে যাবে। যমীনের ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার তথাকথিত ও নামকা ওয়াস্তে রাজা-বাদশাহ ও ডিকটেটরদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে কোনো নবী, ওলী বা দেব-দেবীরও তাতে কোনো অংশ নেই। বরং এসবের মালিক একমাত্র আল্লাহ—অন্য কেউ নয়। তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে সে না নিজ শক্তিতে জয়ী হতে পারে, না তারা যে সব সত্তাকে নিজেদের নিবুর্দ্ধিতার কারণে আল্লাহর ইখতিয়ারের অধিকারী বলে মনে করে নিয়েছে তাদের কেউ এসে তাকে বাঁচাতে পারে।

অতপর يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' থেকে এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ তাআলার নিরংকুশ (Absolute) বাদশাহ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। মানুষ যত বড় বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে বলে মনে করুক না কেন, নিজের ঘরে নিজের ইচ্ছামত সন্তান জন্মবার ক্ষমতার অধিকারীও সে নয়—অন্য কাউকে ইচ্ছামত সন্তান দেয়া তো দূরের কথা। আল্লাহ যাকে বন্ধা বানিয়ে রেখেছেন, সে কোনো ঔষধ, কোনো চিকিৎসা, কোনো তাবীজ-তুমার দিয়ে নিজের ঔরসে সন্তান জন্মাতে পারে না। তেমন শক্তি তার কখনো হতে পারে না। যাকে আল্লাহ কেবল কন্যা সন্তানই দিয়েছেন সে কোনো তদবীরেই একটি পুত্র সন্তানও জন্মাতে পারে না। পক্ষান্তরে যাকে আল্লাহ কেবল পুত্র সন্তান দিয়েছেন, সে কোনো উপায়েই একটা কন্যা সন্তান লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রতিটি মানুষ চূড়ান্তভাবে অক্ষম। এমন অবস্থা দেখার পরও যদি কেউ আল্লাহর কর্তৃত্বে নিজেকে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে কিংবা অন্য কোনো সত্ত্বাকে এরূপ ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে ; তবে তা হবে তার নিজেরই দায়িত্বহীনতা বা অদূরদর্শিতার ফল। এর পরিণতিও সেই ভোগ করতে বাধ্য হবে। নিজেকে নিজে যত বড় কিছুই ভাবুক না কেন, প্রকৃত ব্যাপারে তার দরুন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হবে না।-তাফহীমুল কুরআন

আকাশজগত ও পৃথিবীর বাদশাহী আল্লাহরই হাতে। কাজেই ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই দান। এসব আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীর প্রতীক, যাকে ইচ্ছা তিনি দেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তিনি তুলে নেন। সবই তাঁর মেহেরবানী। এসব মানুষের অন্তরের কাছাকাছি সত্তা, আর মানুষ বড়ই অনুভূতিশীল জীব। তাই ইতিপূর্বে রিয্ক বা আবশ্যকীয় জীবনোপকরণ সম্পর্কে অনেক কথা আল কুরআনে এসে গেছে। এখানে রিয্ক সম্পর্কিত কথা সন্তান-সন্ততির উল্লেখ দিয়ে পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে। কারণ অন্যান্য ধন-দৌলতের মত সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। আসমান ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন এবং সবকিছুর উপর রয়েছে আল্লাহ তাআলার নিরংকুশ বাদশাহী ও কর্তৃত্ব। এমনিভাবে বলা হয়েছে তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন যাতে মানুষ খুশী হয় আবার এমন জিনিসও পয়দা করেন যাতে মানুষ দুঃখিত হয়। তিনি মানুষকে কখনো তাঁর পসন্দনীয় জিনিস দান করেন আবার কখনো তার থেকে তার প্রিয় জিনিস বা প্রিয়জনকে কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন পুত্র সন্তান। আবার কখনো পুত্র কন্যা দুটোই দেন ; আবার চাইলে কাউকে কিছুই দেন না—রাখেন তাকে বন্ধা বানিয়ে। এসব কিছুই আল্লাহ তাআলারই একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীন। এসব বিষয়ে এখতিয়ার খাটানোর অধিকার তিনি ছাড়া আর কারো নেই। তিনি নিজের ইচ্ছা ও জ্ঞান মোতাবেক এসব কিছু সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু জানেন সবার উপর ক্ষমতা রাখেন।–ফী যিলালিল কুরআন

আয়াতে কারিমায় উপরোক্ত বিষয়ে আল্লাহর, একমাত্র আল্লাহরই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বর্ণনা করতে গিয়ে বাক্যটি শুরু করা হয়েছে لِلّٰهِ শব্দ দিয়ে। বুঝানো হয়েছে পৃথিবীতে মানুষ এসবের হাকীকত না বুঝে শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর ধারণা নিয়ে বসে আছে। তারা বাহ্যত দেখছে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও শক্তি কত কিছুই না করতে পারে—করে যাচ্ছে। অথচ তাদের এ ধারণাটা ভিত্তিহীন। কারণ নিরংকুশ ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি তো একমাত্র আল্লাহই। কিন্তু মানুষ এতই অজ্ঞ যে তারা এসব সৃষ্টি ও ধ্বংস অন্য মানুষের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে নিজেকে অপমানিত করে আর সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে মানুষকে শরীক করে বসে। মানুষের এক গ্রুপের দাবী হলো তারা নিসন্তানকে সন্তান দিতে পারে, রুগীকে সুস্থ করতে পারে তারা আরও কত কি করতে পারে। কিন্তু

এসবই যে ভেলকীবাজী সে বিষয়টি তারা তলিয়ে দেখতে পারছে না। ফলে অপর শ্রেণীর মানুষ ওদের ভেলকীবাজীর খপ্পরে পা দিয়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ করে ফেলে।

এহেন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস যেমন বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্—উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার কোনো কোনো অংশে বিরাজ করছে, ঠিক এমনি আকীদা-বিশ্বাস পূর্ববর্তী জাতিসমূহেও বিরাজিত ছিল। আল কুরআন

আমাদের সে ইতিহাসও জানিয়ে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَـهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"অনেক আলিম-দরবেশ মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে অন্যায়ভাবে বাতিলপন্থায় আর তারা ওদের আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।"

এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিত ও দরবেশগণ সাধারণ জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে রেখেছে, অথচ এদের দায়িত্ব ছিল লোকদের আল্লাহর গোলাম বানিয়ে দেয়ার কাজ করা। অজ্ঞ-মূর্খ জনগণ এসব ধর্মীয় নেতাদের অন্ধ অনুকরণ করে নিজেদের মর্যাদা ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে সেই নেতাদের পেছনে চলে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকেই 'রব'-এর আসনে সমাসীন করেছে। আল কুরআন সে বিষয়েও সুস্পস্ট ঘোষণা দিয়েছে।

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"ওরা ওদের পণ্ডিত-দরবেশদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ্ তাআলার পরিবর্তে।"

আয়াত দুটো মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, ইহুদী-খৃস্টান আলিম ও দরবেশগণ আল্লাহর কিতাব ও ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা-প্রচার করতো নিজেদের স্বার্থ সামনে রেখে ; আল্লাহর গুণ-সিফাত তাদেরও কিছু আয়ত্বাধীন আছে। সন্তান দেয়া, পুত্র সন্তান হওয়া, দুনিয়াতে প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ, স্বাস্থ্য-সুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে যেন তাদেরও কিছু এখতিয়ার রয়েছে। জনসাধারণ এমনি ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতো আর তারাও জনসাধারণের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের তালীম দিতো। পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারী বলে কথিত জাতিসমূহের মত আজকের মুসলিম সমাজেও অনুরূপ ভ্রান্ত

আকীদা-বিশ্বাস সমাজের অভ্যন্তরে জেঁকে বসেছে। ফলে মানুষ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খলীফা হয়ে বাঁচার পথ ধরছে না, তারা নানা শিরকে নিমজ্জিত হয়ে তাওহীদী ধ্যান-ধারণা থেকে বহু দূরে সরে পড়ছে। পরিণামে সিটকে পড়ছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আসন থেকে।

আলোচ্য আয়াত দুটোতে কোনো দম্পতিকে সন্তান দান করা ও না করার ভিত্তিতে মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ এক. যাদের কেবল ছেলে সন্তান দেন, দ্বিতীয়. যাদের কেবল কন্যা সন্তান দেন, তৃতীয় যাদের ছেলেমেয়ে উভয় প্রকার সন্তানই দান করেন এবং চতুর্থ যাদের ছেলেমেয়ের কোনেটিই দেন না—বন্ধ্যা রাখেন।

ইতিহাসে মানব সন্তান সৃষ্টির পদ্ধতির ব্যাপারেও মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ এক. আল্লাহর কুদরতে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। যেমন হযরত আদম আ.-কে মাতাপিতা ছাড়া অর্থাৎ মহিলা-পুরুষ ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয়, মা হাওয়া আ.-কে আদম থেকে তথা কেবল পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয়, হযরত ঈসা আ.-কে শুধু তাঁর মা মারইয়াম থেকে (পিতা ছাড়া) সৃষ্টি করা হয়েছে। চতুর্থ, বাকী সকল মানুষকে মা-বাপ থেকে পুরুষ-মহিলার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। মানব সৃষ্টির এসব পার্থক্যের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতের রহস্য নিহিত রয়েছে—আল্লাহর কুদরতের রহস্যে হাত দেয়ার মত অথবা তাঁর এ নিয়মের পরিবর্তন করার নিরংকুশ ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই।

❒

সাঁইত্রিশ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষেরা! আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

মানব সৃষ্টি একজন পুরুষ একজন নারী থেকে। মানব মর্যাদার মূল ভিত্তি 'তাকওয়া'। জাতি ও গোত্র বিভক্তি পরিচিতি মাত্র।

আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ তাদের মূল যে এক ও অভিন্ন সে বিষয়ে এক বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য ঘোষণা করেছেন। এর উদ্দেশ্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের মূল যে এক ও অভিন্ন, তাদের মর্যাদা নিরূপণের মানদণ্ড যে এক ও অভিন্ন এবং সেটাই যে এ মহান ইসলামী সমাজের ভিত্তি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। বলা হয়েছে হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি ; অতপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা পৃথিবীতে পরস্পর পরিচিত হতে পার। জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে তাকওয়াবান ব্যক্তিই সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

এর তাৎপর্য হলো, বহু বর্ণে ও জাতিতে বিভক্ত হে মানব সমাজ! তোমাদের মূল এক ও অভিন্ন। সুতরাং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না এবং ধ্বংস হয়ে যেয়ো না। হে মানবজাতি আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে আর মারামরি

কাটাকাটি করে মরে যাবে। বরং এটা ছিল পরস্পর পরিচিতির জন্য। বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, চরিত্র, প্রতিভা ও যোগ্যতার বিভিন্নতা একটা সৃষ্টিগত বৈচিত্র মাত্র। এ বিভিন্নতা বিবাদ-বিসম্বাদ ও শত্রুতা দাবী করে না, বরং দাবী করে মানব জাতির সকল দায়িত্ব বহনে ও সকল চাহিদা পূরণে পারস্পরিক সহযোগিতা। বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূমি এবং এ ধরনের অন্য সকল উপকরণের কোনো মূল্য আল্লাহর দৃষ্টিতে নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা পরিমাপ করার ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করার একটি মাত্র মানদণ্ড আছে। আর সেই মানদণ্ড হচ্ছে 'তাকওয়া'—আল্লাহ্ সম্পর্কে মানুষের সাবধানতা ও সচেতনতা সে বিষয়টির প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন এই বলে যে, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ –"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মর্যাদায় সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের সবাইর চেয়ে অধিকতর তাকওয়াবান।" এভাবে পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিবাদ-বিসম্বাদের সকল কারণ তিরোহিত হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের প্ররোচক সকল কারণ দূরীভূত হয়ে যায় আর মৈত্রী ও সহযোগিতার একটি মাত্র কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ সকলের একমাত্র উপাস্য এবং মানুষ সৃষ্টির মূল উৎস এক ও অভিন্ন। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের যোগ্য হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া—আল্লাহর সম্পর্কে সাবধানতা। এ মাপকাঠিকেই ইসলাম যথার্থ মাপকাঠিরূপে ঘোষণা করেছে মানবজাতিকে সকল প্রকার বর্ণ, বংশ, ভাষা ও গোত্র-ভিত্তিক সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য। কেননা এ সবই তো জাহেলিয়াত থেকে উদ্ভূত—তার নাম পরিচয় যা-ই থাক না কেন। এগুলোর সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই।–ফী যিলালিল কুরআন

আলোচ্য আয়াতটিতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এমন এক চরম ভ্রান্তি ও গোমরাহীমূলক বিষয়ে সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে যা গোটা বিশ্বে এক সর্বাত্মক মারাত্মক বিপর্যয় ও চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলো বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার বিদ্বেষ। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিটি যুগে মানুষ সাধারণত মনুষ্যত্বকে ভুলে গিয়ে নিজেদের চতুষ্পার্শে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনী রচনা করে নিয়েছে যার ভিতরে জন্মগ্রহণকারীকে সে আপন বলে গ্রহণ করেছে আর তার বাইরে জন্মগ্রহণকারীকে ভিন্ন, অপর বা শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে। অথচ এ পরিবেষ্টনী কোনো বিবেক-বুদ্ধি বা নীতি-আদর্শ কিংবা নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। গড়ে উঠেছে জন্মের অ-ইচ্ছামূলক ভিত্তির উপর। কোথাও তার ভিত্তি হচ্ছে বিশেষ কোনো বংশ, পরিবার বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করা, কোথাও কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে জন্মগ্রহণ করা, আবার

কোথাও কোনো বিশেষ বর্ণধারী বা ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। এসবগুলোই হলো মানুষে মানুষে পার্থক্য করার কথিত আধুনিক ভিত্তি।

ইহুদীরা এরই ভিত্তিতে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর পসন্দ করা বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করে ও সেজন্যে গৌরব করে। তাদের ধর্মীয় হুকুম-আহকামে পর্যন্ত অ-ইসরাঈলীদের অধিকার ও মান-মর্যাদা ইসরাঈলীদের তুলনায় হীনতর বানিয়ে রেখেছে। হিন্দু সমাজের বর্ণ বিচার এ পার্থক্যবোধের কারণেই গড়ে উঠেছে। তাতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উঁচু জাতের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের গভীরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণাংগের পার্থক্য আফ্রিকায় ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগ লোকদের উপর যে অমানুষিক যুলুম ও নিপীড়ন চালিয়েছে তার মর্মান্তিক কাহিনী তো ইতিহাসের পাতায় খুঁজতে হবে না—বর্তমান শতাব্দীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তা স্বচক্ষে দেখতে পারে। পাশ্চাত্যের জাতি-সমূহের হিংস্র জাতীয়তাবাদ এক একটি জাতিকে অন্যান্য জাতিগুলোর জন্য হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। নিকট অতীতে ও অতিসম্প্রতি সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেছে।–তাফহীমুল কুরআন

এ অত্যন্ত মারাত্মক ও সর্বধ্বংসী অন্ধ ও হিংস্র জাতীয়তাবাদের যথার্থ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা আজকের বিশ্ববাসী এ আয়াত থেকে গ্রহণ করতে পারে। আয়াতটি যেন আজকের পৃথিবীর মানবজাতির নাজাতের দিকনির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আয়াতে কারীমার মূলভাষ্য নিম্নরূপ

আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে যে মূল নির্দেশনা দিয়েছেন তাহলো, হে পৃথিবীর মানব জাতি! তোমাদের সকলের—সমস্ত মানুষের মূল ও উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হতেই গোটা মানবজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে দুনিয়াতে মানুষের যত বংশ বা গোত্র রয়েছে তা সবই মূলত একটি প্রাথমিক বংশেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। আর এর সূচনা হয়েছিল এক পিতা ও এক মাতা থেকে। তোমরা এ পর্যায়ে যে ভাব ও ধারণা পোষণ করছো, তা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির ধারায় কোথাও কোনো পার্থক্য বা উঁচু-নিচুর তারতম্য নেই—তা করার কোনো ভিত্তিও নেই। এক ও অনন্য আল্লাহ তাআলাই তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। বিভিন্ন মানুষ বা মানব বংশকে

বিভিন্ন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন, এমনও কিছুতেই নয়। একই প্রাণী জীবাণু হতে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ বা মানব বংশকে কোনো পবিত্র বা উন্নতমানের জীবাণু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অন্য কিছু লোক বা বংশকে কোনো অপবিত্র ও নিম্নমানের সৃষ্টি বীজ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এমন ধারণা করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও সম্পূর্ণ অভিন্ন। সে অভিন্ন ও একই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ। মানব সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিতেও একবিন্দু পার্থক্য নেই। সে জন্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। তোমরা সকলে একই পিতা-মাতার সন্তান। সকলের দেহে একই পিতা-মাতার শোণিতধারা প্রবাহিত। মানুষের প্রাথমিক যুগল ভিন্ন ভিন্ন ছিল না এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনতা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণ করেনি।–তাফহীমুল কুরআন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম মানুষ হযরত আদম আ. থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ.-কে, আর এ দুজন থেকে সকল বনী আদমকে। মানব জাতির অস্তিত্ব লাভে, তাদের স্থিতি, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে নারী-পুরুষের মাধ্যম আল্লাহর গৃহীত সাধারণ নীতি। অবশ্য এতে নারীর ত্যাগ ও ভূমিকা সর্বাধিক।

ইসলামী জীবন পদ্ধতির নির্দেশিকা আল কুরআন বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার একমাত্র নির্ভুল বাণী সম্ভার। আল্লাহর মহাসৃষ্টি মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন এই আল কুরআন। আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব মানুষের কৃত্রিম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাসহ সকল প্রকারের সংকীর্ণতার জাল ছিন্ন করে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। আজকের পৃথিবীতে একটা সভ্য সমাজ গড়ার তথা বিশ্ব-পরিবার গঠন বা বিশ্বায়ণের প্রবক্তা ও অনুরূপ চিন্তা-গবেষণার ধারকদের জন্যে এর চেয়ে উদার ও সার্বজনীন অমোঘ বিধানের নযীর আর কোথায়ও কি আছে ?

❐

আটত্রিশ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

"সেদিন তুমি দেখবে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের সম্মুখে ও ডানদিকে তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই হবে মহাসাফল্য। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে, আমাদের জন্য একটু থাম, আমরা তোমাদের নূর থেকে যেন একটু গ্রহণ করতে পারি। ওদের বলা হবে, পেছনে ফিরে গিয়ে নূর খোজ। তারপর উভয়ের মধ্যখানে স্থাপিত হবে একটা প্রাচীর যার একটা দরজা থাকবে, এর ভিতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।"-সূরা আল হাদীদ ঃ ১২-১৩

কিয়ামতের দিন মুনাফিক নারী-পুরুষরা ঈমানদার নারী-পুরুষের কাছে নূর ভিক্ষা চাইবে

কিয়ামতের কঠিন দিনে কেবল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণই এমন অবস্থায় থাকবে যে, তাদের সম্মুখে ও ডানদিকে নূর চমকিতে থাকবে। কাফির-মুনাফিক, ফাসেক-ফাজির প্রভৃতি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরবে। যেভাবে এরা দুনিয়ার জীবনে দীন ইসলামের আলোতে জীবনযাপন না করে যথেচ্ছভাবে জীবন কাটিয়েছে। এদের দুনিয়ার জীবনটা নিজেরাই ইসলাম থেকে দূরে থেকে বিভ্রান্তিতে শেষ করে দিয়েছে। ঐ দিনের মুমিনগণের সেই নূর তো হবে তাদের ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও যথার্থ নেক আমলসমূহের ফল স্বরূপ। ঈমানের সত্যতা-যথার্থতা ও চরিত্র-নৈতিকতার স্বচ্ছতাই সেদিন নূর-এ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাতে নেক বান্দাদের ব্যক্তিত্ব

উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তির আকীদা ও আমল যতটা আলোকময় ও স্বচ্ছ হবে, তার অস্তিত্বের নূর ততবেশী আলোময় ও তেজস্বীরূপ ধারণ করবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে বের হয়ে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে তখন তার নূর তার সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে। হযরত কাতাদাহ্ বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস একথাটার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা পেশ করে। তিনি বলেন, রসূলে করীম স. ইরশাদ করেছেন, কারো নূর এতটা তেজস্বী হবে যে, মদীনা হতে 'এডেন' পর্যন্তকার দূরত্ব সমান স্থানে পৌঁছে যাবে। আর কারো নূর 'মদীনা' হতে 'সানা' পর্যন্ত এবং কারো তার চেয়ে আরও কম। এমনকি এমন মুমিনও হবে যার নূর তার পায়ের বেশী দূরত্বে পৌঁছবে না। মোটকথা, যার দ্বারা সার্বিক কল্যাণ দুনিয়াতে যতটুকু বিস্তৃতি লাভ করে তার নূর ততটা তেজস্বী ও চমকানো হবে। আর দুনিয়ার যে যে স্থান পর্যন্ত তার কল্যাণ পৌঁছে থাকবে হাশরের মাঠে ততটা দূরত্ব পর্যন্ত তার নূরের আলোকচ্ছটা দৌড়াতে থাকবে।–তাফহীমুল কুরআন

আল কুরআন ঈমানদার নারী-পুরুষের সামনে ও ডানে তার নূর চমকাতে থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাহলে বামদিক কি অন্ধকারে থেকে যাবে ? ব্যাপারটি এমন না। বরং ডানদিক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠলে বামদিকও উজ্জ্বল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আলো তার ডান হাতেই ঝুলতে থাকবে। আর এর উজ্জ্বলতা চতুর্দিক উদ্ভাসিত করবে। নবী করীম স.-এর এক হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হযরত আবু যর ও হযরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেছেন রসূলে করীম স. বলেছেন ঃ

اَعْرِفُهُمْ بِنُوْرِهِمُ الَّذِىْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

"আমি তাদের চিনতে পারবো তাদের সেই নূরের দ্বারা, যা তাদের সামনে ডানে ও বামে দৌড়াতে থাকবে।"–হাকেম, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদূইয়া থেকে তাফহীমুল কুরআন।

এ নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাত চলার কিছু পূর্বে সংঘটিত হবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি কিছু দীর্ঘ। এতে আছে আবু উমামা রা. একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তিনি মৃত্যু কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেয়া হলো ঃ

"অতপর তোমরা কবর থেকে হাশরের মাঠে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিল আল্লাহ তাআলার

হুকুমে কিছু মুখাবয়বকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে। আর কিছু চেহারাকে করে দেয়া হবে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আরেক মনযিলে সমবেত সকল মুমিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছু দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারো নূর পর্বত পরিমাণ, কারো খেজুর বৃক্ষ পরিমাণ, আর কারো হবে মানবদেহ পরিমাণ। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে। তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে।–ইবনে কাসীর থেকে মাআরেফুল কুরআন।

পুলসিরাতের ঘটনাটি ঘটবে এভাবে যে, কাফিররা তো পুলসিরাতে যাবে না বরং প্রথমেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। হাঁ যারা কোনো নবীর উম্মতভুক্ত হবে তাদের পুলসিরাতের উপর দিয়ে পার হতে হবে। পুলসিরাতের উঠার আগে এক গাঢ় অন্ধকার লোকদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সেই সময় ঈমানদারদের সাথে উক্ত নূর থাকবে। মুনাফিকরাও সেই নূরের আলোতে ঈমানদারগণের পেছনে পেছনে চলতে চাইবে। কিন্তু মুমিনগণ দ্রুত সামনে এগিয়ে যাবে। ফলে তাদের আলো মুনাফিকদের থেকে দূরে সরে যাবে। তখন মুনাফিকরা চিৎকার দিয়ে বলবে, আরে একটু থাম না, আমাদেরকে পেছনে অন্ধকারে ফেলে চলে যেয়ো না। সামান্য অপেক্ষা কর যেন আমরাও তোমাদের আলোতে চলতে পারি। আর তোমাদের নূর থেকে উপকৃত হতে পারি। দুনিয়াতে তো আমরা তোমাদেরই সাথী ছিলাম, আর আমাদেরও প্রকাশ্যে মুসলিমদের মধ্যেই গণ্য করা হতো। আজ এ কঠিন মুসিবতের সময় আমাদের অন্ধকারে ফেলে কোথায় যাচ্ছ—এটাই কি বন্ধুত্বের হক ? উত্তর আসবে, পেছনে গিয়ে নূর অনুসন্ধান করো। নূর পেলে তো ওখান থেকেই পেতে পারবে। একথা শুনে তারা পেছনে হটবে। ইত্যবসরে উভয়ের মধ্যখানে দেওয়াল স্থাপিত হয়ে আড়াল হয়ে যাবে। "পেছনে গিয়ে নূর অনুসন্ধান কর"—ارْجِعُوْا وَرَائَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا বলার অর্থ এ নূর তো ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে দুনিয়াতে অর্জন করা যায়। আখিরাত তো ঈমান-আমলের ফল ভোগ করার স্থান। সুতরাং নূর অর্জনের স্থানে তো পেছনে অর্থাৎ দুনিয়াতে চলে যাও আর ঈমান-আমলের পুঁজি নিয়ে আস। অথবা পেছনে যাওয়ার অর্থ পুলসিরাতে উঠার পূর্বে যেখানে নূর বণ্টন করা হয়েছে সেখানে চলে যাও। অথবা একথাটা ঈমানদারগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলবে যে পেছন

থেকে নূর নিয়ে এসো।–আল কুরআনুল করীম–মাওলানা মাহমূদুল হাসান ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

হাশরের ময়দানে পুলসিরাত পার হওয়ার প্রাক্কালে অত্যন্ত অন্ধকার হবে। তখন প্রত্যেকের ঈমান ও আমালে সালেহ্ তার সাথে থাকবে এবং এর আলোকে তারা চলতে থাকবে। সম্ভবত ঈমানের নূরের স্থান তো হলো 'কল্ব'—যা হবে সম্মুখ ভাগে আর আমালে সালেহ্-এর নূর থাকবে ডান দিকে। কারণ নেক আমলসমূহ ডান দিকেই জমা হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঈমান-আমলের মর্যাদা অনুযায়ী তার নূর কমবেশী হতে থাকবে। উম্মাতে মুহাম্মদী স.-এর নূর তাঁর খাতিরে অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় খুব উজ্জ্বল ও তেজস্বী হয়ে থাকবে।

মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যখানে দেওয়াল দিয়ে আড়াল করে দেয়া হবে। সেই দেওয়ালের একটা দরজা হবে। সেই দরজা দিয়ে মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করে মুনাফিক থেকে আড়ালে চলে যাবে। সেই দরজার ভেতরে গিয়ে মুমিনগণ জান্নাতের শান্তি পাবে আর তার বাইরের দিকে থাকে আল্লাহর আযাবের দৃশ্য।–আল কুরআনুল করীম-মাওলানা মাহমূদুল হাসান, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

❒

উনচল্লিশ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ق وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

"আল্লাহ্ অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে আর সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"–সূরা মুজাদালা ঃ ১

যে নারীর অভিযোগ সপ্ত আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে ও গৃহীত হয়েছে

যে মহিলার ব্যাপার সম্পর্কে এ আয়াত ও তৎপরবর্তী কটি আয়াত নাযিল হয়েছিল তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের খাওলাহ্ বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল আওস ইবনে সামেত আনসারী। মহিলার স্বামী 'জিহার' করেছিলেন। 'জিহার' শব্দ 'জাহরুন' শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ পিঠ। তৎকালীন আরব সমাজে প্রায় এমন ঘটতো যে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদ হলে স্বামী রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলতো, اَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ-তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের তুল্য। একথার তাৎপর্য হলো, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য নিজের মায়ের সাথে সহবাস করার সমান। অর্থাৎ তুমি আমার জন্য হারাম।

জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে এ ধরনের বাক্য তালাক—বরং তালাক থেকেও অধিক কঠিনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হতো। কেননা তাদের কাছে এর অর্থ ছিল স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে শুধু বিবাহ সম্পর্কই ছিন্ন করছে না, বরং তাকে মায়ের মত নিজের জন্য হারামও বানিয়ে নিচ্ছে। এ কারণে আরব সমাজে তৎকালে তালাক দেয়ার পরেও স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার একটা উপায় থাকতো। কিন্তু জিহার করার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের আর কোনো উপায়ই থাকতো না।–তাফহীমুল কুরআন

হযরত আওস ইবনে সামেত একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন, اَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ -তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, অর্থাৎ হারাম। এভাবে খাওলার স্বামী জিহার করার পর হযরত খাওলা রা. এর শরীয়ত সম্মত বিধান জানার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি কোনো বিধান নাযিল হয়নি। তাই তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন مَا اَرَاكِ الا قد حرمت عليه। "আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছো।" একথা শুনামাত্র খাওলা রা. বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন, আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এ ব্যবহার করলো ! আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ হবে কিভাবে ? এক রেওয়ায়াতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে, مَا ذَكَرَ طَلَاقًا-আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেননি, এমতাবস্থায় তালাক হয়ে গেল কিভাবে ? অন্য এক বর্ণনায় আছে, খাওলা আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوا اِلَيْكَ। আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। এক রেওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ স. খাওলাকে বললেন, مَا اُمِرْتُ فِى شَانِكِ بِشَئٍ حَتَّى الان তোমার বিষয়ে আমার প্রতি এখনও কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। এসব রেওয়ায়াতে কোনো বৈপরিত্য নেই, সবকটিই সঠিক হতে পারে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।-দুররে মানছুর ও ইবনে কাসীর থেকে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতে এ মহিলা সাহাবীর স্বামীর জিহার করার বিষয় নিয়ে রসূলে করীম স.-এর কাছে গিয়ে বারবার বাদানুবাদ করা এবং আল্লাহর কাছে তার ফরিয়াদ করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ ..... আল্লাহ নিশ্চয়ই সে মহিলার অভিযোগ শুনেছেন— তার ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন। এ মহিলা সাহাবীর ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট শ্রুত ও গৃহীত হওয়া এবং সাথে সাথে আল্লাহর নিকট থেকে অনুকূল ফরমান জারি হওয়া এমন একটি ব্যাপার যার দরুন সাহাবায়ে কিরামের সমাজে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। ইবনে আবু হাতিম ও বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ওমর রা. একবার কতিপয় সংগী-সাথীসহ কোথায়ও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে দাঁড়ালে হযরত ওমর রা. থেমে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার বক্তব্য শুনতে থাকলেন। তার কথা শেষ করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সাথীদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, আপনি এ বৃদ্ধার কারণে কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে এত সময় এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ? তখন হযরত ওমর রা. বললেন, তোমরা কি জানো, কে এই মহিলা ? ইনি খাওলা বিনতে সা'লাবা। ইনি এমন এক মহিলা যার অভিযোগ সপ্ত আকাশের উপর শোনা হয়েছে। আল্লাহর কসম, ইনি যদি আমাকে রাত পর্যন্তও দাঁড়

করিয়ে রাখতেন, তাহ্লেও আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেবল নামাযের সময় হ্লে তাঁর কাছে অবসর চেয়ে নিতাম।

ইবনে আবদুল বার কাদাতা থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ মহিলা পথিমধ্যে হ্যরত ওমর রা.-এর সম্মুখীন হলে তিনি তাঁকে সালাম করলেন। মহিলা সালামের জবাব দানের পর বলতে লাগলেন, হে ওমার এমন একটা সময় ছিল যখন আমি তোমাকে উকাজের বাজারে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন সবাই তোমাকে উমাইর বলতো, হাতে লাঠি নিয়ে ছাগল চরাতে। অতপর কিছু দিন যেতে না যেতেই লোকেরা তোমাকে ওমার বলতে শুরু করে। আরও কিছুদিন পর তোমাকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হতে থাকে। প্রজাসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে। স্মরণ রেখ, যে লোক আল্লাহ্র অভিশাপকে ভয় করে, তার জন্য দূরের লোকও নিকটাত্মীয় স্বরূপ হয়ে যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে তার সম্পর্কে আশংকা সে যে জিনিসকে রক্ষা করতে চায়—তাই হয়ত সে হারিয়ে ফেলবে। একথা শুনে হ্যরত ওমর রা.-এর সাথী জারুদ আবদী বললেন, হে মহিলা! তুমি আমীরুল মুমিনীনের সাথে খুব বে-আদবী করছো ! হ্যরত ওমর রা. বললেন, উনাকে বলতে দাও। জান ইনি কে ? তাঁর কথা তো সপ্ত আকাশের উপরও শোনা হয়েছে, ওমরকে তো অবশ্যই শুনতে হবে। ইমাম বুখারী রহ.ও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সংক্ষেপে এরূপ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।–তাফহীমুল কুরআন

❐

চল্লিশ

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِى وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। এ লোকেরা তো একটা অসংগত ও অসত্য কথা বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও বড়ই ক্ষমাশীল।"–সূরা মুজাদালা ঃ ২

স্ত্রীকে 'মায়ের মত' বললে সে তার মা হয়ে যায় না

তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগে এ যিহার করলে যিহারকারীর স্ত্রী তার জন্য মায়ের মতই হারাম হয়ে গেছে বলে তাকে আর স্ত্রীরূপে গণ্য করা হতো না। এ যুগেও অনেক অজ্ঞ-মূর্খ লোক ঝগড়া-ঝাটি করে না বুঝেশুনে নিজের স্ত্রীকে নিজের মা, বোন ও মেয়ের সাথে তুলনা দেয়। বলে, তুই আমার জন্য আমার মায়ের মত, তুই আমার জন্য আমার বোনের মত, তুই আমার জন্য আমার মেয়ের মত। এমন কথার স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায়, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না, বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে, যারা তার জন্য মুহরিম। এ ধরনের কথা বলাকে ফিক্হের ভাষায় যিহার (ظهار) বলে। আরবী ভাষায় এ যিহার শব্দ যাহরুন থেকে নির্গত। এ র অর্থ সওয়ারী—যার ওপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবীতে যাহরুন (ظهر) বলা হয়। কেননা এর পিঠের উপর আরোহণ করা হয়। জাহেলিয়াতের সমাজে লোকেরা নিজের স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো, তোমাকে 'যাহর'—সাওয়ারী বানানো আমার জন্য নিজের মাকে সাওয়ারী বানানোর মতই হারাম। এ কারণে এ ধরনের বাক্য বা উক্তি মুখে উচ্চারণ করাকে যিহার (ظهر) বলা হতো।

'যিহার' সম্পর্কে ইসলামের ফায়সালা হলো, কেউ যদি নির্লজ্জের মত নিজের স্ত্রীকে মা'র মত বলে, তবে তার একথায় সেই স্ত্রী তার মা হয়ে যেতে পারে না ; না মার মত মর্যাদা, সম্ভ্রম ও পবিত্রতা পেতে পারে। মায়ের মা হওয়া একটা প্রকৃত ও বাস্তব ব্যাপার। কেননা সেই তো তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে। এ কারণে পুত্রের জন্য সে চিরতরে হারাম, চির সম্মানার্হ। কিন্তু যে নারী তাকে গর্ভে ধারণ করেনি, তাকে কেবল মুখে মা

বললেই সে মা হয়ে যেতে পারে না। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিকতা; আইন কোনো একটি দিক দিয়ে কি তার জন্য সেই মর্যাদা-সম্ভ্রম ও পবিত্রতা হতে পারে যা বাস্তবতার কারণে প্রকৃত গর্ভধারিণী ও জন্মদায়িনী মা'র জন্য রয়েছে? এ কারণে জাহেলিয়াতের যুগের নিয়মকে আল্লাহ্ তাআলা বাতিল ঘোষণা করেছেন। তখন যিহারকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর বিবাহ্ সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যেতো এবং সে তার জন্য তার মায়ের মতই চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেতো। আল্লাহর এই ঘোষণার ফলে এ বদ রসমের চির অবসান হয়ে গেল।

স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা—বলে দেয়া যে তুমি আমার মায়ের মত। এতো এক হাস্যকর, অর্থহীন ও অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক—কোনো ভদ্র ব্যক্তি এর কল্পনাও করতে পারে না, করা উচিত নয়। মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, একথা আসলেও মিথ্যা। কেননা কেউ যদি বলে তার স্ত্রী এখন তার মা হয়ে গেছে, তাহলে সে তো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে ফেললো। আর যদি সে এরূপ কথা বলে বুঝাতে চায় যে, তার স্ত্রী এখন তার মায়ের মতই হারাম হয়ে গেছে, সে তাকে তার মায়ের মর্যাদা দিয়েছে, তবে তাও সম্পূর্ণ অসত্য কথা, পুরোপুরি মিথ্যাবাদী। কেননা কেউ যদি নিজ ইচ্ছা মত কোনো স্ত্রীলোককে কখনো নিজ স্ত্রী বানাবে, আবার কখনো মায়ের মর্যাদা দিবে—এরূপ অধিকার আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেননি। আইন-বিধান রচয়িতা সে নিজে নয়—আল্লাহ্ই শরীয়ত রচয়িতা বিধানদাতা।

আর আল্লাহ্ তাআলা তো প্রসবকারিণী মা'র সাথে দাদী, নানী ও শাশুড়ী, দুধ সেবন করিয়েছে যে নারী এবং নবীর স্ত্রীগণকে মায়ের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কেউ নিজের ইচ্ছামত অপর কোনো নারীকে এর মধ্যে শামিল করার অধিকার আল্লাহ্ কাউকে দান করেননি। যে মহিলা তার স্ত্রী হয়ে আছে তাকে এর মধ্যে গণ্য করার তো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ্ তাআলার উক্ত ঘোষণা থেকে আইনের এ ধারাটি জানা গেল যে, 'যিহার' করা অতি বড় গুনাহ ও হারাম কাজ। যে লোক এ কাজ করে, সে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অসীম অনুগ্রহ এই যে, তিনি প্রথমত 'যিহার' সংক্রান্ত জাহেলিয়াতের প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করে মুমিনদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর দ্বিতীয়ত, এ কাজ যারা করে তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ও হালকা ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন। এমন কাজের শাস্তি এর চেয়ে অধিক সহজ ও হালকা আর কি

হতে পারে? তাছাড়া আল্লাহর বড় অনুগ্রহ এই যে, এ শাস্তি কোনো বেত্রাঘাত কিংবা নির্যাতন রূপে নয় বরং কয়েকটি ইবাদাত ও নেক কাজ রূপেই ধার্য হয়েছে। এ কাজগুলো এমন যে এতে করে মুমিনদের নফসের পরিশুদ্ধি করণ এবং মুমিনদের সমাজে কল্যাণ প্রসারে বিশেষ কার্যকর।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইসলামে কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি বিধানে কাফ্ফারা স্বরূপ কতিপয় ইবাদাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ পর্যায়ের ইবাদাতগুলোতে ইবাদাতও শাস্তি—এ দুটো দিকই পুরো মাত্রায় বর্তমান। এসব পালন করতে যেমন শাস্তির কষ্ট ভোগ করতে হয় তেমনি সেই সাথে একটি নেকও ইবাদাতের কাজ করে নিজের গুনাহের প্রায়শ্চিত্তও করে নিতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের যুগে যিহার সংক্রান্ত ব্যাপার সর্বপ্রথম হযরত আউস ইবনে সামেত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী হযরত খাওলার আকুল আর্তনাদের ফলেই যিহারের কারণে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান স্বরূপ এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

সূরার ২য় ও ৩য় আয়াতে যিহারের সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ নাযিল হয়। যার তরজমা হলো এই—"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, পরে নিজের সেই কথা থেকে ফিরে যায়, যা তারা বলেছিল। পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। একথা দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত আছেন। যে মুক্ত করার জন্য দাস পাবে না সে যেন একাধারে দু মাস রোযা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে লোক এটাও করতে সমর্থ নয় সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়। এ নির্দেশ এজন্যে যে তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। এটাই আল্লাহর দেয়া সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

উপরোক্ত আয়াত দুটোতে কেউ যিহার করলে তার প্রতিবিধান স্বরূপ তিনটে বিকল্প ইবাদাতমূলক কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যিহারকারী তার স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখার জন্য তার যিহার করার অযৌক্তিক অন্যায় কথার কাফ্ফারা স্বরূপ তাকে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। তার যদি গোলাম আযাদ করার সামর্থ না থাকে তাহলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখতে হবে, আর যদি সে রোযা রাখার সমর্থও না রাখে তবে তার কাফ্ ফারা হলো ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। ব্যাস, যিহারকারী উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্য থেকে সামর্থানুযায়ী যে কোনো একটি কাজ করলেই তার স্ত্রীকে পূর্বের ন্যায় স্ত্রী হিসেবে গণ্য করতে পারবে।

একচল্লিশ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এসে একথার উপর বাইয়াত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না, আর সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না। তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২

রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে নারীদের আনুগত্যের শপথ

এ আয়াতে মুসলিম নারীদের থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ শপথ ছিল ঈমান ও আকায়িদ সহ শরীয়তের বিধান পালনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অংগীকার। পূর্ববর্তী আয়াতে যদিও এ শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং সকল মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ গ্রহণ করেছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন, আমি এবং আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অংগীকার নেন এবং সাথে সাথে এ বাক্যও উচ্চারণ করেন, فيما استطعن واطقن অর্থাৎ আমরা এসব বিষয়ে অংগীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেন ঃ এ থেকে জানা

গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অংগীকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অংগীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচারণ হয়ে গেলে তা অংগীকার ভংগের শামিল হবে না।–তাফসীরে মাযহারী

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা রা. এ শপথ সম্পর্কে বলেন, মহিলাদের এ শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হতো। বস্তুত রসূলুল্লাহ স.-এর হাত কখনো কোনো গায়রে মুহরিম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।–তাফসীরে মাযহারী

হাদীস্ থেকে প্রমাণিত যে, এ শপথ কেবল হুদাইবিয়ার ঘটনার পরেই নয়, বরং বার বার হয়েছে। এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ স. পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।–মাআরেফুল কুরআন

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ বংশের লোকেরা দলে দলে নবী করীম স.-এর নিকট 'বাইয়াত' হওয়ার জন্য উপস্থিত হতে লাগলো। সাফা পর্বতের উপর তিনি নিজে পুরুষদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আর হযরত ওমর রা.-কে স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণের জন্য নিজের তরফ থেকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যেন এ আয়াতের কথাগুলোর স্বীকৃতি তাদের নিকট থেকে আদায় করেন, সেই নির্দেশও তাঁকে দেয়া হয়েছিল। পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর একটি বাড়ীতে আনসারদের স্ত্রীলোকদের একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত ওমর রা.-কে তাদের নিকট থেকে বাইয়াত নেয়ার জন্য পাঠালেন। ঈদের দিনেও পুরুষদের সামনে ভাষণ দেয়ার পর নবী করীম স. স্ত্রীলোকদের সম্মেলন স্থানের দিকে চলে যান এবং ভাষণ দানকালে তিনি এ আয়াত পাঠ করে এ কথাগুলোর প্রতিশ্রুতি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করলেন। এসব ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীলোকেরা এককভাবে ও সামষ্টিকভাবে নবী করীম স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে বাইয়াত করতে থাকেন। বহু কটি হাদীসে একথার উদ্ধৃতি রয়েছে।–তাফহীমুল কুরআন

মক্কা শরীফে স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে যখন 'বাইয়াত' গ্রহণ করা হচ্ছিলো তখন হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবা এ হুকুমের ব্যাখ্যা

চেয়ে নবী করীম স.-এর নিকট প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমি যদি তার কাছে না বলে তার মাল-সম্পদ থেকে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য কিছু গ্রহণ করি, তবে তাতে কি আমার গুনাহ্ হবে ? নবী করীম স. জবাবে বললেন, না, তবে শুধু প্রচলিত পরিমাণ, তার বেশী নয়। অর্থাৎ যতটা ঠিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার ততটা গ্রহণ করলে তা চুরির পর্যায়ে পড়বে না এবং তাতে গুনাহ্ও হবে না।-আহ্কামুল কুরআন, ইবনে আরাবী থেকে তাফহীমুল কুরআন।

রসূল স.-এর যুগের মুসলিম নারীগণ তাঁর কাছে যেসব বিষয়ে শপথ করেছিলেন, আয়াতে বর্ণিত সেসব বিষয়াবলী নিম্নরূপ ঃ

এক. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, নির্ভেজাল তাওহীদী জিন্দেগী যাপন করা, দুই. চুরি না করা—হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী এ বিষয়েরই ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন রসূলে করীম স.-এর কাছে। নারীদের অনেকেই স্বামীর অর্থ-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্থ ছিল বিধায় বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ছিল। তিন. যিনা বা ব্যভিচার না করা—নারীরা এ ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা রাখতে পারলে পুরুষদের জন্য আত্মরক্ষা করাও সহজতর হতে পারে। চার. নিজেদের সন্তানকে হত্যা না করা। জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অমানবিক কাজের প্রচলন ছিল বিধায় মুসলিম নারীদের তা থেকে কঠোরভাবে বারণ করা হয়। পাঁচ. মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ থেকে বিরত থাকা—এ বুহ্তান বা অপবাদ সম্বলিত আয়াতে দু ধরনের মিথ্যা দোষারোপ বুঝায়। কোনো স্ত্রীলোকের অপর নারীর প্রতি পর-পুরুষের সাথে গোপন প্রণয়ের দোষারোপ রচনা করা এবং এ ধরনের মিথ্যা গল্প সমাজে প্রচার করে বেড়ানো এক ধরনের মিথ্যা দোষারোপ—বুহ্তান। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এ ধরনের কথা প্রচার করে বেড়ানোর একটা সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর কোনো স্ত্রীলোক যদি পর-পুরুষের নিকট থেকে গর্ভধারণ করে নিজের স্বামীকে বুঝায় যে, এটা তোমার সন্তান। তাহলে একাজটাও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে শামিল। আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম স.-কে বলতে শুনেছেন, যে স্ত্রীলোক কোনো বংশে এমন কোনো সন্তান নিয়ে আসে (প্রসব করে) যা সেই বংশের সন্তান নয়। আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আর আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।-তাফহীমুল কুরআন

ছয়. অত্র আয়াতের ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে, একটি সাধারণ বিধি। আর তা হচ্ছে وَلَا يَعْصِينَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ –অর্থাৎ ভাল কাজে (হে রসূল) আপনার

আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ স. যে কোনো কাজের আদেশ দিবেন তা কিছুতেই ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই অসম্ভব। এমতাবস্থায় فِىْ مَعْرُوْفٍ বলে 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তা হচ্ছে মুসলমানরা যেন ভাল করেই বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে কোনো মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়। এমনকি তিনি যদি রসূলও হন। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথে এ শর্তটি যুক্ত করে দিয়েছেন।–মাআরেফুল কুরআন

কিন্তু এখানে فِىْ مَعْرُوْفٍ কথাটি প্রকৃতপক্ষে শর্ত স্বরূপ সংযুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং এটা রসূলের আনুগত্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই যুক্ত করা হয়েছে বলে বুঝায়। এখানে মূল কথা وَلَا يَعْصِيْنَكَ অর্থাৎ মহিলারা আপনার হুকুম অমান্য করবে না বলাই উদ্দেশ্য। বাকী فِىْ مَعْرُوْفٍ কথাটা আগের বাক্যাংশকে জোর দেয়ার জন্য অলংকার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। কারণ রসূল স. কখনো উম্মাতকে مَعْرُوْفٍ ছাড়া খারাপ কাজের হুকুম দেয়ার কল্পনা করাই অসম্ভব।

রসূল স.-এর কাছে কৃত নারী সমাজের শপথের বিষয়ের মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির উল্লেখ আলোচ্য আয়াতে নেই। কারণ এসব তো দীনের ভিত্তি বা ইসলামের বুনিয়াদ হওয়ার কারণে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ স. আল্লাহ্‌র নির্দেশে কেবল সেসব বিষয়ের বাইয়াত (শপথ) নিয়েছেন, যেসব কাজ সাধারণত নারীদের থেকে প্রকাশ পেতো। যাতে করে নারীগণ দীনের স্তম্ভ বা ইসলামের বুনিয়াদী কাজ গুলোর প্রতি আমল করার সাথে সাথে এসব বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে পারে। এ থেকে জানা যায় যে, আলিম সমাজ, দায়ীগণ এবং ওয়ায়েজগণ নিজেদের সমগ্র চেষ্টা-সাধনা যেন কেবল দীনের স্তম্ভগুলোর আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে, বরং সমাজে যেসব বদ রসম, কুপ্রথা ও নৈতিকতা বিরোধী প্রথা-রসম চালু আছে সেগুলোর পরিপূর্ণ রহিতকরণ কাজে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। লক্ষ করা যায় যে, নামায-রোযার মত মৌলিক কাজে অভ্যস্থ লোকেরাও কুপ্রথা ও অনৈতিক কার্যক্রমে ডুবে থাকে।–আল কুরআনুল করীম, মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

•

এখানে ভাল কাজে রসূলের যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তা মূলত রসূলুল্লাহ স. হিসেবে مَعْرُوْفٍ-এর শর্তারোপ করা হয়নি—হয়েছে ইসলামী সমাজের শাসক হিসেবে। কারণ রসূল হিসেবে غير معروف কাজের নির্দেশ দেয়া অসম্ভব। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস লিখেছেন, আল্লাহ জানতেন

তাঁর নবী মারূফ ছাড়া অন্য কোনো কাজের নির্দেশ কখনই দেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীর নাফরমানী থেকে বিরত রাখার কথা বলতে গিয়ে 'মারূফ'—ন্যায়সংগত কাজে শর্তারোপ করেছেন (ন্যায়সংগত কাজে তাঁর নাফরমানী করা যাবে না বলেছেন)। একথা বলার উদ্দেশ্য আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী কাজেও শাসকদের আনুগত্য করার জন্য দাবী করা বা নির্দেশ দেয়ার কোনো সুযোগই যাতে কেউ পেতে না পারে তার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। নবী করীম স. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ ـ

"আল্লাহর নাফরমানী করে অন্য কারো আনুগত্য বা আইন নির্দেশ মেনে নেয়া যায় না। আনুগত্য করা যেতে পারে কেবলমাত্র مَعْرُوْفُ 'ভাল বলে পরিচিত' কাজে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ مَخْلُوْقًا فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْمَخْلُوْقَ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে ও কোনো লোকের আনুগত্য করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তার উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (অতপর সেই ব্যক্তির গোলামী করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকবে না।)"–তাফহীমুল কুরআন

❐

বিয়াল্লিশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ওদের মার্জনা করো, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং ওদের ক্ষমা দরে দাও ; তাহলে জেনে রেখ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু। তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ ; আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরুস্কার।"–সূরা তাগাবুন ঃ ১৪-১৫

কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু

এ আয়াতগুলোর শানেনুযুল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, হিজরতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের সময় মক্কা থেকে অনেক মুসলমান মদীনায় হিজরত করে চলে যান। কিন্তু কতেক মুসলমান হিজরতের ইচ্ছা করেও হিজরত করতে পারলেন না। কারণ, তাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ এ পথে বাধার সৃষ্টি করে বসেছিল। অতপর যখন তারা রসূলে করীম স.-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তারা দেখতে পেল যে, পূর্বে যারা হিজরত করে মদীনায় পৌছেছিল। তাঁরা দীন-শরীয়ত সম্পর্কে বেশ ইলম অর্জন করে নিয়েছে। এটা দেখে তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির প্রতি রাগান্বিত হয়ে সে বাধাদানকারী স্ত্রী ও সন্তানদের শাস্তি দিতে উদ্যত হলো। তখন আল কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে আল্লাহ তাআলা ওসব স্ত্রী ও সন্তানদের মার্জনা ও ক্ষমা করে দেয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন।–তিরমিযী

আয়াতে فَاحْذَرُوْهُمْ তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকবে বলে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা ওদের পেছনে লাগা থেকে সাবধান থেকো। বরং তোমাদের উচিত ওরা যেন তোমাদের পেছনে চলে দীনের পথে অগ্রসর হয়—এমন ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দেয়া। যাতে করে ওরাও তোমাদের

মত আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা ওদের পেছনে লেগে পড় আর নিজেদের পরিণাম ধ্বংস করে দাও।–আল-কুরআনুল করীম ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ

তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আর এক অর্থ হতে পারে তাদের বৈষয়িক সুখ-সুবিধা বিধান করতে গিয়ে তোমরা স্বীয় পরিণতি-পরকাল বরবাদ করো না। তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এতবেশী পোষণ করো না যাতে করে আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক রক্ষা ও ইসলাম পালনের পথে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতে পারে। তাদের প্রতি এতটা নির্ভরতা রেখো না যাতে তোমার অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজের গোপন তথ্য জেনে নিয়ে শত্রু পক্ষকে জানিয়ে দিতে পারে। রসূলে করীম স. তাঁর একটি কথায় মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। হাদীসটি এই ঃ

يُوْتى بِرَجُلٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عَيَالُهٗ حَسَنَاتُهٗ -

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, আর বলা হবে এর সন্তানরা এর সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে।"

'স্ত্রী ও সন্তানাদির কেউ কেউ ঈমানদারকে শত্রু'—একথা বলার পর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

'আর তোমরা যদি ওদের মাফ করো, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং ওদের ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু। এর অর্থ এই যে, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে কেবল তোমাদের সাবধান করার উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা সতর্ক থাক এবং দীন ইসলামকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার চিন্তা করো। এর মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে, কিংবা তাদের থেকে রূঢ় আচরণ ও দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সম্পর্কে এতটা তিক্ততা সৃষ্টি করবে যার ফলে তোমাদের পারিবারিক জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠে—এটা কখনও উদ্দেশ্য নয়। কেননা এমনটি হলে দুটো বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। একটি হলো, এর ফলে স্ত্রী-পুত্রকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি হলো এর ফলে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিরোধিতা সৃষ্টি হতে পারে। আশপাশের লোকেরা মুসলমানদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে

যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কঠোর ও রূঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।–তাফহীমুল কুরআন

এ প্রসংগে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামের শুরুতে লোকেরা যখন প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করছিলো, তখন তাদের একটি অসুবিধা দেখা দিতো যদি তাদের পিতা-মাতা কাফের থেকে যেতো। কেননা তারা এদের উপর ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতো এবং তাদের মতই কাফের হয়ে থাকার জন্য বাধ্য করতে চাইতো। আর একটি অসুবিধা হতো যদি তাদের সন্তান-সন্ততি (কিংবা স্ত্রী হলে তাদের স্বামী ও সন্তানরা) কুফরী অবস্থায় থাকতো এবং দীন ইসলাম থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাতো। প্রথমোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সূরা আনকাবূতের ৮ম আয়াতে ও সূরা লুকমানের ১৪-১৫ আয়াতে বিধান দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে পিতা-মাতার কথা (যদি দীনের বিপরীত হয়) তবে তা কখনই মেনে নেয়া যাবে না। অবশ্য সেই অবস্থায়ও দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে যেতে হবে। আর শেষোক্ত অবস্থার বিধান এ আয়াতে দেয়া হয়েছে—বলা হয়েছে নিজেদের দীনকে নিজেদের সন্তানাদির ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কোনোরূপ কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ করা যাবে না। বরং নম্রতা ও ক্ষমা সহিষ্ণুতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে।–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, পরিবার-পরিজনের কেউ কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোআ করা উচিত নয়।–রূহুল মাআনী-মাআরেফুল কুরআন

আয়াত ১৫ তে বলা হয়েছে ঃ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ। এখানে فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মুহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহর বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মুহাব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।–মাআরেফুল কুরআন

এ ক্ষেত্রে রসূলে করীম স.-এর একটা বাণী স্মরণীয়। তাবারানী হযরত আবু মালেক আশআরী হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম স. ইরশাদ করেছেন, তোমার আসল শত্রু সে নয় যাকে হত্যা করলে তোমার সাফল্য হবে, আর সে তোমাকে হত্যা করলে তোমার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট

হবে। বরং হতে পারে তোমার আসল শত্রু তোমার সেই সন্তান, যে তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর তোমার বড় শত্রু হচ্ছে তোমার সেই ধন-সম্পদ যেগুলোর তুমি মালিক হয়ে আছো। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এখানেও সূরা আনফালে বলেছেন, যদি ধন-সম্পদ ও সন্তানের বিপদ হতে নিজেদের বাঁচিয়ে নিতে পার ও তাদের ভালবাসার উপর আল্লাহর ভালবাসাকে বিজয়ী রাখতে পারো ; তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে অতিবড় মূল্য ও শুভফল হবে।–তাফহীমুল কুরআন

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে নিজের স্ত্রী হতে ও বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে নিজের স্বামী হতে এবং পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের থেকে অসংখ্য প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, বিপদ, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষের পক্ষে এমন স্ত্রী পাওয়া বা স্ত্রীর পক্ষে এমন স্বামী পাওয়া, যে ঈমান ও সততার জীবন যাপনে পরস্পরের পূর্ণ মাত্রায় সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে। তারপর তাদের সন্তানদেরও আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও স্বভাব-চরিত্রে তাদের মনমত ও চক্ষু শীতলকারী হবে—এমনটা খুব কমই ঘটে থাকে। সাধারণত দেখা যায় স্বামী ঈমানদার চরিত্রবান হলে স্ত্রী ও সন্তানাদি এমন হয় যারা তার ঈমানদারী, সততা ও বিশ্বস্ততাকে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। তারা চায় স্বামী বা পিতা তাদের জন্য এমন কাজ করুক, যাতে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায়—পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হলেও তাদের কোনো আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে অনেক মুমিন স্ত্রীলোক এমন স্বামীর পাল্লায় পড়ে যে, তার শরীয়ত পালন করে চলাটা স্বামীর মোটেই সহ্য হয় না। সন্তানরা অসদাচারী পিতার পদাংক অনুসরণ করে ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে মায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। বস্তুত কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্বে মুমিনের দায়িত্ব হলো আল্লাহ ও দীনের খাতিরে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকা। কারাবরণ কিংবা দেশত্যাগ করে চলে যেতে হলেও অথবা জিহাদে শরীক হয়ে নিজের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হলেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হওয়া। প্রকৃত ঈমানের এটাই দাবী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একজন ঈমানদার স্বামীর পথে তার স্ত্রী ও সন্তানরাই বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম সমাজেও ঈমানদার লোকদের জীবনে এরূপ অবস্থা সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য আয়াত ১৪ (প্রথমোক্ত) এর একটি প্রয়োগ সাধারণভাবে এ প্রেক্ষিতেই হতে পারে।

আয়াতটির আরেকটি প্রয়োগ সে সময়ের ঈমানদারদের বেলায় প্রযোজ্য যখন এটি নাযিল হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তদানীন্তন মুমিনদের

বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে। তদানীন্তন মক্কা ও আরবের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত এ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে, একজন পুরুষ ঈমান আনলো, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র পরিজন যে কেবল ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না তাই নয়, বরং তাকেই ইসলাম থেকে বিরত রাখার বা ফিরিয়ে আনার জন্য দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যেতো। অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতো সেসব মহিলারাও যারা নিজেদের সমাজ পরিবেশে একাই ইসলাম গ্রহণ করতো ও ঈমানের পথে চলতো। অবশ্য বর্তমান সময়েও অমুসলিম সমাজে বা সেকুলার পরিবেশে ইসলামী অনুশাসন মান্যকারী বা ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী বহু লোকের জীবনে একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে।–তাফহীমুল কুরআন

❒

তেতাল্লিশ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

"আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এ দুজন ছিল আমার দুজন নেক বান্দার অধীন। কিন্তু তারা উভয়ই নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত ওদেরকে 'আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলো না। ওদের দুজনকেই বলা হলো, যাও আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।"

–সূরা তাহরীম ঃ ১০

দুজন নেক বান্দার স্ত্রী ছিলেন দুজন বিশ্বাসঘাতক নারী

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের ব্যাপারে দুজন নবীর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সেই দুই নারী হলো হযরত নূহ ও হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। এরা দুজনই ছিল নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারিণী। হযরত নূহ আ.-এর স্ত্রী 'ওয়াগেলা' আর হযরত লূত আ.-এর স্ত্রীর নাম 'ওয়ালেহা'। এ দুজন মহিলা তাদের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ওরা ব্যভিচারিণী ছিল। কারণ, কোনো নবীর স্ত্রীই ব্যভিচারিণী ছিল না। বরং এখানে বিশ্বাসঘাতক মানে ওরা ঈমানের দিক থেকে নিজ নিজ স্বামীর অনুসারী ছিল না। তারা উল্টো নবী স্বামীদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য ও সমর্থন করতো। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কোনো নবীর কোনো স্ত্রীই ব্যভিচারিণী হয়নি। এ দুজনের বিশ্বাসঘাকতা (خيانت) ছিল দীনের ব্যাপারে। তারা নবী স্বামীর দীন গ্রহণ করেনি। হযরত নূহ আ.-এর স্ত্রী ঈমানদারগণের গোপন তথ্যাদি শত্রুদের পৌঁছে দিতো। আর হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী তার ঘরে আসা নতুন নতুন লোকদের সম্পর্কে জাতির চরিত্রহীন লোকদেরকে খবর জানিয়ে দিতো। (ইবনে জারীর, তাফহীমুল কুরআন।) উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত এ দুজন নারী ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং কাফির ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ও

যোগাযোগ রাখতো এবং ওদের কাছে মুসলমানদের গোপনীয় তথ্য ফাঁশ করে দিতো। পরিণামে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো অন্যান্য জাহান্নামীদের সাথে। নবীর স্ত্রী হয়েও ঈমান-বিশ্বাসের তারতম্যের কারণে তথা দীন ইসলামের অনুসরণ না করার কারণে ওদের এ করুণ অবস্থা। আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা নবী-রসূলদের স্ত্রী হয়েও আদর্শিক পার্থক্যের কারণে ওদের পরিণাম ছিল ভয়াবহ। ওদের সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে ওদের স্বামীগণের নবী হওয়ার দোহাই পেড়ে নাজাত পায়নি তারা।

এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে যে সত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাহলো একজন মুমিনের ঈমান তার কোনো কাফির স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং কোনো কাফির পাপাচারীর স্ত্রী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরী ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে ; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের চিন্তা করা উচিত।

আয়াতে নবী পত্নীদের বিশ্বাসঘাতকতা বলে বুঝানো হয়েছে ওরা নিজ নিজ নবী (স্বামীর) উপর নবী হিসেবে ঈমান আনেনি, বিশ্বাসস্থাপন করেনি। বরং ওরা এ ব্যাপারে মুনাফিকীতে লিপ্ত ছিল। অধিকন্তু ওদের আন্তরিকতা ছিল স্বীয় কাফির লোকদের সাথে। যেমন নূহ্ আ.-এর স্ত্রী তাঁর সম্পর্কে এলাকার লোকদের বলতো, এতো মাজ্নুন—অস্বাভাবিক ব্যক্তি। হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী নিজের বাড়ীতে আগত সুশ্রী লোকদের ব্যাপারে অসৎ লোকদের জানিয়ে দিতো। কেউ কেউ বলেছেন, এ দুই মহিলাই নিজেদের লোকদের মাঝে নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কুৎসা রচনা করতো। চোগলখুরী করে বেড়াতো। আয়াতে বলা হয়েছে, এ দুই মহিলার স্বামীগণ নবী হওয়া সত্ত্বেও ওরা নবী স্বামীর আনুগত্য ত্যাগ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, অধিকন্তু ওরা নবীগণের শত্রুর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতো এবং নবীদের ও ঈমানদারগণের গোপনীয় তথ্যাদি দুশমনদের জানিয়ে দিতো। ওদের নিজেদের এ বদ-আমল ওদের জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিলো। নবীর স্ত্রী হিসেবে কোনো নাজাত পায়নি ওরা।—মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, আল কুরআনুল করীম

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কোনো কোনো অতি প্রিয় বান্দা নবী-রসূলগণের স্ত্রীও আদর্শগত সমস্যার সৃষ্টি করে নবী-রসূলদের বহু কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছিল। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে

উঠলো যে, কারো নিজের ঈমান-আমল ঠিক না থাকলে আল্লাহর অতিপ্রিয় কোনো লোকের সাথে সম্পর্ক তাকে নাজাত দিতে পারে না।

সূরা তাহরীমের এ দশম আয়াত ও একাদশ আয়াতের মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিরপেক্ষ। প্রত্যেকে শুধু তাই পাবে, যা সে নিজের ঈমান আমলের ভিত্তিতে পাওয়ার যোগ্য ও অধিকারী। বড় কোনো ব্যক্তির সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্ক কাউকেও বিশেষ ফায়দা দিতে পারে না ; পক্ষান্তরে কোনো নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সম্পর্কও কারো জন্য কিছুমাত্র ক্ষতিকর নয়। এ পর্যায়ে নবী করীম স.-এর স্ত্রীগণের সামনে তিন ধরনের নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। দশম আয়াতে হযরত নূহ ও লূত আ.-এর স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তারা ঈমান আনলে এবং নিজেদের সম্মানিত স্বামীগণের সহযোগিতা করলে মুসলিম উম্মাহর কাছে তাদের মান-সম্মান হযরত মুহাম্মদ স.-এর স্ত্রীগণের মতই হতো। কিন্তু তারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত নীতিতে চলায় নবীর স্ত্রী হওয়াটা তাদের কোনো কাজে আসল না। তারা জাহান্নামে যাওয়া থেকে নাজাত পাবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পরবর্তী একাদশ আয়াতে (হযরত আসিয়ার) ফিরাউনের স্ত্রীর। তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকৃষ্টতম শত্রুর স্ত্রী। কিন্তু তিনি যেহেতু ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং ফিরাউনী কাজকর্ম ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ও নীতি গ্রহণ করেছেন। এজন্যে ফিরাউনের মত এতবড় এক কাফেরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য তা বিশেষ কোনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত হযরত মারইয়ামের। তাঁকে এতবড় মর্যাদা দেয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, তিনি সেজন্যে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুমারী। এ অবস্থায় তাঁর গর্ভে আল্লাহর হুকুমে সন্তানের সঞ্চার করে দেয়া হলো। হযরত মারইয়াম সেজন্যে কোনো কান্নাকাটি, চিৎকার, হাহাকার বা বিলাপ করলেন না। তিনি সবকিছু অকপটে সহ্য করে নিয়েছেন। কেননা আল্লাহর মর্জি রক্ষার জন্য তা সহ্য করা ছিল একান্তই অপরিহার্য। ঠিক তখনই আল্লাহ তাঁকে سيدة النساء في الجنة 'জান্নাতীদের শ্রেষ্ঠ মহিলা' নামে অভিহিত করলেন।–মুসনাদে আহমদ থেকে তাফহীমুল কুরআন।

❑

ছয়চল্লিশ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ○

"আল্লাহ মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ফিরাউনের স্ত্রীকে। যখন সে দোয়া করছিল, হে আমার রব! আমার জন্য জান্নাতে তোমার সান্নিধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করো আর আমাকে উদ্ধার করো ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে, আর আমাকে উদ্ধার করো যালিম সম্প্রদায় হতে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান কন্যা মারইয়ামের—যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল আমার একান্ত অনুগতদের অন্যতম।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ১১-১২

আল্লাহদ্রোহী স্বামীর আল্লাহভক্ত স্ত্রী আর আল্লাহর অনুগত এক মহিয়ষী নারী

আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন পত্নী হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। মূসা আ. যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন, ফলে যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। এতে ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইলো। কতক রেওয়ায়াতে আছে ফিরাউন হযরত আছিয়ার দু হাত ও দু পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে এ আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এ দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তাঁর দোয়ার বাংলা অর্থ–"হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি

গৃহ নির্মাণ করুন।" আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দেন।-তাফসীরে মাযহারী থেকে। আয়াতে বর্ণিত হযরত আছিয়ার দোয়ার মধ্যে ছিল وَنَجِّنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه "আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করো।" অর্থাৎ আমাকে তোমার শত্রু ও মুসলমানদের শত্রু ফিরাউন থেকে হিফাযত করো, আর তার আমল অর্থাৎ তার অন্যায়-অনাচার, যুল্‌ম ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপ থেকেও আমাকে রক্ষা করো। তার এসব যুলমের অশুভ পরিণতিতে আমাকে শরীক করো না।"-তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন পত্নী আছিয়ার এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। অর্থাৎ তাদের জন্য এ দৃষ্টান্ত দেয়ার উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা, দীনের কাজে তাদের প্রেরণা দেয়া, ইসলামের পথে তাদের দৃঢ়পদ রাখা, দীনের ব্যাপারে কঠিন বিপদে সবর করার জন্যে। তাছাড়া এজন্যও যে, কুফরির প্রতিবন্ধকতা ও কঠোরতা ঈমানের এতটুকুনও ক্ষতি করতে পারে না, যেমন পারেনি ফিরাউন পত্নী আছিয়ার ব্যাপারে। যেই আছিয়া ছিল তৎকালীন সর্ববৃহৎ কাফিরের স্ত্রী। সেই কাফিরও তার স্ত্রীকে ঈমান থেকে ফিরাতে পারেনি। মূলত আল্লাহ তাআলা এখানে এ মযবুত ঈমানের অধিকারী নারী বিবি আছিয়ার ঈমানের দৃঢ়তার কথাটা তুলে ধরেছেন। এ থেকে বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত নারীর জন্য শিক্ষা গ্রহণের উদাহরণ-উপকরণ পাওয়া যায়, ঈমানের পথে দৃঢ় থাকার প্রেরণা মিলে।-আল কুরআনুল করীম ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

হযরত আছিয়া যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামের শত্রু ফিরাউনের স্ত্রী হয়েও হতে পেরেছেন একজন খাঁটি ঈমানদার, আল্লাহর ওলী। আলোচ্য আয়াতে তিনি আল্লাহর কাছে চারটি বিষয়ে দোয়া করেছেন বলে দেখা যায়। এক. আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং জান্নাতে তার জন্য স্থান নির্ধারণ, দুই. ফিরাউনের অধীনতা থেকে নাজাত দেয়া, তিন. ফিরাউনের বেঈমানী ও যুল্‌ম-অত্যাচার ইত্যাদির পরিণতি থেকে বিবি আছিয়াকে মুক্ত রাখা, চার. সকল বিধর্মী যালিম কওম থেকে তাকে নাজাত দেয়া। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা বুঝা যায়।

হযরত থানভী রহ. বলেন, হযরত আছিয়ার এ দোয়া হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় করেছিলেন অথবা একটা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি এ দোয়া করেছিলেন। সেই অবস্থাটা ছিল এই যে, যখন ফিরাউন বিবি আছিয়ার ঈমান আনার কথা জেনে গেল, তখন সে নির্দেশ দিল যে, আছিয়াকে বেঁধে যেন প্রখর রোদের মধ্যে শোয়ায়ে দেয়া হয় আর তাঁর বুকের উপর চাক্কির

পাথর চেপে দেয়া হয়। সেই বিশেষ অবস্থায় তিনি আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করেছিলেন। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁকে সেই সময় জান্নাতে তাঁর স্থান দেখিয়ে দিলেন। ফলে ফিরাউনের দেয়া শাস্তির তীব্রতা হ্রাস পেয়ে গেল। তাঁর মনে প্রশান্তি অনুভূত হলো।–আল কুরআনুল হাকীম ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী।

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. আল কুরআনুল করীম এ উল্লেখ করেন, "ফিরাউন বিবি আছিয়ার ঈমান আনার খবর শুনলে তাঁর হাত-পা বেঁধে বহুবিধ শাস্তি দিতে থাকে। এমতাবস্থায় মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতে তাঁর স্থান দেখানো হলো। ফলে সকল ধরনের শাস্তির যন্ত্রণা লাঘব হয়ে গেল। পরিশেষে ফিরাউন তাঁকে রাজনৈতিক কারণ দর্শিয়ে হত্যা করে ফেলে। এভাবে বিবি আছিয়া অত্যাচারী স্বামীর কবল থেকে নাজাত পান এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করে স্বীয় মালিকের দরবারে পৌছে যান। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম স. তাঁর কামেল হওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং হযরত মারইয়ামের সাথে তাঁর আলোচনা করা হয়। তাঁর পবিত্র আত্মায় হাজার হাজার রহমত বর্ষিত হোক।"

অতপর মহিয়ষী নারী হযরত মারইয়াম-এর উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, একটি বেঁকে বসা কওমের লোক তাদের মধ্যেই ছিল তার বসবাস। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্তবা-মর্যাদায় ধন্য করেছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর নারী সমাজের উপর তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে হযরত মারইয়ামের প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ۔

"সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।"

এখানে قٰنِتِيْنَ শব্দটি قَانِتٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদাতকারী। এ হচ্ছে হযরত মারইয়ামের পরিচিতি। হযরত আবু মূসা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কামেল ও সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরাউন পত্নী আছিয়া, ইমরান তনয়া মারইয়াম পুর্ণ্যতা লাভ করেছেন। বাহ্যত এখানে নবুওয়াতের গুণাবলী বুঝানো হয়েছে—যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।–তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ তাঁর তাফসীর আল কুরআনুল করীমে বলেন, অর্থাৎ তিনি (মারইয়াম) এমন লোকদের

মধ্যে অথবা এমন বংশের মধ্যে ছিলেন, যারা ছিল খুব ইবাদাতকারী, অনুগত, সৎ ও যোগ্যতায় এবং আনুগত্যে অদ্বিতীয়। হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান নারী হযরত খাদীজা রা., হযরত ফাতেমা রা., হযরত মারইয়াম এবং ফিরাউন পত্নী হযরত আছিয়া রা.- মুসনাদে আহমদ ১/২৯৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯/২২৩।

অন্য এক হাদীসে আছে, পুরুষদের মধ্যে তো বহু লোক কামেল হয়েছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে কামেল কেবল ফিরাউন পত্নী বিবি আছিয়া, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ রা.। তাছাড়া হযরত আয়েশা রা.-এর মর্যাদা অন্যান্য নারীর উপরে এরূপ যেমন 'ছারীদ' সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।-সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এখানে ফিরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়াকে ইমরানের কন্যা মারইয়ামের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ফিরাউনের স্ত্রী আল্লাহর কাছে কত উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যার বদৌলতে তিনি মারইয়ামের সাথে উল্লেখ্যের যোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর এ মহত্ব ও উচ্চমর্যাদার একমাত্র কারণ তাঁর জীবনের স্বতন্ত্র ঈমানী বৈশিষ্ট্য। এরা দুজন সতী, ঈমানদার, চরিত্রবান ও অনুগত মহিলার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এ দুজন নারীর দৃষ্টান্তকে আল্লাহ আল কুরআনে রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণের সামনে এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিন নারীদের সামনে তুলে ধরেছেন।-ফী যিলালিল কুরআন

❒

পঁয়তাল্লিশ

فَاذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

"যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তাঁর ভাই থেকে, তার মাতা আর তার পিতা থেকে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।"–সূরা আবাসা ঃ ৩৩-৩৭

যেদিন মানুষ তার একান্ত আপনজন এমনকি স্ত্রী থেকেও পলায়ন করবে

আলোচ্য আয়াতসমূহে হাশরের ময়দানের ভয়াবহতার তীব্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে প্রথম আয়াতে (৩৩নং) হযরত ইসরাফিলের শিংগা ফুঁকের ফলে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথাটা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে فَاذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ "যখন আসবে মহানাদ।" এখানে الصَّاخَّةُ মানে 'কান বধিরকারী আওয়ায' অর্থাৎ ইসরাফিলের শিংগার এমন কঠোর আওয়ায যাতে মানুষের কান বধির হয়ে যাবে। তরজমায় শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'কিয়ামত' শব্দ দিয়ে। দ্বিতীয় আয়াত (৩৪নং) থেকে হাশরের দিন সকল মানুষের মহাসমাবেশের দিন মানুষের ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও প্রত্যেকের নিজ নিজ মুক্তির অস্থিরতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়ার জীবনে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরের ময়দানে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারো খবরই নিতে পারবে না ; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেকেই তার ভাই থেকে পালাবে, আপন মা-বাপ থেকে পালাবে, এমনকি নিজের অর্ধাংগিনী স্ত্রী ও প্রাণপ্রিয় সন্তানাদি থেকেও লুকাবে। এক কথায়, প্রত্যেক মানুষ নিজের নিস্তার ও নিষ্কৃতির চিন্তায় এমন অস্থির ও হয়রান থাকবে যে, নিজের প্রাণপ্রিয় সকল প্রকার আত্মীয়দের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

দুনিয়ার জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ভাইদের মধ্যে হয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতগুলোতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

لِكُلِّ امْرِءٍ شَانٌ يُغْنِيهِ 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তায় থাকবে অস্থির হয়ে।' অথবা এর অর্থ নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে সবাই থাকবে নিরপেক্ষ ও বেপরওয়া হয়ে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ হাশরের ময়দানে নগ্নদেহ, খালী পা ও খাতনাবিহীন হয়ে উঠবে। হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়বে না ? রসূলুল্লাহ স. জবাবে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনালেন।-তিরযিমী

মানুষের পরস্পর থেকে লুকানোর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, মানুষ নিজ নিজ লোকদের থেকে পলায়ন করবে এজন্যে যেন সে ওদের কষ্ট-মুসিবত দেখতে না পায় যে কষ্ট-মুসিবতে তারা গ্রেফতার হয়ে পড়বে। কারো কারো মতে এজন্যে পলায়ন করবে, যেহেতু তারা জানবে যে, ওরা কারো কাজে আসবে না, কোনো উপকার করতে পারবে না।-ফতহুল কাদীর থেকে মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।-আল কুরআনুল করীম, উর্দু

সূরা মাআরিজ এর এক থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত আয়াতসমূহেও প্রায় এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে। 'পালাবে' বলে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে, তার একটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, মানুষ সেদিন তার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সেই কঠিন বিপদের সম্মুখীন দেখতে পেয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে না ; বরং সে দূরে সরে যাবে। তখন তার ভয় হবে এরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলে সে তো কিছুই করতে পারবে না। একথাটির আরও একটি অর্থ হতে পারে। তাহলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ আল্লাহর ভয় ভুলে গিয়ে পরকালকে উপেক্ষা করে পরস্পরের জন্য যে গুনাহ করেছে এবং একে অপরকে গোমরাহ করেছে, তার খারাপ পরিণতি সম্মুখে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকে অপরের নিকট থেকে দূরে পালাবে ; যেন সে নিজের গোমরাহী ও গুনাহর জন্য তাকে দায়ী করে বসতে না পারে। ভাই ভাইকে, সন্তান পিতা-মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা-মাতা সন্তানকে ভয় করবে যে সে হয়ত তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিয়ে বসবে। এ ভয়ে সেসব আপনজন থেকে দূরে পালাবে।-তাফহীমুল কুরআন

হাশরের মাঠে সকল মানুষের উলংগ হয়ে উঠার হাদীসটি বিভিন্ন সূত্র এ সনদে কিছু পার্থক্যসহ নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী করীম স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সকল মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন ও উলংগ অবস্থায় উত্থিত হবে। রসূলুল্লাহ স.-এর বেগমদের একজন, কোনো কোনো বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা রা. অপর এক বর্ণনা মতে হযরত সওদা রা. আবার অন্য একটি বর্ণনা মতে কোনো একজন মহিলা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গোপন অংগসমূহ সেদিন সকলের সম্মুখে অনাবৃত ও উন্মুক্ত হবে ? জবাবে নবী করীম স. আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে বলে দিলেন, "সেদিন কারো প্রতি তাকাবার মত হুশজ্ঞান কারো থাকবে না।"–নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে আবু হাতীম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী, হাকেম ইত্যাদির বরাতে তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন।

❑

ছেচল্লিশ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ۗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ আর যা সে উপার্জন করেছে। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। তার স্ত্রী—যে ইন্ধন বহন করে, তার গলায় পাকানো রুজ্জু নিয়ে।"–সূরা লাহাব

খড়ী বাহক যে নারী গলায় লোহার শিকল নিয়ে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

'সূরা লাহাব' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা আবু লাহাবের নাম ধরে নাযিল হয়েছে। এতে আবু লাহাবের দোষ প্রচার করা হয়েছে। যদিও মক্কা ও মদীনায় আবু লাহাবের চেয়ে ইসলাম ও রসূলের অধিক শত্রুতাকারী অনেক লোক বর্তমান ছিল, কিন্তু তাদের কারো নাম ধরে কুরআনে তার দোষ বলা হয়নি। তাই প্রশ্ন জাগে কোন্ বিশেষ কারণে কুরআনে এ লোকটির নাম দিয়ে তার দোষ প্রচার করা হলো ? প্রশ্নটির জবাব পেতে হলে তদানিন্তন আরব সমাজ ও রসূলের ব্যাপারে আবু লাহাবের ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে।

আবু লাহাবের স্ত্রীর অযথা নবী স.-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও ভয়ানক শত্রুতার পরিণতি সম্পর্কেও বলা হয়েছে এ সূরার শেষাংশে। উভয়ের পরিণতি হলো লেলিহান অগ্নি শিখাপূর্ণ জাহান্নামের শাস্তি। কারণ, তারা উভয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমানবিক যন্ত্রণাদানে এবং ইসলামের বিরোধিতায় ছিল অগ্রগামী ও কঠোর।

প্রাচীনকালে সমগ্র আরব ভূমিতে সর্বত্র ব্যাপক অশান্তি, উচ্ছৃংখলতা, লুটতরাজ ও চরম অরাজকতা বিরাজিত ছিল। নিজের বংশ-পরিবার ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সেই সমাজে নিজের জান-মাল ও মান-সম্মান রক্ষা করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শত শত বছর ধরে এমনি অবস্থা বিরাজিত ছিল। তাই

আরব সমাজের নৈতিক মূল্যমানে 'সেলায়ে রেহ্‌মী'—নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব লাভ করেছিল। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা, কিংবা তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা না করা এবং এর হক আদায় না করা সে সমাজে বড় পাপ বলে মনে করা হতো। এ নৈতিক আদর্শকে জাহেলিয়াতের যামানায় আরবের লোকেরাও খুবই সম্মানার্হ ও অবশ্য পালনীয় মনে করতো। কিন্তু সেই সমাজের একটি মাত্র লোক ইসলামের শত্রুতা করতে গিয়ে এ আদর্শ লংঘন করে বসলো। এ লোকটি ছিল আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবু লাহাব। সে ছিল নবী করীম স.-এর আপন চাচা ! আরবে তখন চাচাকে পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ মনে করা হতো। বিশেষত ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃহীন হলে চাচাই তাকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসবে, তদানীন্তন আরব সমাজে চাচার প্রতিই এমন আশা-ভরসা ছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলামের সাথে চরম শত্রুতা ও কুফর প্রীতির কারণে আরব সমাজের এ চিরন্তন রীতি লংঘন করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না।

কুরআনের আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ—"তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় দেখাও—সাবধান করে দাও" আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন একদা ভোরবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'يَا صَبَاحَاهُ'–হায় ভোরবেলার বিপদ।' তৎকালীন আরবে কেউ যদি নিজের কবিলার উপর শত্রুকে আক্রমণ চালাতে আসতে দেখতো। তাহলে সেই ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে এরূপ চিৎকার দিতে থাকতো। এ ছিল তৎকালীন আরবের সাধারণ নিয়ম। নবী করীম স.-এর এ চিৎকার শুনে কুরাইশ বংশের সকল গোত্রের লোক অথবা তার প্রতিনিধি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। এ সময় তিনি তাদের প্রত্যেক গোত্রের নাম নিয়ে নিয়ে সাবধান বাণী শুনালেন—দীনের দাওয়াত দিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই এবং অন্য কেউ কিছু বলার আগেই নবী করীম স.-এর চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো : تَبًّا لَكَ، اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ তোর সর্বনাশ হোক, একথা বলার জন্যই কি তুই আমাদের একত্রিত করেছিস ? এক বর্ণনা মতে, একথা বলতে বলতে আবু লাহাব নবী করীম স.-এর প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরও হাতে তুলে নিয়েছিল।-বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জরীর প্রভৃতি থেকে তাফহীমুল কুরআন।

ইবনে যায়েদ-এর বর্ণনা অনুযায়ী একদিন আবু লাহাব নবী করীম স.-কে জিজ্ঞেস করলো, "আমি যদি তোমার প্রচারিত দীন কবুল করি,

তাহলে আমি কি পাব ?" উত্তরে নবী করীম স. বললেন, "সব ঈমানদার যা পাবে আপনিও তা পাবেন।" সে বললো, "আমার জন্য বাড়তি মর্যাদা কিছু হবে না ?" নবী করীম স. বললেন, "আপনি আর কি চান ?" তখন সে বললো ঃ

تَبًّا لِّهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَهٰؤُلَاءِ سَوَاءً۔

"ধ্বংস হোক এ দীন যাতে আমি ও অন্যান্য লোক সমান হয়ে যাব।"

এ লোকটি (আবু লাহাব) মন-মানসিকতার দিক থেকে কি এক ভয়ানক খবীস লোক ছিল, তা একটি ঘটনা হতেই প্রকট হয়ে উঠে। নবী করীম স.-এর পুত্র কাশেমের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহরও ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন এ লোকটি ভাইপোর জন্য শোক প্রকাশ করার পরিবর্তে বিশেষ আনন্দে ও অত্যন্ত খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠে এবং কুরাইশ সরদারদের কাছে গিয়ে গিয়ে যেন একটা অতি বড় সুসংবাদ দিতে লাগলো এই বলে যে, শুনলে ? আজ তো মুহাম্মাদের নাম-নিশানাও মুছে গেল। তার এ অমানবিক মনোভাব প্রকাশের প্রেক্ষিতে সূরা কাউসার নাযিল হয়।

নবী করীম স. দীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য যেখানে যেখানে যেতেন এ লোকটি তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতো। হযরত রবীয়া ইবনে আব্বাদ দেয়ালী বলেন, "আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম। একদিন আমি পিতার সাথে যুলমাযায এর বাজারে গেলাম। দেখলাম নবী করীম স. বলছেন, يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ। "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তবেই তোমরা কামিয়াব হবে, কল্যাণ পাবে।" দেখলাম তাঁর পেছনে পেছনে আর একটি লোক বলছে, এ লোকটি মিথ্যাবাদী। এ লোক পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ লোকটি কে ?" লোকেরা বললো, "এতো তাঁর চাচা, আবু লাহাব।"-মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী থেকে তাফহীমুল কুরআন।

মোটকথা, আবু লাহাব নবী করীম স.-এর বিরোধিতায় এ ধরনের অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজে সদাসর্বদা লিপ্ত থাকতো। ঠিক এ কারণেই এ সূরায় আবু লাহাবের নাম ধরে তার হীন কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে।

আবু লাহাবের স্ত্রীও নবী করীম স.-এর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণের ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম ছিল না। সে রাতের অন্ধকারে নবী করীম স.-এর দরজার সামনে কাঁটাযুক্ত আগাছা-পরগাছা এনে ফেলে রাখতো। এ ছিল

তার নিত্যকার অভ্যাস। এ মহিলাটির নাম ছিল 'আরওয়া'। উম্মে জামিল ছিল তার উপনাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগ্নি। এ মহিলা নবী করীম স.-এর সাথে শত্রুতার ব্যাপারে তার স্বামী আবু লাহাবের চেয়ে কিছুমাত্র পেছনে ছিল না। হযরত আবু বকর রা.-এর কন্যা হযরত আসমা রা. বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয় ও উম্মে জামিল তা শুনতে পায়, তখন সে ক্রোধে আগুনের মত জ্বলে উঠে এবং রাসূলুল্লাহ্ স.-এর খোঁজে বের হয়ে পড়ে। তার হাতে ছিল একমুষ্টি পাথর। নবী করীম স.-এর কুৎসা রটনা প্রসংগে নিজেই কবিতা রচনা করে তা আবৃত্তি করতে করতে সে অগ্রসর হচ্ছিল। যখন সে হেরেম শরীফে উপস্থিত হলো, তখন সেখানে নবী করীম স.-এর সাথে হযরত আবু বকর রা.-ও বসেছিলেন। হযরত আবু বকর রা. বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মহিলাটি আসছে। আপনার সাথে সে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করে ফেলতে পারে বলে আমার আশংকা হচ্ছে।" তখন নবী করীম স. বললেন, "সে আমাকে দেখতেই পাবে না।" বাস্তবে তা-ই হলো। নবী করীম স. সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পেল না। তাই সে হযরত আবু বকর রা.-কে বললো, "শুনলাম তোমাদের সংগী (নবী) নাকি আমার কুৎসা রটনা করছে?" হযরত আবু বকর রা. বললেন, "এ ঘরের রব-এর নামে শপথ করে বলছি, তিনি তো তোমার কোনো কুৎসা করেননি।" একথা শুনে সে ফিরে গেল।-সীরাতে ইবনে হিশাম এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন।

হযরত আবু বকর রা.-এর এরূপ উত্তরদানের তাৎপর্য হলো প্রকৃতপক্ষে আবু লাহাবের স্ত্রীর কুৎসা করেছে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ; রসূলুল্লাহ্ স. নিজে তো কিছুই করেননি, কিছুই বলেননি। কারণ সূরা লাহাব তো আল্লাহই নাযিল করেছেন।

এ সূরায় এ মহিলাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ অর্থ কাষ্ঠবহনকারীণী বলা হয়েছে। মুফাস্সিরীনে কিরাম একথার কয়েকটি তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা, ইবনে যায়েদ রা. দাহ্হাক ও রুবাই ইবনে আনাস বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল রাতের অন্ধকারে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে রসূলে করীম স.-এর ঘরের দরজায় ফেলে রাখতো। এ কারণে তাকে এ সূরায় কাষ্ঠবহনকারীণী বলা হয়েছে। কাতাদাহ্, ইকারামা, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন, এ মহিলা লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুটনাগিরি করে বেড়াতো। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করতো। এ কারণে আরবী প্রচলন অনুযায়ী তাকে কাষ্ঠবহনকারীণী বলা হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি

একদিকের কথা অন্যদিকে বলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বেড়ায় তাকে আরবরা حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -('কাষ্ঠবহনকারীণী') বলে। সাইদ ইবনে যুবায়ের বলেন, যে লোক গুনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয় তার সম্পর্কে আরবী প্রচলন অনুযায়ী বলা হয় فُلَانٌ يَحْطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ 'অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাষ্ঠ বোঝাই করে।' অতএব حَمَّالَةَ الْحَطَبِ মানে গুনাহের বোঝা বহনকারীণী। মুফাসসিরীনে কিরাম এর আরও একটি অর্থ বলেছেন, তাহলো আবু লাহাবের স্ত্রী সম্পর্কে ঘোষিত একথাটি এ দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে নয়। এটা বরং পরকালীন জীবন সম্পর্কিত কথা। অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে সে মহিলা কাষ্ঠ এনে এনে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে যাতে তার স্বামী আবু লাহাব জ্বলতে থাকবে।

—তাফহীমুল কুরআন

খড়িবাহক বা কাষ্ঠবহনকারীণী এ মহিলাটি লেলিহান শিখাপূর্ণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তার গলায় পেঁচানো থাকবে শক্ত শিকল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী সবসময় একটি মূল্যবান হার গলায় পরিধান করে থাকতো। সে বলতো লাত উজ্জার শপথ, আমি আমার এ হার বিক্রি করে এর মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে ব্যয় করবো। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে فِيْ جِيْدِهَا মানে তার অলংকার পরিহিত গলা আসলে বিদ্রূপ স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নামে তার অলংকার শোভামণ্ডিত গলায়—যার হার নিয়ে সে গৌরব করে—শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা থাকবে। এটা মূলত কুরআনের এক বিশেষ ধরনের বিদ্রূপ ভংগি। কুরআনের বেশ কটি আয়াতে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন একটি আয়াত فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তাদেরকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এ দুটো কথা একই ধরনের বিদ্রূপাত্মক কথা।

আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে শত্রুতাকারী এ বিষাক্ত মনের অধিকারী মহিলার গলায় জড়ানো রশি সম্পর্কে এ সূরায় বলা হয়েছে, তাহলো حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ অর্থাৎ সেই রশি হবে 'মাসাদ' টাইপের। আভিধানিক ও তাফসীরবিদগণ এ مَسَدٍ শব্দের কয়েক অর্থ বলেছেন। এক অর্থ 'মাসাদ' হলো 'খুব বেশী পাকানো শক্ত রশি।' দ্বিতীয় অর্থ 'মাসাদ' মানে 'খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি রশি।' তৃতীয় কথা হলো উটের চামড়া কিংবা পশমের তৈরি রশিই হলো 'মাসাদ'। শব্দটির আরেক অর্থ হলো লোহার তার জড়ানো মযবুত রশি।' মোটকথা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর রসূলের সাথে শত্রুতায় স্বামীর সাথে পাল্লা দিয়ে এ মহিলাটি যেমন বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের উভয়কে এর পরিণামও ভোগ করতে হবে তেমনি কঠোরভাবে।

সাতচল্লিশ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের স্রষ্টার কাছে, সেসবের অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয় এবং অনিষ্ট হতে সেসব নারীর যারা গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদু করে, আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।"–সূরা ফালাক

সাধারণত নারীরা যাদুটোনা করে থাকে বা তাদের মাধ্যমে যাদু করা হয়

আল কুরআনের সর্বশেষ দুটো সূরা 'সূরা ফালাক ও 'সূরা নাস।' দুটো সূরা একই বিষয়ে ও একই ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। এজন্যে কোনো কোনো মুফাসৃসির উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাছাড়া সূরা দুটোর একটা নামকরণ করা হয়েছে, আর তাহলো المعوذتين। 'আল মুআওয়াযাতাইন'। বস্তুত বনী আদম আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও তাদের অমিষ্টকারীর সংখ্যাও কম নয়। আর সকল অনিষ্টকারী বা সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র রাব্বুল আলামীন। তাই মেহেরবান আল্লাহ্ তাআলা আল কুরআনে মানবজাতির প্রকৃত সফলতা লাভের জন্য 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল পথের নির্দেশনা দান শেষে তাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণেরও শিক্ষা দিয়েছেন এ দুটো সূরার মাধ্যমে।

ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ স.-কে যাদু করেছিল। তিনি এতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স.-এর এ অসুখ ছয় মাস স্থায়ী ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এ দুটো সূরা নাযিল করলে আল্লাহর নবী তা পড়ে যাদু থেকে আরোগ্য লাভ করেন। পাপীষ্ঠ লবীদ তার কন্যাদের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ স.-কে যাদু করে। সে একটি সূতোয় এগারটি গিরা দিয়ে যাদু করিয়েছিল। আর এ দুটো সূরায়ও ঠিক এগারটি আয়াত রয়েছে। আল্লাহর নবী এক একটি আয়াত পড়ে এক একটি গিরা খুলতে থাকেন। এগারতম

গিরা খোলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর অনুভব হলো যেন এক বিরাট ভারী বোঝা তাঁর মাথা থেকে সরে গেছে।

যারা যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয় তাদের মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহর রসূলের উপর যাদুর ক্রিয়া হলো কিভাবে ? যাদুর স্বরূপ ও এর ক্রিয়া সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আসলে যাদুর ক্রিয়াও আগুন-পানির ক্রিয়ার মত। আগুন গরম করে বা পুড়িয়ে দেয়, পানি শীতল করে বা ভিজিয়ে দেয়—এ হলো আগুন ও পানির স্বাভাবিক ক্রিয়া। নবী-রসূলগণও এসবের ক্রিয়ার বাইরে নয়। যাদুর ক্রিয়াও ঠিক আগুন-পানির ক্রিয়ারই ন্যায়। কাজেই নবী-রসূলগণের যাদুগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়।-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

পাঁচ আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফালাক। প্রথম দু আয়াতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। তৃতীয় আয়াতে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা রয়েছে রাতের অন্ধকারে জিন ও মানুষের দুষ্ট শ্রেণীর যাবতীয় অনিষ্ট থেকে। বিশেষত রাত যখন অতি গভীর ও ঘনীভূত হয়ে আসে তখনই মানুষের চিরশত্রু শয়তান—জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান মানব সাধারণের জান-মাল ও অর্থ-সম্পদের ক্ষতি করে, রোগ-শোক, চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের উপর চড়াও হয়। চতুর্থ আয়াতে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে গিরায় ফুঁক দিয়ে অন্য মানুষকে ক্ষতিকারী বা ক্ষতিকারিণীর অনিষ্ট থেকে। এখানে বলা হয়েছে وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ অর্থ আর আশ্রয় চাই গিরায় ফুঁকদানকারিণীর অনিষ্ট থেকে। যারা যাদু করে তারা ডোর ইত্যাদিতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে গিরা দেয়। আয়াতে نفث মানে ফুঁক আর عقد মানে গিরা। نفّثت শব্দ যদি نفوث এর বিশেষণ হয় তাহলে এর অর্থ ফুঁকদানকারী পুরুষ ও নারী উভয় হতে পারে। এখানে نفّثت স্ত্রীলিংগের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কই বেশী। সর্বোপরি যে বিশেষ ঘটনায় এ সূরাটি নাযিল হয় তাহলো রসূলুল্লাহ স.-কে যাদু করার ঘটনা। আর সেই ঘটনার মূল নায়ক পুরুষ হলেও মূলত যাদুকরের সেই পাপিষ্ঠের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ স.-এর উপর যাদু করেছিল।–মাআরেফুল কুরআন

যাদু সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। এতে করে অন্য লোকের উপর খারাপ ক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে শয়তান বা খবীস রূহ কিংবা

তারকার সাহায্য চাওয়া হয়। এ কারণে কুরআন শরীফে যাদুকে কুফরী বলা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ـ

"সুলায়মান কুফরী করেনি—শয়তানরাই কুফরী করেছিল। ওরা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিচ্ছিলো।"

এমনকি যাদুতে যদি কোনো কুফরী কথা বা শেরকী কাজ নাও থাকে তবুও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী করীম স. যাদুকে পরকাল বিনষ্টকারী সাতটি কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী করীম স. বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সাতটি কাজ কি কি ? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহর হারাম করা প্রাণ হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুকাবিলা না করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ও পালিয়ে যাওয়া, আর নির্দোষ সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর উপর যিনার—ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তোলা।–তাফহীমুল কুরআন

সমাপ্ত